বঙ্গদর্শন

(নবপর্য্যায়)

মাসিকপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ

১৩২০

প্রবন্ধ-লেখকগণ

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীশশধর রায়, শ্রীভবানীচরণ ঘোষ, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ শাস্ত্রী, শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী, শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, শ্রীতারকচন্দ্র রায় শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীরামলাল সরকার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীডাঃ নন্দলাল মজুমদার, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীআবদুল করিম শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

ও

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত,

বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ ।

বর্ষসূচী, ১৩২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মিলন	৭০
অভিভাষণ	৮১
অভিশাপ (গল্প)	১৬১
অমৃতসব	৫৭৬
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	২২৭
আফগান-জাতির মাতৃভাষা	৭৪১
আমার জীবন (সমালোচনা)	৫১
আশা (কবিতা)	৬৯২
উৎপলা (উপন্যাস)	১৮, ১৩৮, ২১০, ২৯১, ৩৭৮, ৪৪৫ ৫৩২, ৫৮৭, ৬৪১, ৮৩০
উৎসর্গ (কবিতা)	৭৭৮
উপবাস ও ক্লান্তি	৮৭
উপহার (কবিতা)	১৮৩
এবা (সমালোচনা)	২৬৪, ৪০০, ৬৭৬
কেন (কবিতা)	৬৬৪
গ্রহদিগের কক্ষা ...	৮৫৯
চণ্ডীদাস	২৬
চন্দ্রনাথ	৬৮
চরিত-চিত্র ..	৯০, ১৮৪
চলিত ভাষার অপ্রচলিত ব্যাকরণ ..	২১৫
চীনে প্রজাতন্ত্র ...	১১
জগদীশনাথ রায়	১৫, ১০৪ (ক), ৩৫২, ৫২৩, ৬৪৫, ৬৮৮, ৮৪৬
জনমদুঃখিনী সীতা ...	৮০৫
জমাল-জমিল (গল্প) ...	৩১৮
জলপান	১১৯
জিজ্ঞাসা (কবিতা) ...	৬৩৬
জীবনটা কি ?	৫
জীবনবর্ষা (কবিতা)	২৮৪
দুভাগ্যের কাহিনী (উপন্যাস)	১০৪, ১৯৫, ৩৫১, ৪১৫, ৫০৪, ৫৫২, ৬০৫, ৭১৬, ৮১০
দ্বিজেন্দ্রলাল	৫১০
ধর্ম্মমঙ্গল	৬২৯, ৭৬৮
নক্ষত্র পূজা	১৭৭, ৩৭১, ৭১৮
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৭৬
ন চ দৈবাৎ (গল্প)	৪৮২
নববর্ষে প্রার্থনা (কবিতা)	৮৫
নারী (কবিতা)	৪৩৫
নারী সমস্যা	৭৮৯
নিমাই চরিত	১, ১০৯, ২০৫, ২৮৫, ৩৭০, ৪৩১, ৫০৯, ৫৮১, ৬৬৭, ৭৪৯, ৭৯৭
পাথরের সন্দেশ	৪২১
পূর্ব্বরাগ (কবিতা)	৭৯৬
পূর্ব্বরাগ ...	৬২১, ৭৭৯, ৮৪৯
প্রদীপ (সমালোচনা)	৫৫
প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ	১৭২
প্রার্থনা (কবিতা)	৬১০ (চ)
বরিশালে নবান্ন ...	৭২১
বর্ণ বা রঙ্গ	৬৫
বাঙ্গালা মাসিকপত্র	৪৮৯
বিজ্ঞানে সূক্ষ্মগণনা	৩৬৪
বিলাতে রবীন্দ্রনাথ	১৯০
বিলাতের কথা ...	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৈদিক সাধনার আভাস	৬০, ১ ৫, ২৩৯, ৩ ৬, ৪৬৪, ৫৪৪, ৭১১
বেহার চিত্র (নক্সা) .	৫৯৬
ব্যবধান (কবিতা) ...	৮৬
ব্রহ্মবিদ্যা ...	৯৭
বিশ্বসৃষ্টিতে মানবের স্থান ...	৭৯৩
মনসার ভাসান ...	১৬৬, ২৪৮
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ...	১৫৩
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা	১৭৫, ২৭২, ৩০৪
মহাভারতের কালনির্ণয়	৮২২
মেঘনা-দর্শনে (কবিতা) ...	৬১৭
রসের রূপ ...	২৯১, ৩২৮, ৫০৮ (ছ)
রহস্য (কবিতা)	১০৮
রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্র	৪৬, ১৪৯, ২৫৩, ৩৩৩, ৩৯২, ৫০৮ (চ), ৫৭২, ৬২০ (ক)

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং ও রবীন্দ্রনাথ . .	৪৯০
রামাবতী . .	৩৩, ৪৩১, ৫০৮ (ট)
রেখা-চিত্র ...	৬১৭, ৭৮৪
লণ্ডনে নন্দলাল	২৩৬
শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী . .	৪৫৭
শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	৩৫৭, ৪৯৪, ৫৮৩, ৬৬১, ৮৩৬
সমালোচনা	৪৫৫
সম্পাদকের বৈঠক	৬৯১
সাগরের ঋণ-পরিশোধ ...	৩১০
স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল	১৮০
সুখ স্মৃতি (কবিতা) ...	৪২০
সোহাব ও রোস্তাম (কবিতা)	৪১, ২০৪
সৌন্দর্য্য	৩৪৭
সৌন্দর্য্য বোধ	১৩৩
হিন্দী ভাষা	১২৪

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জগাই-মাধাই উদ্ধার

একদিন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নিত্যাই, হরিদাস, আজ হ'তে তোমরা বাড়ী বাড়ী যাই। কৃষ্ণনাম প্রচার কর। প্রতি গৃহস্থের গৃহে যাইয়া কৃষ্ণ-ভজনা করিতে ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে ও কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা করিতে উপদেশ কর। দিনাবসানে আমার নিকট আসিয়া প্রতি-দিনের সংবাদ দিয়া যাইবে।"

প্রভুর আদেশ শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। দুইজনে ঘরে ঘরে যাইয়া কৃষ্ণনাম বিলাইতে লাগিলেন—

আজ্ঞা পেয়ে দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হয়ে একমন॥"

সন্ন্যাসীদ্বয় গৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইলে গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভিক্ষা দিতে আসিত। সন্ন্যাসীদ্বয় বলিতেন, "আমরা আর কিছু চাই না, আমাদের একমাত্র ভিক্ষা তোমরা শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর, শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা কর।" অনেকে প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতে অঙ্গীকার করিত। কেহ কেহ বলিত, "ইহারা দুইজন পাগল হইয়াছে, আমাদিগকেও পাগল করিতে আসিয়াছে।" যাহারা শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তনকালে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের গৃহে গেলে তাহারা মারিতে আসিত এবং বলিত, "ইহারা চোরের চর। ঘুরিয়া ফিরিয়া চুরির সুবিধা লক্ষ্য করিতেছে। আর একবার আসিলেই ধরিয়া দেয়ানে লইয়া যাইব।"

সে সময়ে নবদ্বীপে দুইজন দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল। তাহারা ব্রাহ্মণের সন্তান, কিন্তু তাহাদের অকার্য্য দুষ্কর্ম্ম কিছুই ছিল না, মদ্যপান, গোমাংসভক্ষণ, গৃহদাহন, চুরিডাকাতি প্রভৃতি তাহাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। সারাদিন

মাতাল অবস্থায় তাহারা রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পথিক দেখিতে পাইলেই ধরিয়া প্রহার করিত। নিত্যানন্দ ও হরিদাস নামপ্রচারে বহির্গত হইয়া একদিন দস্যুদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং পথিপার্শ্বস্থ কয়েকজন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দস্যুদ্বয়ের পরিচয় অবগত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া নিত্যানন্দের হৃদয় করুণায় দ্রব ভূত হইল। তিনি মনে মনে তাহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন পাপীর উদ্ধারের জন্যই গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এমন পাতকী আর কোথায় আছে? প্রভু লোকচক্ষুর অন্তরালে মুষ্টিমেয় ভক্তের নিকট আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন কিন্তু বাহিরের লোকে তাঁহার প্রভাবের কোন পরিচয় না পাইয়া উপহাস করিতেছে। এই দুই পাপী যদি তাঁহার কৃপায় উদ্ধার হইয়া যায়, তাহা হইলে সকলে তাঁহার প্রভাবের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবে।

তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ে করে যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
এখনে যে মদে মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
"মোর প্রভু" বলি যদি কাঁদে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাই প্রকাশ্যে হরিদাসকে কহিলেন, "হরিদাস, এই হতভাগা মানব দুইটার দুর্ভাগা দেখিতে পাইয়াছ? ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও ইহারা যেরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত আছে, তাহাতে ইহাদের পরিত্রাণের আর উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। হে কারুণিক, যবনগণ তোমাকে প্রাণান্তক ভাবে প্রহার করিলেও তুমি তাহাদের ইষ্টচিন্তাই করিয়াছিলে; এই দুর্ভাগ্যদ্বয়ের শুভানুসন্ধান করিবে না কি? প্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন তোমার সঙ্কল্পের তিনি অন্যথা করেন না। তুমি একবার ইচ্ছা করিলেই ইহারা উদ্ধার পায়।" হরিদাস কহিলেন "তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন ইহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। প্রভুর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার কখন পরিপন্থী হয় না।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "প্রভুর আদেশ সকলেই কৃষ্ণভজনা করিবে। পাপীদের প্রতি তাঁহার আদেশ বিশেষরূপে প্রযুজ্য। আমরা কৃষ্ণনাম বিলাইবার ভার পাইয়াছি, ফল আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। চল, আমরা গিয়া দস্যুদিগকে কৃষ্ণনাম প্রদান করি। তাহারা যদি সে নাম গ্রহণ না করে তাহাতে আমাদের অপরাধ নাই। অনন্তর উভয়ে দস্যুদ্বয়ের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে দস্যুদলের নিকট যাইতে দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা বিশেষরূপে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে নিষেধ উপেক্ষা করিয়া ভক্তদ্বয় দস্যুদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥"

শুনিয়া দস্যুদ্বয় আরক্তলোচনে তাহাদিগের দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে

ধরিবার জন্য ধাবমান হইল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস বেগতিক দেখিয়া পলায়নপর হইলেন। দস্যুদ্বয় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেল। অবশেষে মদের নেশায় পরস্পর মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইল। দস্যুভয়মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভক্তগণবেষ্টিত গৌরচন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। দস্যুদ্বয়ের পরিচয় পাইয়া গৌর কহিলেন, "বেটারা এখানে আসিলে আমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব।" শুনিয়া নিত্যানন্দ কহিলেন, "যা ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড কর, কিন্তু আমি বলিয়া রাখিতেছি, আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। ইহারাও যদি গোবিন্দ না বলিল, তবে তোমার আর বড়াই কিসের? ধার্ম্মিক যে সে ত স্বভাবতঃই কৃষ্ণনাম করে, ইহাদিগকে যদি ভক্তিদান করিয়া উদ্ধার কর, তবে ত বুঝি তুমি বাস্তবিকই পতিতপাবন। আমাকে ত্রাণ করিয়া তোমার মহিমা যতটা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।" গৌর হাসিয়া বলিলেন "তোমার দর্শন যখন তাহারা পাইয়াছে; তখনই তাহাদের উদ্ধার হইয়াছে। তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল বিশেষভাবে কামনা করিতেছ, তখন জানিও কৃষ্ণ অচিরাৎ তাহাদিগের উদ্ধার করিবেন।"

ইহার কয়েক দিন পরে নগর ভ্রমণান্তে নিত্যানন্দ রাত্রিকালে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন; এমন সময় "কে রে, কে রে" বলিয়া জগাই মাধাই তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। নিত্যানন্দ পলায়ন করিলেন না। বলিলেন "আমি অবধূত, প্রভুর বাড়ী যাইতেছি।" অমনি মাধাই সক্রোধে সম্মুখস্থ একখণ্ড কলসীভাঙ্গা মুটকী লইয়া সবলে নিত্যানন্দের মস্তকে নিক্ষেপ করিল। নিত্যানন্দের আহত মস্তক হইতে রক্তধারা ছুটিল। তিনি তখনও পলায়ন করিলেন না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গোবিন্দ-নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। মাধাই এক হস্তে তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া দ্বিতীয় হস্তে তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য আবার মুটকী কুড়াইয়া লইল, কিন্তু অবধূতের মস্তকগলিত অবিরল শোণিতধারা দেখিয়া জগাই শিহরিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব করুণার বেদনায় তাহার হৃদয় পীড়িত হইয়া উঠিল। মাধাইয়ের দুই হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া জগাই বলিল, "আর মারিস না মাধাই, কেন তুই এমন নিষ্ঠুর কাজ করিলি? এই দেশান্তরী অবধূতকে মারিয়া তোর কি লাভ হ'বে?" পথের ধারে লোক ছিল, দৌড়িয়া গিয়া নিত্যানন্দের দুরবস্থার কথা গৌরকে জানাইল। ভক্তগণসহ গৌর আসিয়া দেখিলেন রক্তাক্ত-কলেবর নিত্যানন্দ হাস্য করিতেছেন। নিত্যানন্দের শরীরে রক্ত দেখিয়া গৌরের রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। "চক্র চক্র" বলিয়া তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিব্য সুদর্শনচক্র তাঁহার হস্তসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাগবতগণ মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ভয়ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "স্থির হও, স্থির হও, প্রভু রোষ সংবরণ কর।

মাধাই আমাকে মারিয়াছে সত্য, কিন্তু জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে। আমার যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহাতে আমার কষ্ট হয় নাই। এই দুইজনের শরীর আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। দয়াময় দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।" জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছে শুনিয়া গৌর প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "জগাই, তুমি আমাকে কিনিয়া রাখিলে। কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন। তুমি আজ হইতে প্রেমভক্তি লাভ কর।" জগাই এই কথা শুনিয়া প্রেমাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভক্তগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন—

প্রভু বোলে, "জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম ভক্তি দান দিল তোরে।"

জগাই দেখিতে পাইল, গৌর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হইয়া চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইল। গৌর তাঁহার বক্ষে চরণ অর্পণ করিলেন।

মাধাই নিকটে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্তের মলিনতা ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইয়া গেল। নিত্যানন্দের বসন ত্যাগ করিয়া সে দৌড়িয়া গিয়া গৌরের চরণ ধারণ করিয়া কহিল, "প্রভু দুইজনেই একসঙ্গে পাপ করিয়াছি, জগাইকে তুমি কৃপা করিলে, আমি কি তোমার কৃপায় বঞ্চিত থাকিব।" গৌর কহিলেন, "তুই নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়াছিস্; তোর পরিত্রাণ আমি দেখিতে পাইতেছি না।" মাধাই চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিল এবং কাতরভাবে বার বার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন সদয় হইয়া গৌর কহিলেন, "তুমি নিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।" মাধাই নিত্যানন্দের পাদমূলে পতিত হইল। নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন, "নিতাই, তোমার রক্তপাত করিয়া মাধাই এখন তোমারই চরণে প্রণত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে তুমি মাধাইকে ক্ষমা করিতে পার।" নিতাই কহিলেন, "প্রভু, আমার নিকট মাধাই যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না। তোমার ভৃত্য যে কৃপা করে, সে তোমারই কৃপা। আমার যদি কোন জন্মকৃত কিছুমাত্রও সুকৃতি থাকে সব আমি মাধাইকে দান করিলাম। মাধাই তোমারই। মায়াময়, মায়া ত্যাগ করিয়া এখন মাধাইকে কৃপা কর।" গৌর কহিলেন "যদি ক্ষমাই করিলে, তবে তাহাকে আলিঙ্গন কর।" নিত্যানন্দ প্রেমভরে মাধাইকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। নূতন জন্ম লাভ করিয়া জগাই মাধাই গৌরের স্তব করিতে লাগিল। গৌর কহিলেন, "আর কখন পাপ করিও না। কোটীজন্মে তোমরা যে পাপ করিয়াছ, যদি আর পাপ না কর তবে সে পাপের ভার আমি গ্রহণ করিলাম।" জগাই মাধাই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌরের আদেশে ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া উভয়কে গৌরের গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় গৌর কহিলেন, "পূর্ব্বে ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে লোকে অশুচিবোধে গঙ্গাস্নান করিত। আমি ইহাদিগকে এত সাধু করিয়া তুলিব

যে ইহাদের স্পর্শে গঙ্গাস্নান-ফল লাভ হইবে। ইহারা আর মদ্যপ নহে, ইহারা আমার সেবক। ভক্তগণ, সকলে ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।" ভক্তগণ জগাই-মাধাইকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তদবধি জগাই-মাধাই পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নান করতঃ দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়া তাহারা "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া অহর্নিশ রোদন করিত। পূর্ব্বের হিংস্র-ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহাদের হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইত। কেবল গৌর ও নিত্যানন্দের কৃপা মনে হইলে তাহাদের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইত। ভোজনে তাহাদিগের রুচি রহিল না। জীবনের লালসা অন্তর্হিত হইল। গৌর নিজে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। অনুতাপ-জর্জ্জরিত মাধাই একদিন নিত্যানন্দকে একাকী দেখিতে পাইয়া তাহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং অশ্রুজলে চরণ ধৌত করিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোমার পবিত্র অঙ্গে আঘাত করিয়াছি। তোমার রক্তপাত করিয়াছি। আমায় মার্জ্জনা কর।" নিতাই নানারূপ প্রবোধ-বাক্যে মাধাইকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি গঙ্গার ঘাট সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। লোকে সুখে গঙ্গাস্নান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে। যাহাকে দেখিবে অতি বিনীতভাবে তাহাকেই নমস্কার করিবে।" নিত্যানন্দের উপদেশ মাধাই অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিল। যাহাকে দেখিতে পাইত, তাহাকেই প্রণাম করিয়া মাধাই বলিত, "জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমার নিকট যত অপরাধ করিয়াছি, সকল ক্ষমা কর।" গঙ্গার ঘাট ত্যাগ করিয়া মাধাই কোথাও যাইত না। তাহার স্বহস্তরচিত ঘাট "মাধাইয়ের ঘাট" বলিয়া নবদ্বীপে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তাহার কঠোর তপস্যায় লোকে তাহাকে ব্রহ্মচারী আখ্যা প্রদান করিল।

জগাই-মাধাইয়ের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন-কাহিনী দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীহন্তা, নরহন্তা, গোব্রাহ্মণহন্তা পরম দুর্ব্বৃত্ত দস্যু গৌরের কৃপায় পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। গৌর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া সকলের ধারণা জন্মিল।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জীবনটা কি ?

প্রবন্ধ-শীর্ষের এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়া পণ্ডিত-মূর্খ, দার্শনিক-অদার্শনিক, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক কত লোকে যে কত কথা বলিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। বোধ হয় যে দিন চিন্তা করিবার শক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই প্রশ্নটির সদুত্তরের জন্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আজও তাহার উত্তর মিলিল

না। ঘোর দার্শনিক তাঁর পাঁজি পুঁথি খুলিয়া হয় ত গম্ভীরভাবে বলিবেন, এই যে তুমি, আমি, ঘটপট যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই মায়ার রচনা। রসিক কবি হাস্যমুখে বলিবেন,

"নাঃ জীবনা কিছু না,
একটা ইঃ একটা উঃ একটা আঃ"

কিন্তু ইহাতে তো মন বুঝে না। এই সংসারটা না হয় মায়াই হইল, এবং জীবনটা না হয় একটা ইঃ একটা উঃ এবং আর একটা আঃ হইল, সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল কিন্তু এত তত্ত্বজ্ঞানটুকু দিয়া মনকে তো শান্ত করা যায় না। যে সকল জিনিষ জড়, কি প্রকারে তাহারা চেতনা পায় এবং কি প্রকারে তাহাদের ভিতরে জীবনের নানা অদ্ভুত কার্য্য চলিতে থাকে, মন তাহাই জানিতে চায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া প্রশ্নটা আসিয়া পড়িল বিজ্ঞানে। আধুনিক বিজ্ঞানে ইহার কি প্রকার উত্তর পাওয়া যায় আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আভাস দিব।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রশ্নটির উত্তর চাহিলে তাঁহারা বলেন, দুগ্ধে 'দম্বল' অর্থাৎ দধিবীজ দিলে তাহা যেমন গাঁজিয়া উঠিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার রূপান্তর পাইয়াই জীবনের কার্য্য চলে। দুগ্ধে দধিবীজ দেওয়াই গাঁজানো বা মাতানোর (Fermentation) একমাত্র উদাহরণ নয়। ময়দা বা সুজিতে খামী দিয়া যখন আমরা পাঁউরুটি প্রস্তুত করি, ভাতে জল দিয়া আমরা যখন পান্তাভাত প্রস্তুত করি, তখনো আমরা ঐসব জিনিষকে গাঁজাই। বিজ্ঞানের মতে, আমরা যাহাকে জীবন বলি, তাহা এই প্রকারের নানা গাঁজানো বা মাতানো লইয়াই চলে কথাটা হঠাৎ শুনিলে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততার এত প্রমাণ আছে যে, ইহাকে সত্য বলিয়া মানিতেই হইতেছে।

কখনই কোন বৃহৎ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা একদিনে এবং এক জনের চেষ্টায় হয় নাই। কেহ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কেহ সেগুলিকে একত্র করিয়াছেন, কেহ বা তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যুগ-যুগান্তের চেষ্টায় এই প্রকারেই এক একটি সিদ্ধান্ত দাড়াইয়া যায়। আমরা যে সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহারও প্রতিষ্ঠা ঐ প্রকারে ধীরে ধীরে হইতেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বহু শারীর তত্ত্ববিদের হস্ত চক্ষু হইতে ধরা পড়ে। যাঁহারা ইহার গোড়া পত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে, প্রথমেই ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত পাষ্টুরের (Pasteur) কথা মনে আসে। দুগ্ধে দধিবীজ দিলে বা ময়দায় খামী দিলে সেগুলি কেন গাঁজিয়া রূপান্তরিত হয়, ইহা লইয়া তিনি এক সময় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে জানিয়াছিলেন, এক প্রকারের অতিক্ষুদ্র জীব দুগ্ধে বা ময়দায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা যখন দধি প্রস্তুত করিবার দুগ্ধে 'দম্বল' দিই, তখন সেই জীবাণুরই কতকগুলি দুগ্ধে ছাড়িয়া দিই, তার পর সেগুলি বংশ বিস্তার করিয়া সমস্ত দুগ্ধকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে দুগ্ধ দধির মূর্ত্তি

গ্রহণ করে। কেবল ইহাও নহে,—ওলাউঠা ডিপথিরিয়া প্রভৃতি নানা রোগের মূলেও তিনি ঐরূপ জীবাণুর কার্য্য দেখিয়াছিলেন। ঐ সকল রোগের জীবাণু মানুষ বা অপর প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বংশবিস্তার করিতে থাকিলেই যে, প্রাচীন দেহে ঐ বিশেষ বিশেষ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। তা ছাড়া প্রাণীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখাতেও তিনি বিশেষ বিশেষ জীবাণুর কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পাষ্টুর পরম বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং রসায়নবিদ্যায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, জীবাণু-দ্বারা মানুষের দেহে বা নানা জড়পদার্থে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। কিন্তু এই কথা প্রকাশ করিবার পাপ তিনি নিজস্কন্ধে লইতে সাহস করেন নাই। জীবনের কার্য্যের সঙ্গে যে, রাসায়নিক কার্য্যের কোনও সম্বন্ধ আছে তাহা প্রকাশ করা সত্যই সে সময়ে পাপের বিষয় ছিল। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণও তখন জীবনের কার্য্যকে একটা সৃষ্টিছাড়া রহস্য-ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন! পরীক্ষাগারে নানা পদার্থের যোগবিয়োগে আমরা যে সকল ঘটনা ঘটিতে দেখি, এবং যে প্রাকৃতিক নিয়মের সাক্ষাৎ পাই, তাহা জীবশরীরের কার্য্যে কখনই চলে না, এই এক সংস্কার তাৎকালিক বৈজ্ঞানিকদিগের মনে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই প্রাণিদেহে জীবাণুর কার্য্য সম্পূর্ণ জৈব কার্য্য বলিয়াই স্থির হইয়া রহিল, ইহার সহিত রাসায়নিক কার্য্যের যে কোন যোগ থাকিতে পারে তাহা আর কাহারও মনে হইল না।

পাষ্টুরের মৃত্যুর পর জর্ম্মাণীতে বুক্‌নার (Buchner) নামক এক অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাঁর স্বাধীন চিত্ত সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে নাই। জীবাণুর কার্য্য, গোড়ায় জৈব কার্য্য হইলেও তাহা যে রাসায়নিক কার্য্য তাহা তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল প্রচার করা নয়, হাতে হাতে তাহা দেখাইতেও লাগিলেন। 'দম্বল' বা অপর কোন খামী (yeast) লইয়া তিনি সেগুলির উপর চাপ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, খামীর কোষগুলি (cells) ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেগুলি হইতে এক-প্রকার রস নির্গত হইতে লাগিল। বুক্‌নার এই রস পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে লাগিলেন, তাজা জীবাণুযুক্ত বীজ নিক্ষেপ করিলে দুগ্ধ বা চিনির রস প্রভৃতিতে যে পরিবর্ত্তন হয়, ঐ সকল জীবকোষের রস দিয়াও অবিকল সেই পরিবর্ত্তনই সুরু হয়। লোকে বুঝিতে লাগিল জীবাণুর কার্য্যে জীবনীশক্তি নামক কোন রহস্য জড়িত নাই। ইহাতে জীবাণুগণ তাহাদের দেহে কি প্রকারে রস প্রস্তুত করে তাহা স্থির হইল না বটে, কিন্তু সেই রসই যে, নানা পদার্থের সহিত মিলিয়া রাসায়নিক ক্রিয়া চালায় তাহাতে আর কাহার সন্দেহ রহিল না। পাষ্টুর সাহেব যে 'জীবনী-শক্তি'র ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন নাই, তাহার ভিত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইহার অব্যবহিত পরে বার্ট্রাণ্ড (Gabriel Bertrand) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাতে ইনি যে ফল পাইয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের কার্য্য ও রাসায়নিক কার্য্যের একতা আরো সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। জীবনশক্তি ও রাসায়নিক শক্তির একতার কথা ইতিপূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত লাভোসিয়ার দেখাইয়াছিলেন। পরীক্ষাগারে অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে হইলে আমরা যেমন কখন কখন বায়ুর নাইট্রোজেন্‌কে বর্জন করিয়া অক্সিজেন্‌কে গ্রহণ করি, প্রাণীর ফুস্‌ফুস্‌ও যে ঠিক সেই প্রকারেই অক্সিজেন্ সংগ্রহ করিয়া জীবনের কার্য্য চালায়, তাহা বহুপূর্ব্বে এই লাভোসিয়ার সাহেবই প্রচার করিয়াছিলেন। বার্ট্রাণ্ড সাহেব দেখাইতে লাগিলেন, প্রাণীর ফুস্‌ফুসে এমন একটি জিনিষ আছে, বায়ু হইতে অক্সিজেন্ সংগ্রহ করাই যাহার কাজ। তাপপ্রয়োগে তাহা নষ্ট হয়, এসিড্ বা বিষের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার ক্রিয়া লোপ পায়। ইহার প্রত্যেক কার্য্য পাষ্টুরের আবিষ্কৃত সেই খামীর (yeast cells) কার্য্যের সহিত অবিকল মিলিয়া গেল। বার্টাণ্ড সাহেব এই জিনিষটাকে Oxydase নামে অভিহিত করিলেন।

এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ও শারীরবিদ্‌গণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পাষ্টুরের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছিলেন, সদ্য অঙ্কুরিত বীজে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা বীজের শ্বেতসারকে (starch) বিশ্লিষ্ট করিয়া অপর কতকগুলি নূতন পদার্থে রূপান্তরিত করে। প্রাণীর মুখের লালাতেও যে ঐ প্রকার একটা পদার্থ মিশ্রিত আছে তাহাও সকলে জানিয়াছিলেন। তার পর প্রাণীর পাকাশয়ে পেপ্‌সিন্ (pepsin) নামক একটা পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জিনিষটার গুণেই যে প্রাণীরা মাংস বা ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য আহার করিয়া হজম করিতে পারে তাহাও সকলে দেখিয়াছিলেন। যকৃৎ হইতে প্রাণীর দেহে, যে পিত্ত-রস (bile) নির্গত হয়, তাহা কি প্রকারে তৈলময় খাদ্যকে শরীরের কাজে লাগায় তাহারও আভাস পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পাকাশয়ের অপর রসগুলির কার্য্যের লক্ষণও বৈজ্ঞানিকদিগের জানা ছিল। পাষ্টুরের আবিষ্কার ও বার্ট্রাণ্ডের পরীক্ষার ফল প্রচারিত হইলে কাজেই এই সকল তথ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। জীবদেহের নানারসের কার্য্যের সহিত পাষ্টুরের আবিষ্কৃত 'খামী'র কার্য্যের একতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু, তথাপি খামী'র সজীব জীবাণু ও প্রাণিদেহের নানা রসের মধ্যে পার্থক্য রাখিবার জন্য, দেহ রসগুলিকে নানা লোকে নানা নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। কেহ সেগুলিকে Euzymes কেহ বা তাহাদিগকে Zymases বলিতে লাগিলেন।

যখন পাষ্টুরের আবিষ্কৃত জীবাণুর কার্য্যের

সহিত নানা শারীরিক কার্য্যের এই প্রকার ঐক্য একে একে ধরা পড়িতেছিল, তখন এক অভাবনীয় বাধা আসিয়া গবেষণার গতি রোধ করিয়া দিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, পাষ্টুরের সেই জীবাণুর কাজ কেবল জিনিষকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যখন শর্করায় আমরা বিশেষ জীবাণুযুক্ত খামী নিক্ষেপ করি, তখন তাহা শর্করা ভাঙ্গিয়া মদ্য (Alcohol) এবং অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic Acid) উৎপন্ন করিতে থাকে। পাকাশয়ের পেপ্‌সিন্ নামক রসও ঠিক ঐ প্রকারেই উদরস্থ খাদ্যের মাংস ইত্যাদিকে ভাঙ্গিয়া নানা নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। কিন্তু জীবদেহে ভাঙ্গার সহিত অবিরাম যে গড়ার কাজও চলিতেছে তাহার ব্যাখ্যান কোথায়? কেবল ভাঙ্গা লইয়াই ত জীবন নয়,—ভাঙ্গা ও গড়ার অপূর্ব্ব যোগেই জীবনের কার্য্য। সুতরাং গাঁজানো (Fermentation) লইয়াই জীবন, এই কথা বলিয়া যাঁহারা জয়োল্লাসে উন্মত্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে কিছুদিনের জন্য নীরব থাকিতে হইল।

কিন্তু গবেষণার বিরাম হইল না,—নানা দেশে নানা বৈজ্ঞানিক গাঁজানোর কার্য্যে কোন নূতন জিনিষ গঠিত হয় কি না, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কত জিনিষের কত প্রকার খামী লইয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পরীক্ষাতেই সংগঠন দেখা গেল না। শেষে ইংরাজ রসায়নবিদ্ হিল্ সাহেব (Croft Hill) এক পরীক্ষায় খামী দ্বারা প্রকৃত সংগঠন দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। শ্বেতসারে (Starch) খামী দিলে তাহা চিনি প্রভৃতি পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। যতক্ষণ শ্বেতসারের এক কণিকা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ এই পরিবর্ত্তনের বিরাম হয় না। শ্বেতসার নিঃশেষিত হইলে এই কার্য্যের লোপ ঘটে, এবং নূতন শ্বেতসার দিলে পুনরায় ঐ বিশ্লেষণ সুরু হয়। হিল্ সাহেব একটি পাত্রে শ্বেতসারের সহিত খামী (malt Enzyme) মিশাইয়া, তাহকে নিঃশেষে বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, এবং পরে তাহাতে ধীরে ধীরে চিনি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।—এই প্রকারে দেখা গিয়াছিল, চিনির যোগে শ্বেতসারের আবার পুনর্গঠন আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই পাষ্টুরের গাঁজানোর কার্য্যে যেমন পদার্থের বিশ্লেষণ ঘটে, তাহাতে সেই প্রকারে নূতন পদার্থের যে সংগঠনও হইতে পারে তাহা বুঝা গেল। হিল্ সাহেবের এই আবিষ্কার অতি অল্প দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে, বোধ হয় দশ বারো বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু একমাত্র উদাহরণে বৈজ্ঞানিকগণ সন্তুষ্ট হইলেন না, নানা দেশের পণ্ডিতগণ নূতন উদাহরণ সংগ্রহের জন্য গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জর্ম্মাণীর জনৈক বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ইমারলিঙ্ সাহেব (Emmerling) আর একটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ইনি বাদামের তৈলে একপ্রকার খামী দিয়া সেটিকে চিনি এবং হাইড্রোসাইনিক্ এসিড্ (Hydrocya-

nic acid) নামক এক বিষ-পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পরেই তাহাতে আর একপ্রকার খামী (malt ferment) দিবা মাত্র সেটি আবার বাদামের তৈলে পুনর্গঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই আবিষ্কারের পর হইতে প্রতি বৎসরেই খামীর যোগে আরো নূতন নূতন জিনিষের উৎপত্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পাষ্টুরের আবিষ্কৃত তত্ত্ব পদার্থের বিশ্লেষণেই যে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, এক খামীর যোগে যেমন আমরা শ্বেতসারকে ভাঙ্গিয়া চিনি ইত্যাদিতে বিশ্লিষ্ট করি এবং তার পর কিছুর যোগে তাহাকে আবার শ্বেতসারে পুনর্গঠিত করি, প্রাণিদেহে অবিকল সেই প্রকারেই ভাঙ্গাগড়া অবিরাম চলিতেছে। কোন দেহজ খামী উদরস্থ আমিষ খাদ্যকে ভাঙ্গিতেছে, কেহ তৈলময় খাদ্যকে বিশ্লিষ্ট করিতেছে। তার পরে আর এক নূতন খামী ঐগুলির সঙ্গে মিশিয়া হয় ত এমন কতকগুলি জিনিষের গঠন করিতেছে যাহা স্থায়ীরূপে দেহেরই অংশ হইয়া পড়িতেছে।

এই সকল আবিষ্কার দ্বারা শারীরতত্ত্ব যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে যতই গবেষণা করিতেছেন, নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেছ। আধুনিক শারীর-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, দেহের সূচ্যগ্র প্রমাণ স্থানে কোটি কোটি জীবকোষ (cells) অবস্থান করিতেছে। ইহাদের এক একটি কোষ এক একটি বৃহৎ বিজ্ঞানাগার বিশেষ। একই বিজ্ঞানাগারে বসিয়া যেমন বহু লোকে নানা পদার্থ প্রস্তুত করেন,—ঐ এক একটি কোষের ভিতরেই দশ বারটি প্রকোষ্ঠে দশ বারো রকম খামী (ferment) আপনা হইতেই প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রয়োজন বুঝিয়া এই সকল রসই ভাঙ্গা-গড়ার কাজে যোগ দেয় এবং জীবনের কার্য্য দেখায়। প্রাণীর যকৃতের এক একটি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম কোষে যে সকল খামী প্রস্তুত হয়, সেগুলির মধ্যে কোনটি চিনি প্রস্তুত করে, কোনটি অম্ল প্রস্তুত করে, কোনটি ইউরিয়া (urea), কোনটি পিত্তরস এবং কোনটি নানাপ্রকার রঙ্‌ উৎপন্ন করিতে ব্যস্ত থাকে। আবার কতকগুলি দেহস্থ বিষপদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নষ্ট করিতে থাকে, কতকগুলি হয় ত পাকাশয়ে উৎপন্ন অম্লকে অপর পদার্থের সহিত মিশাইতে ব্যাপৃত থাকে। কেবল যকৃতে নয়, প্লীহা, মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি দেহের সকল অংশেই কোটি কোটি জীবকোষের এই প্রকার কার্য্য নিয়তই চলে। এমন কি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীতেও এই প্রকার বিশেষ খামী জন্মাইয়া ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া জীবনের কার্য্য দেখায়। সুতরাং দুগ্ধে দধির উৎপাদন এবং জীবনের কার্য্য একই বলিয়া আমরা প্রবন্ধারম্ভে যে-কথাটার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা যে নিরর্থক নয়, এই সকল পরীক্ষা-দৃষ্ট ব্যাপার হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ জীবদেহের যে

খামীকে জীবনীশক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই সকল Enzymes or Zymases জিনিষটি কি? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। ইহার যথার্থ উত্তর দেওয়াই আজকাল বৈজ্ঞানিকদিগের সাধনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কত দেশে কত বৈজ্ঞানিক যে নীরবে গবেষণা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। কোন্ শুভদিনে ইহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা ঠিক্ বলা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাসায়নিক প্রথায় বিরোধ করিলে সেই হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন এবং অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই ঐ সকল পদার্থে ধরা পড়ে না। কি প্রকারে এই সকল সুপরিচিত পদার্থ সংযুক্ত হইয়া জীবনাশক্তির প্রকাশ করে তাহা বিজ্ঞানের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রসায়নবিদ্‌গণ যেমন অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্‌কে একত্র করিয়া পরীক্ষাগারে জল প্রস্তুত করিতে পারেন, সেই প্রকারে যে দিন তাঁহারা অঙ্গার, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ইত্যাদিকে মিলাইয়া এক বিন্দু খামী (Ferment) বা একটি জীবকোষ প্রস্তুত করিতে পারিবেন সেই দিনই বিজ্ঞান ধন্য হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

চীনে প্রজাতন্ত্র

রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সর্দ্দারদিগের সম্মুখে আর এক সমস্যা এই যে, রিপাব্লিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছেন কি না এবং তাহার মাল মসলা সমস্ত সংগ্রহ হইয়াছে কি না?

এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে চীনে প্রজাতন্ত্রশাসনের উপযোগী কি কি মাল-মসলা প্রস্তুত আছে।

প্রজাতন্ত্রের সাপক্ষে চীনের মুদ্রাযন্ত্রের প্রাদুর্ভাব বেশ আছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে চীনে বহু সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে পেকিনে এক গবর্ণমেণ্ট গেজেট ছাড়া অন্য কোন সংবাদপত্র ছিল না, কিন্তু এখন তথায় ষোল খানা দৈনিক কাগজ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একখানি তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পরিচালিত। সমগ্র দেশে বর্ত্তমানে মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজের সংখ্যা মোট ২৭০ খানা।

জাতীয় সমিতি সকল এবং সিনেট স্থাপনের পর বক্তৃতা করার প্রণালী প্রচলিত হইল। পূর্ব্বে বক্তৃতাকারীকে লোকে পাগল বলিত, অথবা তাহার কার্য্যকে অভদ্রতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু প্রজাতন্ত্র-শাসনের উপযুক্ত মাল-মসলা চীনে এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

প্রজাতন্ত্রশাসনের আর এক অন্তরায় এই যে, চীনের জনসাধারণের দরিদ্রতা। নিজে নির্ধনী হইয়া জাপানের পক্ষে চীনকে দরিদ্র বলিয়া নিন্দা করাটা ভাল দেখায় না। তথাপিও এ কথা সত্য যে, চীনে লক্ষ লক্ষ লোক অতি কষ্টে দিন

যাপন করে। একজন মজুরের গড়পড়তা দৈনিক আয় তিন পেনি হইতে ছয় পেনি (ছয় আনা)। সমস্ত নিষ্কর্ম্মা লোকের ভাগ্যে যদি ইহাও মিলিয়া যায় তাহাও সৌভাগ্য মনে করা যাইতে পারে।

চীন জাতি পরিশ্রমী, শিল্পনিপুণ এবং বাণিজ্যব্যবসায়ে ইহারা অতি চতুর ও ক্ষমতাশালী। এমতাবস্থায় এই জাতির অধিকাংশ লোক কেন কষ্টে দিন যাপন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, চীন জাতির দরিদ্রতার মূল কারণ তাহাদের পরিবার-গঠন প্রণালী।

প্রত্যেক পুরুষকেই, মূকবধিরকেও পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে হইবে। সে পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হউক আর না হউক; বিবাহের খরচ থাকুক বা না থাকুক, সে উপার্জ্জনক্ষম হউক আর না হউক, তাহার গলায় একটা স্ত্রী দিতেই হইবে। বিবাহ করিয়া কি খাইবে সে ধারণা পূর্ব্বে কখনও করে না। এই অন্ন-কষ্টের উপর আবার প্রতি বৎসর একটী করিয়া সন্তান জন্মিতে থাকিলে সোণায় সোহাগা। চীনাদের বৃহৎ পরিবার সৃষ্টি করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্রতার আর এক কারণ।

৪

এখন বিচার করা কর্ত্তব্য যে, চীনের জনসাধারণ কি পরিমাণে বর্ত্তমান ধরণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে ১৯০৮-০৯ খৃঃ সমস্ত রাজ্যে ৫২৬৫০টী স্কুলের মধ্যে ১৬৬১২০ ছাত্র ছিল। এ সকল সাধারণ স্কুলের ছাত্র। এতদ্ব্যতীত ইউরোপে ৫০০ ইউনাইটেড ষ্টেটসে ৭১৭ জাপানে ১৫০০ মোট ২৭১৭ জন ছাত্র বিদেশে শিক্ষা পাইতেছে। চীনা ছাত্রের সংখ্যা জাপানে এখন কমিয়াছে। পূর্ব্বে এক জাপানেই ৮০০০ ছাত্র ছিল।

খুব কড়া-কড়ি হিসাব না করিয়া মোটা-মুটি ধরিলে যত ছাত্র গত বিশ বৎসর বিদেশে শিক্ষা পাইযাছে, তাহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষ ধরা যাউক। এবং দেশে যত লোক বর্ত্তমান প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা দশ লক্ষ ধরিলাম। ইহা ভিন্ন বিদেশী গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিয়া এবং মিশনারি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক সকল ধরিলে ৪০,০০০০০ হইবে। ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত লোক-সংখ্যার তুলনায় চীন দেশে শিক্ষিত লোকের অনুপাত শতকরা একজন হইবে। এই শতকরা একজন শিক্ষিত লোকের দ্বারা কি একটী প্রজাতন্ত্রের কার্য্য চলিতে পারে।

আমার এ কথা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, চীনারা অশিক্ষিত বা অজ্ঞ লোক। তাহাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য কোন সভ্য দেশের সাহিত্য অপেক্ষা হীন নহে। আমার বলা উদ্দেশ্য এই যে, বিদেশী ধরণে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এত নগণ্য যে তাহা দ্বারা এই বিস্তীর্ণ দেশে রিপাবলিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলিতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্য বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষে কোনই উপকারে আসিবে না এবং পদে পদে বিঘ্ন জন্মাইবে।

চীনের ভবিষ্যতের প্রতি আমার দৃঢ়

বিশ্বাস আছে। যেমন তাঁহাদের অতীত ইতিহাস, ভরসা করি, ভবিষ্যৎ ইতিহাসও তাদৃশ উজ্জ্বল হইবে।

বর্ত্তমান য়্যাংগ্লো-স্যাক্সন জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বনজঙ্গলে বাস করিত, তখন চীনজাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। তাহাদের ভূরি ভূরি সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি তখন সমুন্নত অবস্থায় ছিল। প্রায় সমস্ত আসিয়ার উপর চীনের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত। এমন কি, ইউরোপে ডানিউব নদী পর্য্যন্ত চীনের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। চীনসম্রাটের দূতদিগকে ইউরোপের রাজাগণ এক সময়ে অবনত জানুতে অভিবাদন করিতেন। বর্ত্তমান রুষজাতির পূর্ব্বপুরুষ শ্ল্যাভগণ অবনতজানু হইয়া চীনকে কর প্রদান করিত। চীনের দীর্ঘ জীবনে একে একে কত শত রাজ্যের অভ্যুদয় হইল এবং যথাক্রমে তাহাদের অধঃপতন হইল; চীনের সমসাময়িক ইজিপ্ট ধূলিধূসরিত হইল। ডেরায়সের রাজ্য কোথায় গেল, গর্ব্বিত গ্রীস বা গৌরবান্বিত রোম এখন কোথায়? তাহাদের কীর্ত্তি এখন ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য!

এই জাতির পর জাতির অধঃপতনের মধ্যে চীন জাতি এখনও জীবিত আছে। এ কথা সত্য যে চীনে বহুবার রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে এবং এক রাজবংশের পরিবর্ত্তে অন্য রাজবংশ স্থাপিত হইয়াছে। বিদেশীয়গণ আসিয়া চীন জয় করিয়াছে, কিন্তু চীনকে বাহুবলে যেই জয় করুক না কেন, নৈতিক ও ধর্ম্মবলে চীন সমস্ত বিজেতাকে আপনার মধ্যে এমনভাবে মিলাইয়াছে যে শেষে জেতা-বিজেতার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নাই। এ যাত্রায় চীন কি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, না পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে? কি প্রণালীতে ইহার সংস্কার কার্য্য সাধিত হয় তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি না করিতে পারিলে ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন।

৫

চীনের উচিত ছিল—অতি সাবধানে ধীরে ধীরে কার্য্য করা। বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে এইভাবে চলা নিতান্তই প্রয়োজন ছিল।

মাঞ্চুশাসনকর্ত্তাদিগের অদূরদর্শিতা এবং অকর্ম্মণ্যতার ফলে অতি রক্ষণশীল চীনজাতি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বিদেশী শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া এক সঙ্কটপূর্ণ বিষম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যদি এই নূতন শাসনপ্রণালীতে ইহ[illegible] কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলে [illegible] ছারখার হইবে, অন্তর্বিবাদ ও অরাজক[illegible] বৃদ্ধি পাইবে এবং সম্ভবতঃ বিদেশী[illegible] ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন।

যে অল্প সময়ের মধ্যে চীনে প্রজা[illegible] শাসনপ্রণালী প্রচলন করা হইয়াছে, তা[illegible] ইহার সাফল্যের প্রতি গুরুতর সন্দে[illegible] আছে।

চীনের ন্যায় জাপানের শিক্ষা ও পূর্ব্বগৌরব থাকা সত্ত্বেও জাপানকে বিশ বৎসর যাবত নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলনের জ[illegible] শিক্ষানবিশি করিতে হইয়াছিল। এই নিয়ম[illegible] শাসনপ্রণালীও রক্ষণশীল রাজার স্বেচ্ছাপ্র[illegible]

জিনিষ। বর্ত্তমানে যে ইহা সফলকাম হইয়াছে তাহাও কেবল রাজার বিশেষ প্রতিপত্তির দ্বারা। চীনে রাজ্যের কেন্দ্রীভূত রাজশক্তিকে যে কেবলমাত্র নষ্ট করা হইয়াছে, তাহা নহে। চীনের নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর বয়স মাত্র ছয় বৎসর। রুষজাপান যুদ্ধের পর হইতে চীনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে চীন গবর্ণমেণ্টের এক কমিসন বা অনুসন্ধানসমিতি গঠিত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। সেই কমিশন নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর স্বপক্ষে মত দেওয়ায় বৃদ্ধা রাণী তাহা মঞ্জুর করেন।

বৃদ্ধা রাণী যে রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞা ও দূরদর্শিনী ছিলেন তাহা তাহার আদেশ বা ঘোষণাপত্র দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। যথা "বর্ত্তমান সময়ে কোন্ প্রণালীতে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী গঠিত হইবে তাহা অবধারিত হয় নাই। জনসাধারণের এ বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয় নাই। আমরা যদি তাড়াতাড়ি দেশ-কালের অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কোন একটা নিয়ম খাড়া করি তাহা হইলে তাহা কেবল কাগজে-কলমেই থাকিয়া যাইবে।" সুতরাং নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলনের পূর্ব্বে কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার একটা মোটামুটি অবধারণ তিনি করিয়াছিলেন মাত্র। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে হউন-সি-আই টিন্‌সিনে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-প্রথা দ্বারা মিউনিসিপালিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই আদর্শ অনুসারে প্রাদেশিক সমিতি সকল গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার কার্য্য ১৯০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইতি মধ্যে জাতীয় সমিতি গঠনের জন্য দেশে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ঘোষণাপত্র দ্বারা জাতীয়-সমিতি স্থাপনের কথা প্রচারিত হইল। ১৯১১ খৃঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টে নিয়ম-তন্ত্র-শাসন-প্রণালীদ্বারা কি কি বিষয় সংস্কারের প্রয়োজন তাহার একটা অবধারণ করা হইয়াছিল, যথা—রাজ্যের আইন সংস্কার, অর্থনীতির সংস্কার, শিক্ষা-বিভাগ এবং সমস্ত রাজ্যে যাহাতে পুলিশের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা।

এই সকল বিভাগের সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন হইলে তবে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী স্থাপনের বিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু এই সংস্কার-কার্য্য সমস্তই প্রায় কাগজে কলমে থাকিয়া গেল, ইহা সম্পন্ন করিতে কেহ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। দেশে কেবল পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপনের জন্য অনবরত আন্দোলন হইতে লাগিল এবং পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপনের জন্য যে নয় বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল তাহা কমাইয়া তিন বৎসর ধার্য্য করা হইল। এই জাতীয় পার্লিয়ামেণ্টের ভ্রূণ স্বরূপ টুং চেং ইণ্ডিয়ান নামক সমিতি ২০০ মেম্বর দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। গত বৎসর এই সমিতিতে যখন নানা সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল তখন উঃ চাংএ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

শ্রীরামলাল সরকার।

৮ জগদীশনাথ রায়

ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া নোয়াখালি যাইবার পূর্ব্বে ৩।৪ বৎসর ধরিয়া জগদীশনাথ রায় কলিকাতায় ছিলেন, কয়েক বৎসর হরি ঘোষের ষ্ট্রীট অধুনা জগদীশ নাথ রায় লেন স্থিত তাঁহার বসত-বাটীটি গণ্যমান্য সাহিত্যসেবী বঙ্গের কৃতী সন্তানগণের সম্মিলনের একটি প্রধান স্থান ছিল; প্রত্যেক শনিবারে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আসিতেন, রবিবার থাকিয়া সোমবার প্রাতে চলিয়া যাইতেন। বঙ্কিম তখন বারুইপুর মহকুমায় ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। যে মহাত্মারা একত্রিত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি—রাজনারায়ণ বসু, প্যারিচরণ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামতনু লাহিড়ি, দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ধরণী কথক, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, জষ্টিস্ অনুকূল মুখোপাধ্যায়, তারাপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, জষ্টিস্ দ্বারিকানাথ মিত্র প্রভৃতি; ইংরাজদিগের ভিতর আসিতেন সার্ হেনরি কটন, সার হেনরি হ্যারিসন, জষ্টিস বেভারলি, ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্‌টার নরমান প্রভৃতি মহোদয়গণ। কথাবার্ত্তা যাহা হইত তাহা শুনিয়া অনেকেই বিশেষ শিক্ষালাভ করিতেন। এই বাড়ীতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকগুলি ছাপাইবার পূর্ব্বে জগদীশনাথ রায়কে পড়িয়া শুনাইতেন এবং তাঁহার মন্তব্য জানিয়া অদল বদল করিতেন, বঙ্কিম এবং জগদীশের মধ্যে যথার্থ সহোদরের ন্যায় ভালবাসা ছিল। বঙ্কিমের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যখন পদতলে ফোড়া হয়, তখন জগদীশনাথ রায়ের ভবনে তিনি ছিলেন, পরে অন্যত্র বাসা বাটী ভাড়া লওয়া হয়। সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চ্চা হইত, অনেক বড় গায়ক এবং বাদক এখানে সমবেত হইয়া আনন্দ করিতেন। একদিন মাইকেল জগদীশনাথ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার অমৃতাক্ষর ছন্দ গীত হইতে পারে কি না, জগদীশ তখনই সুর লয় দিয়া প্রমীলার বর্ণনাটি গাহিলেন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরও গীত হইত, জগদীশ ও মাইকেলে সুরতাল সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে, এমন সময় বঙ্কিম ঐ সম্বন্ধে কি টিকাটিপ্পনি করিলেন, মাইকেল রহস্যচ্ছলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুই ছোঁড়া চুপ কর, বুড়াদের কথায় আর যোগদান কর্ত্তে হবে না।" এই বাটীতেই জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র (তখন নবীন ছাত্র মাত্র) বঙ্কিম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে স্কটের আইভ্যানহো পড়িয়াছিলেন কি না?" বঙ্কিম উত্তর করিলেন যে ঐ পুস্তক তিনি আদৌ পাঠ করেন নাই।

আর দুই একটি গল্প বলিয়া নোয়াখালি

যাত্রার কথা বলিব। এড়েঁদহে একবার একটি ডাকাতি হয়, ডাকাতেরা বাড়ীওয়ালার প্রায় দশ হাজার টাকার দ্রব্য লুট করিয়া লইয়া যায়, স্থানীয় সব ইন্‌স্পেক্টার তদারক করিলেন, কিছু করিতে পারিলেন না, এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলিস্ সাহেব এবং কাপ্তেন বার্ড ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সারে জমিনে গিয়া বিস্তর চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না, বাড়ীওয়ালা হতাশ হইয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিল, তখন হুকুম হইল জনৈক সুযোগ্য কর্ম্মচারীকে পুনরায় তদারকের জন্য পাঠান হয়, তখন জগদীশনাথ রায়ের উপর এ ভার পড়িল, তিনি সপ্তাহ কাল কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন সাহেবেরা বলিলেন "কেন পরিশ্রম করিতেছ, ফল কিছু হইবে না।" জগদীশনাথ উত্তর করিলেন "সপ্তাহ কাল দেখিব, যদি কিছু করিতে না পারি, তবে ছাড়িয়া দিব।" জগদীশনাথ এ কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যত শুঁড়িকালয়, গুলির আড্ডা, সামান্য বারবনিতাদের ভবন ছিল সর্ব্বত্র ছদ্মবেশে পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ বৈকালে আসিয়া রিপোর্ট করিতে লাগিলেন। একদিন এক মুসলমান দারোগা আসিয়া বলিলেন যে "আজ দরমাহাটা কাঠের গোলার নিকট গুলির আড্ডায় গিয়াছিলাম, সেখানে গান-বাজনার চর্চ্চা আছে, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি দেখিলাম, একটা ভগ্ন সেতারও দেখিলাম।" জগদীশনাথ রায় বলিলেন "দেখ, গুলি খাও বা না খাও, ভাণ করিবে, আড্ডাধারীকে দুই আনার জায়গায় চারি আনা দিবে, তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া জানিয়া লইবে, ভাঙ্গা সেতারটা কার? সে তত্ত্ব লইয়া অমনি সেতারের মালিককে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে।" দারোগা চলিয়া গেলেন। গ্রীষ্ম কাল, আমরা সকলে ছাদে বসিয়া আছি, এমন সময় একটা খাঁটমুগরো মানুষকে দারোগা আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তাহাকে দেখিয়া জগদীশনাথ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কি করিস্?" সে বলিল "হাটখোলায় এক কাঠের গোলায় ছুতরের কর্ম্ম করি।" তখন রায় মহাশয় রাগের ভাণ করিয়া বলিলেন "ব্যাটা হারামজাদ, ছুতরি করবেন আর অবকাশ মত রাত্রে ডাকাতি করবেন, বেটা আমি সব জানি, এখন খুলে বল্, আমি তোকে বাঁচিয়ে দিব।" ছুতার উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল "হুজুর ঠিক বল্‌ব? আমায় বাঁচান।" এই বলিয়া সে আনুপূর্ব্বিক ডাকাতির কথা জানাইল, কে কে দলে ছিল, কোথায় চোরা মাল রাখা হইয়াছে ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সন্ধান দিল, তখন জগদীশনাথ দারোগাকে হুকুম দিলেন "তুমি আলিপুর লাইনে যাও, সেখানে যত কনষ্টেবল আবশ্যক হইবে, তাহা লইয়া আজই রাত্রে ছুতার যে যে লোকের নাম করিয়াছে, তাহাদের ধৃত করিবে এবং যে স্থান ও উল্লেখ করিয়াছে, সেখান হইতে, চোরাই মাল উদ্ধার করিবে, আমি রিজার্ভ ইন্‌স্পেকটারের

উপর হুকুম দিলাম, তোমার যত লোক আবশ্যক, সে দিবে।" পর দিন বেলা দশটার সময় জগদীশনাথ রায়ের বাটীতে পনর ষোল জন ডাকাতকে ধরিয়া আনিল এবং বামালের স্তূপ আনিয়া জড় করিল। এড়িয়াদহের ডাকাতি ব্যতীত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল ডাকাতি হইয়াছিল তাহারও বামাল বাহির হইল। গবর্ণমেণ্ট জগদীশনাথ রায়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁহার যশও পরিবর্দ্ধিত হইল।

আর একটা ঘটনা উল্লেখ করি। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বারুইপুর মহকুমার ভার, তখন তাঁহার এলাকার মধ্যে একটা ভীষণ ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা ধরা পড়িল, কিন্তু এক ছটাকও বামাল বাহির হইল না, সুতরাং বামালের অভাবে ডাকাতদের সাজা পাইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। বারুইপুরের পুলিস-বিভাগ জগদীশনাথ রায়ের অধীন ছিল, তিনিও বারুইপুর গিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমের সঙ্গে মাল বাহির করিবার জন্য একত্রে নানা স্থানে যান, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইল, বামালের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; সুতরাং ভগ্নমনোরথ হইয়া দুই জনে বারুইপুরে ফিরিলেন। বঙ্কিমের বাসার নিকট একটা পুকুর ছিল, সেই পুকুর ধারে জগদীশ গাড়ী থামাইলেন। বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিলেন "শৌচের কি আবশ্যক হয়েছে ?" রায় মহাশয় উত্তর করিলেন "তাহা নহে, এই পুকুরের ভিতর ডাকাতির সমস্ত মাল আছে।" উচ্চ হাস্য করিয়া বঙ্কিম বলিলেন "তোমার বয়সের দরুণ বিদ্যা-বুদ্ধি তামাদি হইয়া গিয়াছে, ডাকাতেরা মাল ফেলিবার স্থান পাইল না, তাই আমার বাসার নিকট, আমার বুকের উপর মাল ফেলিয়া গেল!" জগদীশনাথ উত্তর করিলেন—"তোমার নব্য বয়স, তোমার বুদ্ধি পক্কতা লাভ করে নাই, তাই বালকের মতন কথা কহিতেছ, এই পুষ্করিণীতেই মাল আছে, দ্যাখ, আমার কথা সত্য কি না"। এই বলিয়া পুলিসকে ডুবুরী আনিতে বলিলেন। আশ্চর্য্যের কথা, সেই পুকুরের ভিতর হইতে সমস্ত মাল বাহির হইল, বঙ্কিম লজ্জিত হইয়া আর কোন কথা কহিতে সাহসী হইলেন না।

জগদীশ বাবুর সিমুলিয়ার বাটীতে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবারে বিস্তর কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হইত, সাহিত্য-সূচক নানা কথা-বার্ত্তা চলিত এবং সঙ্গীতেরও আলাপ হইত। মরাদ খাঁ, আহমদ্ খাঁ, নিধুবাবু, টপ্পায় সিদ্ধ মধুবাবু, ধবণী কথক প্রভৃতি সুবিখ্যাত গায়কেরা আসিতেন এবং গুণের পরিচয় দিতেন; বাদকের মধ্যে মুকলি বাবু, কেশব মিত্র, শরৎ ঘোষ, নিতাই বাবু প্রভৃতি আসিতেন এবং নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিতেন। জগদীশ বাবু সুকণ্ঠ এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রাচার্য্য ছিলেন, তিনি গাহিতেন এবং জষ্টিস্ দ্বারিকানাথ মিত্র তবলা বাজাইতেন। সেই সঙ্গে আমরা ডাক্তার জগবন্ধু বসুকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। একদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে, এবং জগদীশ বাবুর অনুপস্থিত কালে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি এবং কার্য্যদক্ষতার কথা

সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, এমন সময় কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব—স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র—বলিয়া উঠিলেন "আমার দাদার (ব্রজেন্দ্র জগদীশ বাবুকে দাদা বলিতেন) কথা ছাড়িয়া দাও, উনি দেবতা।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "তোমার দাদা কিসে দেবতা হইলেন, তাহা ব্যাখা করিয়া বল।" ব্রজেন্দ্র উত্তর করিলেন "বাবা, সকলে আপনার বুকে হাত দাও দিয়ে বল দিকি এ সভায় কে আছ যে দুই লক্ষ পাঁচ লক্ষ নহে, ২০।৩০ টাকার প্রলোভন, অম্লান বদনে ত্যাগ করিতে সক্ষম।" সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন তাঁহার আদর্শ-চরিত্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের কথা; নিমক ছুইয়া সকলেই বড় মানুষ হইয়াছেন, কিন্তু বিশ বৎসর নিমক মহলের হাকিমী করিয়া ইনি কপর্দ্দকশূন্য।

এইবার জগদীশ বাবুর নোয়াখালি যাত্রার কথা বলিব, ইংরাজি ১৮২৮ সালে ইনি নোয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন, তখন উক্ত জেলায় ৭০।৭৫ নম্বর ডাকাতি প্রতি বৎসর হইত। জগদীশ বাবু ঐস্থানে প্রায় তিন বৎসর ছিলেন, প্রথম বৎসর অতিবাহিত হইলে ডাকাতি ৭০।৭৫ হইতে দশ বারটিতে কমিয়া আসিল।

শ্রী ঃ—

উৎপলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি চঞ্চলা

প্রাচীন মহারাজ্য মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের উপকণ্ঠে পাটলীগ্রাম। পাটলীগ্রাম পাটলীপুত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। পূর্ব্বে যখন রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল, তখন মহারাজা অজাতশত্রু দুর্দ্ধর্ষ বৃজিবংশীয়দিগকে দমন করিবার জন্য গঙ্গা এবং হিরণ্যবতীর সঙ্গমস্থল এই পাটলীগ্রামের সন্নিকটে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভগবান তথাগত একবার আমন্ত্রিত হইয়া এই পাটলী গ্রামে আগমন করেন এবং এই ক্ষুদ্র গ্রামই কালে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ভূমির রাজধানী হইয়া মহা সমৃদ্ধি এবং প্রসিদ্ধি লাভ করিবে বলিয়া ভবিষ্যৎবাণী প্রচার করেন। এই ক্ষুদ্র দুর্গে মহারাজা অজাতশত্রু এক সেনানিবাস সংস্থাপন করেন। এই ক্ষুদ্র দুর্গ এবং সেনানিবাসই পরিশেষে মহানগর পাটলীপুত্র বলিয়া পরিচিত হইল। মহারাজা অজাশত্রুর পুত্র মহারাজা উদয়েশ্বর রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করেন।

ক্রমবর্দ্ধনশীল সেই বিশাল নগরের উপকণ্ঠে জনকোলাহলের অদূরে তাল-তমাল আম্রকাননের অন্তরালে আপনার ক্ষুদ্র বক্ষে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী উদ্যান সরোবর লইয়া ক্ষুদ্র পাটলী সভয়ে সঙ্কোচে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাতীর হইতে সেই গ্রামের মধ্য দিয়া নগরে যাইবার প্রশস্ত পথ।

ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে একদিন অপরাহ্ণে একটী যুবক গ্রাম হইতে বাহির হইয়া সেই রাজপথ দিয়া অশ্বারোহণে নগরের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার সুন্দর অথচ সহজ বেশভূষা। পরিধানে পট্টবাস; শুভ্র ওড়নির অর্দ্ধাংশ দ্বারা মস্তকে জড়ান উষ্ণীষ, অপরাংশ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। ললাটে চন্দন, কর্ণে মুক্তা-শোভিত বলয়, গলায় ফুলের মালা, পায়ে পাদুকা। যুবকের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, শরীর বলশালী। তেজস্বী বলবান অশ্ব পরিচিত আরোহীকে লইয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছিল। উচ্চ পথের উভয় পার্শ্বে গাছের সারি, নিম্নে স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র, স্থানে স্থানে উদ্যান সরোবরযুক্ত সুন্দর সুন্দর বাড়ী, আম জাম তাল তেঁতুলের উদ্যান।

সূর্য্য অস্তোন্মুখ, সন্ধ্যা আগত হইয়াছে। এমন সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল। চারিদিক অন্ধকার; পথের ধুলি, গাছের পাতা ঝড়ের বেগে তাড়িত হইয়া অশ্বারোহীর শরীর প্রহৃত হইতে লাগিল। পথপার্শ্বের একটী বৃহৎ গাছ ঝড়ে ভূমিতে পড়িয়া পথ প্রায় বন্ধ করিয়া ফেলিল। তখন মেঘ ডাকিয়া আসিল, প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেগে অশ্বচালনা বিপজ্জনক, অশ্বারোহী অতি সাবধানে চলিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সম্মুখে অনতিদূর হইতে স্ত্রীকণ্ঠের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। অশ্বারোহী অশ্ব থামাইলেন, বলিলেন;—

"কে কাঁদিতেছ?"

পুনরায় ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। অশ্বারোহী বেগে অশ্ব চালাইয়া অগ্রসর হইলেন, তখন বিদ্যুদালোকে দেখিতে পাইলেন, পথের এক পার্শ্বে একটা গাছের তলায় একখানি শিবিকা, শিবিকার নিকট হইতেই কাতর স্ত্রীকণ্ঠ-ধ্বনি আসিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যুবক উচ্চস্বরে বলিলেন;—

"কে কাঁদিতেছ? কেন কাঁদিতেছ? আর ভয় নাই।"

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যুবক দেখিতে পাইলেন, একটী স্ত্রীলোক অসম্বৃত বেশে শিবিকা ধরিয়া দাঁড়াইল। সেই ক্ষণমাত্র দৃষ্টিতেই যুবক দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী যুবতী এবং অসামান্য রূপবতী। আষাঢ়ের নবীন মেঘমালার ন্যায় তাহার নিবিড়কৃষ্ণ কেশরাশি বায়ুবেগে তাহার কপোল স্কন্ধ পৃষ্ঠ বক্ষে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। যুবক বলিলেন;—

"আমি অপরিচিত, কিন্তু বিপদ সময়ে তাহা মনে রাখিবেন না। নিকটে কাহাকেও দেখিতেছি না, আপনি একাকিনী কেন? লোকজন কোথায় গিয়াছে?—কি হইয়াছে?"

স্ত্রীলোকটী শিবিকার আড়ালে সরিয়া উত্তর করিলেন;—

"আমি বড় বিপন্ন।"

"কি বিপদ ?—কি হইয়াছে ?"

"গ্রাম হইতে নগরে যাইতেছিলাম। ঝড় বৃষ্টিতে এই গাছের তলায় আশ্রয় লই। এখানে দস্যুরা আমাদিগকে আক্রমণ করে। বাহকগণ কোথায় পালাইয়া গিয়াছে, জানি না। অশ্বারোহণে আপনাকে আসিতে দেখিয়া এবং আপনার স্বর শুনিয়া দস্যুরা সরিয়া পড়িয়াছে।"

"আপনার সঙ্গে আর কেহ ছিল না ?"

"এক ভৃত্য ছিল, তাহাকেও দেখিতেছি না।"

"তাহার কি নাম ?"

"বাহক।"

যুবক তখন বাহকের নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কোন সাড়া পাইলেন না; তখন পুনরায় বলিলেন,— "এখনও বৃষ্টি থামে নাই। আপনি শিবিকার মধ্যে অপেক্ষা করুন।"

"আপনিও ত বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন!"

যুবক হাসিয়া বলিলেন ;—"আমার কোন অসুখ করিবে না। আপনি শিবিকার মধ্যে প্রবেশ করুন।"

রমণী শিবিকায় প্রবেশ করিলেন। যুবক বলিলেন ;—

"আমি একটুকু খুঁজিয়া দেখি, কাহাকেও পাই কি না।"

"আপনি খুঁজিতে যাইবেন না ; আপনি দূরে গেলে আমি পুনরায় নিঃসহায় হইব।"

যুবক তখন চীৎকার করিয়া বাহককে ডাকিতে লাগিলেন, কোন সাড়া নাই! যুবক মহা বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার ঝড়বৃষ্টিময় রাত্রিকালে প্রায় জনশূন্য নগর প্রবেশপথে একাকী এই অপরিচিতা রমণীর উদ্ধারের কি উপায় বিধান করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। বাহক জুটিলে তিনি নিজে সঙ্গে যাইয়া রমণীকে তাঁহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু বাহকগণ পালাইয়াছে, রমণীর সঙ্গীয় ভৃত্যটাও নাই। ইঁহাকে এই জনশূন্য স্থানে রাখিয়া বাহক কি অন্য কোন লোকের অনুসন্ধানে যাইতে সাহস হয় না, রমণীও তাহা ইচ্ছা করেন না। কি বিপদ!

এমন সময় যুবক দেখিতে পাইলেন, পথের নীচের দিকে একটি ক্ষুদ্র ঝোপের আড়াল হইতে একটী লোক ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। যুবক ক্ষিপ্র হস্তে শিবিকার একটা বহনদণ্ড খুলিয়া লইয়া অন্য কোনরূপ অস্ত্রাভাবে তাহাই বৃহৎ লগুড়বৎ ঘুরাইয়া বলিলেন ;—

"কে আসিতেছ? যদি চোর দস্যু হও, পালাও ; নতুবা এক আঘাতে মস্তক চূর্ণ করিব।"

লোকটা থামিল, বলিল ;—"আপনি কে ?"

"আমার পরিচয়ে আবশ্যক নাই,— তুমি কে ?"

"আমি বাহক ; এই শিবিকায় আমার কর্ত্রী আছেন, আমি তাঁহার ভৃত্য।"

রমণীও বলিলেন ;—"হাঁ, আমার ভৃত্যের স্বরই বটে।"

যুবক তখন বাহককে নিকটে ডাকিলেন। বাহক প্রথমে দস্যুহস্ত হইতে স্বীয় কর্ত্রীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু

বাহুমূলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" ইত্যাদি প্রাজ্ঞ প্রবচনের অনুসরণ করিয়া তথা হইতে পলায়ন করে। শেষে ঘটনাস্থল নিরাপদ দেখিয়া কর্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তখনও তাহার হৃৎকম্প বিদূরিত হয় নাই, সুতরাং তাহাকে সেখানে রাখিয়া বাহকের অনুসন্ধানে যুবকের নগরপ্রবেশের প্রস্তাবে রমণী স্বীকার হইলেন না। তখন তিন জনে হাঁটিয়া নগরে প্রবেশ করার কথাই স্থির হইল। নগরে বাহক এবং শিবিকা সংগ্রহ করিয়া রমণীকে তাঁহার বাটীতে পাঠান হইবে।

অশ্বটী এতক্ষণ পথের একপার্শ্বে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যুবক তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন এবং বলিলেন ;—

"সুন্দর, ঘরে যা।"

শিক্ষিত অশ্ব প্রথমে মৃদু মৃদু পরে দ্রুত বেগে ছুটিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

যুবক তখন রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন ;—

"আর বিলম্ব করা উচিত নহে, রাত্রি অধিক হইতেছে।"

যুবতী শিবিকা হইতে বাহির হইলেন। অস্পষ্টালোকে যুবক দেখিতে পাইলেন, রমণীর দেহে কোন ওড়নি নাই, তিনি শুধু পরিহিত সাটীর অঞ্চল দ্বারাই মস্তক বক্ষ পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়াছেন। এই পরমাসুন্দরী রমণী অবশ্যই বিশেষ কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থা হইবেন, দস্যুকর্ত্তৃক ইহাঁর গাত্রবস্ত্রও অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু এ বেশে প্রকাশ্য রাজপথে রমণীর চলা বাঞ্ছনীয় নহে। যুবক বলিলেন ,—

"দস্যুরা শুধু আপনার অলঙ্কারপত্র সরায় নাই। তাহারা আপনার ওড়নি পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এখনো বৃষ্টি-দুর্য্যোগ আছে, এ বেশে আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইবে।"

যুবক আপনার গায়ের ওড়নি খুলিয়া লইয়া বলিলেন ;—

"আপনি এই ওড়নি নিন্। এ বিপদ সময়ে ইতস্ততঃ করিবেন না।"

মুখ নত করিয়া রমণী বলিলেন ;—

"আপনি আমার প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছেন, আজীবন আপনার এ ঋণ অপরিশোধ থাকিবে। আমার একটী প্রার্থনা, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন— যদি কোন আপত্তির কারণ না থাকে, তবে আপনি কে, দয়া করিয়া তাহা জানাইলে চিরকাল আপনার পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া জীবন সার্থক করিব।"

"মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য সামান্য একটী কার্য্যকে আপনি অতি মহৎ বলিয়া মনে করিতেছেন। আমার নাম প্রমীত সেন।"

রমণী চমকিত হইলেন, এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন ;"—

"কুমুদনিবাস?"—

"আপনি কিরূপে জানিলেন?"

"আপনার নাম নগরে কে না জানে!"

দুই হাত যোড় করিয়া অবনত মস্তকে রমণী প্রমীত সেনকে অভিবাদন করিলেন এবং পুনরায় শিবিকার অন্তরালে যাইয়া

প্রমীতের দত্ত ওড়নি দ্বারা যথাযথ অঙ্গ আবরিত করিলেন।

তখন তিন জনে ধীরপদে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরে পৌঁছিয়া অদূরেই শিবিকা পাওয়া গেল। প্রমীত বলিলেন ;—

"আপনাকে কোথায় পৌঁছাইতে হইবে ?"

"কমলপুরে।"

"আপনি শিবিকায় প্রবেশ করুন। আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ীতে যাইব।"

"আপনি বিস্মিত হইবেন না। আমি পথ চিনি, আমার ভৃত্যও পথ ঘাট জানে। কমলপুর বেশী দূর নয়, কুমুদনিবাসের পথ পৃথক, আপনি এখন গৃহে গমন করুন।"

প্রমীত বিস্মিত হইলেন। নগরের পথ-ঘাট রমণী কেমন করিয়া চিনিলেন? পরিশেষে রমণীর নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যে প্রমীত সেই স্থান হইতেই নিজগৃহে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। বোধ হয় রমণীর ইচ্ছা নহে যে, প্রমীত সঙ্গে যাইয়া তাঁহার ঘর বাড়ী এবং অন্যান্য পরিচয় জানিয়া আসেন, সুতরাং সেই স্থান হইতেই পৃথক পথ অবলম্বন করা প্রমীত শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। শিবিকায় প্রবেশ কালে রমণী পুনরায় প্রমীতকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন ;—

"আপনি নিজ পরিচয় দিয়া আমাকে চির অনুগৃহীত করিয়াছেন, কিন্তু আমি নিজের পরিচয় আপনাকে দিতে পারিলাম না! আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। স্ত্রীলোকের সাহস কম; আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যদি আমার সে সৌভাগ্য থাকে, তবে একদিন আপনার নিকট পরিচিত হইয়া জীবন ধন্য করিব।"

যুবতী আর বিলম্ব করিলেন না, শিবিকায় প্রবেশ করিলেন। বাহকগণ শিবিকা লইয়া কমলপুরের দিকে প্রস্থান করিল। প্রমীত সেন দেখিতে পাইলেন, বাহকগণ চলিতে আরম্ভ করিলে রমণী শিবিকার আবরণ একটুকু উন্মুক্ত করিয়া-তাঁহার দিকেই যেন সাগ্রহে চাহিলেন।

প্রমীত সেন সেই খানে দাঁড়াইয়া কিছুকাল অনন্যমনে সেই রমণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। রমণী যুবতী, অপূর্ব্ব সুন্দরী, লাবণ্যবতী, শিক্ষিতা, চতুরা, অবশ্যই কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু কেমন যেন প্রকৃতি চঞ্চলা, প্রগল্‌ভা! বাক্যালাপে কেমন যেন যুবতী কুলস্ত্রীসুলভ সঙ্কোচশূন্যা!—কে এ রমণী ?

তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, প্রমীত সেন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন! ক্ষণ বিদ্যুৎ স্ফুরণ দৃষ্ট কুন্তলজাল পরিবৃত মনোমুগ্ধকর সেই সুন্দর মুখের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।

উৎপলা পরম রূপবতী, কিন্তু এ রমণী ? না, উৎপলার অপেক্ষা সুন্দরী কি কেহ আছে? ভাবিতে ভাবিতে প্রমীত সেন নিজগৃহে পৌঁছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবদ্ধ-কুন্তলা

রাজধানীর মধ্যে প্রমীত সেন একজন প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গতিপন্ন লোক, রাজাধিরাজ

অশোকদেবের বিশ্বাসভাজন পারিষদ। কুমুদ নিবাসে তাঁহার বৃহৎ বাটী একটী রাজপুরী বিশেষ। অপূর্ব্ব ফল-ফুলের উদ্যান। বহির্ব্বাটী, অন্তঃপুর, পূজাগৃহ, বিলাসগৃহ, অশ্বশালা সমস্ত পাকা। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁহার কুমুদ-সরোবর। বাটীর দক্ষিণ ভাগেই এই বৃহৎ পুষ্করিণী, প্রস্তরময় তাহার বাঁধা ঘাট। পুষ্করিণীর মধ্যভাগে মর্ম্মরনির্ম্মিত প্রমোদের বিলাস-ভবন। বিলাস-ভবনের চারিদিকে শতশত কমল কুমুদ কহ্লারের শোভা, সেই জন্যই ইহার নাম কুমুদ-সরোবর এবং পল্লীর নাম কুমুদনিবাস।

অপরাহ্নে উৎপলা অন্তঃপুরে দোতালার বিস্তৃত ছাদে বসিয়া ছিলেন। পরিচারিকা মাধবী তাঁহার কেশ বাঁধিয়া দিতেছিল। নিকটে নানা উপকরণ—সুগন্ধি তৈল, অলক্ত, মুকুর, মধুথ, চিরুণী, দড়ি, হরিদ্রা, অগুরু, চন্দন, গোরোচনা, অঞ্জন, মুক্তাজাল, সীমন্তমণি প্রভৃতি কেশ ও অঙ্গরাগের আয়োজন। মাধবী অতি নিপুণ হস্তে উৎপলার দীর্ঘ কোমল কেশরাশি বহুভাগে বিভক্ত করিয়া সরু সরু বেণী রচনা করিতেছিল।

উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আজ এত বিলম্ব হইতেছে কেন রে?"

"বিলম্ব আর বেশি কি? এখনো ত সন্ধ্যা হয় নাই।"

"কথা ছিল, বেলা থাকিতেই ফিরিবেন।"

"পুরুষ মানুষের কত কাজ; বোধ হয়, আর কোথাও গিয়া থাকিবেন।"

"ঘর বাড়ী ছাড়িয়া মানুষের বাহিরে অত কাজ কেন?"

মাধবী হাসিল, বলিল;—"আমরা কি তাহা বুঝি?—আমরা ভাবি, আমাদের আঁচল ধরিয়া ঘরে বসিয়া থাকাই পুরুষের এক মাত্র কাজ!"

গুপ্ত শ্লেষের সূক্ষ্ম শরাভিঘাতে উৎপলারও হাসি পাইল; তিনি বলিলেন;—

"আমি কি অতই স্বার্থপর?"

"তুমি না হইতে পার, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, ছাড়া হইয়া তিল মাত্র থাকিতে তোমার কষ্ট হয়।"

"তবে আমি অপরাধী।"

"অপরাধ শুধু তোমার নয়, উভয়েরই সমান!"

"দুর, অভাগী!—ও কিরে?"

ছাদে মেঘের ছায়া পড়িল। আকাশে বড় মেঘের সাজ হইয়াছে। ধবল বলাকার দল সারি দিয়া নীলাকাশে ভাসিয়া উঠিল। দেখিয়া উৎপলার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

"সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এখন ত তাঁর ফিরিবার কথা। বড়ই মেঘ সাজিল।

"ঘোড়ায় আসিবেন, কতক্ষণই বা লাগিবে?—ভয় কি?"

তখন ঝড় উঠিয়া আসিল। আম্রকানন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, কুমুদসরোবরের জল তরঙ্গময় হইল। স্ফুট অস্ফুট কমল কুমুদ কহ্লার বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া একবার একদিকে আরবার বিপরীত দিকে জলস্পর্শ করিতে লাগিল। ধুলি, বালু, ছিন্ন গাছের পাতায় আকাশ ছাইয়া ফেলিল। অন্ধকার হইয়া আসিল।

উৎপলা উঠিলেন, মাধবী অঙ্গরাগের সামগ্রীগুলি তুলিয়া লইল। খোলা ছাদে আর তিষ্ঠান যায় না। আরও পরিচারিকা

দৌড়িয়া সেখানে আসিল, ছাদের জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করিতে লাগিল। প্রমীত সেন তখনও বাড়ীতে ফিরেন নাই।

মেঘ ডাকিয়া আসিল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা. শেষে অবিরল ধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। উৎপলা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কিছুকাল পরে বহির্ব্বাটীতে ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রমীতের অশ্ব সুন্দর শূন্যপৃষ্ঠে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু প্রমীতের কোন সংবাদ নাই। সজ্জিত অশ্ব ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আরোহী নাই, অবশ্যই তাহার কোন বিপদ হইয়াছে! ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে পথ দুর্গম হইয়াছে, কোথায়ও তিনি অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবেন। ভিতর বাড়ীতে সংবাদ আসিল, উৎপলা শুনিলেন। সকলে মহা ব্যস্ত-সমস্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তখন লোকজন পরিচারকবর্গ অনুসন্ধানে বাহির হইল। কেহ অশ্ব পৃষ্ঠে ছুটিল, কেহ কেহ আলো জ্বালিয়া চলিল। কতক লোক পাটলীর পথে, কতক রাজপুরী অভিমুখে চলিল।

উৎপলার কেশ বন্ধন শেষ হইল না। সেই বিপুল কেশরাশির কতক বেণীবদ্ধ, কতক আলুলায়িতই রহিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাধবী অনেক অনুরোধ করিয়াছিল. কিন্তু উৎপলা স্বীকার হন নাই, উৎকণ্ঠিত চিত্তে একবার ঘরে, একবার ছাদে যাতায়াত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগে তাড়িত আলুলায়িত কেশজাল উৎপলার মুখ এবং কপোল দেশ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

ক্রমে ঝড় বৃষ্টি থামিল, চন্দ্রোদয় হইল। সিক্তবস্ত্র, লুপ্ত-চন্দন-লেপ প্রমীত সেন গৃহে পৌঁছিলেন। বহির্ব্বাটীতে বিলম্ব না করিয়া প্রমীত একেবারে উৎপলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উৎপলা দ্রুতবেগে স্বামীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কেন এত বিলম্ব হইল? ঝড় বৃষ্টির সময় কোথায় ছিলে? সুন্দর আগেই ফিরিয়া আসিয়াছে,—কি হইয়াছে?"

প্রমীত ক্ষণকাল কোন কথা বলিলেন না, উৎপলার উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন —এ মুখও যে প্রায় সেইরূপ বিস্রস্ত কেশজাল পরিবৃত!

উৎপলা কহিলেন ;—

"কিগো, চিনিতে পারিতেছ কি?"

"চিনিতে পারি বটে, কিন্তু দিন দিন মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্তই যে নূতন!"

উৎপলার মুখ স্মিত প্রভাসিত, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"তোমার ভিজে কাপড়! —মাধবী, কাপড় আন্!—ঝড় বৃষ্টিতে কোথায় ছিলে? ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলে? সুন্দর ত আগেই ফিরিয়া আসিয়াছে!"

"সব বলিতেছি। আজ আকাশের চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল, কিন্তু দেখিতেছি, মর্ত্ত লোকের চন্দ্রমাও যে মেঘে ঢাকা!"

প্রমীত উৎপলার ললাট কপোলে বিক্ষিপ্ত কুন্তল-রাশি মৃদু হস্তে সরাইয়া দিলেন। উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—

"মাধবী চুল বাঁধিয়া দিতেছিল ; এমন

সময় ঝড় বৃষ্টি আসিল, চুল বাঁধা শেষ হইল না। সুন্দর ফিরিয়া আসিল, তুমি আসিলে না! চুল বাঁধা আর হইল না।"

"সাতরাজার ধন মাণিক ঘরে ফিরিয়াছে, এখন বাঁধ!"

প্রমীত সিক্ত বস্ত্র ছাড়িলেন; হাত পা মুখ ধুইয়া শয্যায় বসিলেন। তখন পাটলী হইতে যাত্রা করার পর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর কাছে বলিলেন।

"স্ত্রীলোকটীর কোন পরিচয় পাইলে না?"

"না।"

"কত বয়স?"

"উনিশ কুড়ি হইবে।"

"দেখিতে কেমন?"

"রূপবতী;—চুলে ঢাকা মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।"

"তবে কেমন করিয়া বুঝিলে রূপবতী?"

"রূপ কি চুলে ঢাকা পড়ে?"

প্রমীত আলুলায়িতকুন্তলা উৎপলার লাবণ্যময় মুখের দিকে অতৃপ্ত লোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এমন সময় কক্ষের বাহির হইতে মাধবী বলিল,—

"রাজপুরী হইতে আবার লোক আসিয়াছে।"

তখন উৎপলা বলিলেন;—

"আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজাধিরাজ তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন।"

প্রমীত ব্যস্ততার সহিত বলিলেন:—

"এতক্ষণ আমাকে জানাও নাই! আমাকে এখনি যাইতে হইবে।"

"সে কি! এই মাত্র তুমি গৃহে আসিলে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এত কষ্ট পাইয়াছ; রাত্রি প্রভাতে গেলে হয় না?"

"না; এখনি যাইতে হইবে। রাজবাড়ীতে অবশ্যই বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়িয়াছে, নতুবা বার বার সংবাদ আসিবে কেন?"

প্রমীত শয্যা হইতে নামিলেন। উৎপলাও নামিলেন; আপনার নবনীত কোমল হস্তে স্বামীর বাহু জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন;—

"রাত্রেই ত ফিরিবে!"

"ফিরিব,—বিদায় পাইলেই ফিরিব।"

উৎপলা স্বামীর বক্ষে কপোল সংন্যস্ত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন;—

"তুমি ফিরিয়া আসিলে আমি চুল বাঁধিব, বিলম্ব করিও না।"

প্রমীত মৃদুহস্তে উৎপলার গণ্ডদেশ হইতে অবাধ্য কেশগুলিকে সরাইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রমীত গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। উৎপলার সুন্দর মুখ ক্ষীণ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রবিম্বের ন্যায় মলিনাভ হইল।

অবদ্ধকুন্তলা উৎপলা ক্ষুণ্ণচিত্তে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।　　　(ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

চণ্ডীদাস

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে জয়দেব বাঙ্গালা গীতি-কবিতার যে বীজ বঙ্গের উর্ব্বরাভূমিতে ছড়াইয়াছিলেন, সেই বীজের প্রথম ও সতেজ মহীরুহ চণ্ডীদাসের গান। ভালবাসা প্রকাশের জন্যই গানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাই প্রেমিক চণ্ডীদাসের কণ্ঠে গান আপনি ফুটিয়াছিল। যখন প্রাণে একটা আবেগ আসে, তখন সহজ ভাবে কিছু করা চলে না; চণ্ডীদাসের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের এমন একটা প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছিল যে তাহা তাঁহার সাদাসিদা পূজারি জীবনের ভাব সকলকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিত্য পরিচিত ছন্দোবন্ধকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, বাঙ্গালা ভাষার এক নূতন ছন্দে ও ভাবে মুখরিত হইয়া,—বঙ্গভূমিতে সুরে সুরে কল্লোলিত হইয়া উঠিল। জয়দেবকে বুঝাইয়া বলিতে হইয়াছিল—"যদি হরিস্মরণে কুতুকং মনঃ শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্;" কিন্তু চণ্ডীদাস নিভৃতে নির্জ্জনে মন্দিরে আত্মগোপন করিয়া নবদীক্ষার তীব্র উল্লাসে, কৃষ্ণপ্রেমিকার যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সেই প্রথম ক্রন্দন ধ্বনিতে আধ্যাত্মিকতার এত উজ্জ্বল নিদর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কোনও কৈফিয়ৎ না থাকিলেও আমরা শুধু এই গীতি হইতেই চণ্ডীদাসের মূল উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারি। যদি অন্য কোনও ভাবে এই গান বুঝিতে চেষ্টা কর বুঝিতে পারিবে না। যে ভগবান্‌কে ভালবাসে, এবং যে কোনও মানুষকে ভালবাসে, দুজনেই এক পথের পথিক সন্দেহ নাই, কিন্তু পার্থিব প্রণয়ে "নামে" প্রেম কেহ ভাবিতেও পারে না। যাহা পার্থিব প্রণয়ে অসম্ভব, তাহাই আবার ভগবৎপ্রেমে অত্যন্ত সম্ভব; শুধু সম্ভব নয়, সে-ই প্রেম লাভের অপরিত্যাজ্য প্রথম সোপান। অতএব—

সখি রে কে শুনাইল শ্যামনাম,
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

এই গানটাই তাঁহার প্রথম কৈফিয়ৎ। শেষে তিনি আরও পরিষ্কার ভাবে আমাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে দিয়াছেন—

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন
গোপ গোয়ালিনী হাম মতিহীনা
না জানি ভজন সাধন ॥

এই গোপ গোয়ালিনীর নামে চণ্ডীদাস আপনার উন্মত্তপ্রেমের গৈরিকস্রাব উদ্গীর্ণ করিয়াছেন, নিজের হৃদয়ের অস্তিত্ব ভুলিয়া, প্রেম-পাগলিনীর সঙ্গে এক হইয়া ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস আদৌ সাধক, তার পর প্রেমিক, তাঁহার প্রথম গানেই আমরা সে কথা বুঝিতে পারিয়াছি। এ কথায় অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, কারণ চণ্ডীদাসকে তাঁহারা প্রেমিক ভিন্ন আর কিছু বলিতে চাহেন না। ইহাতেও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাসের

রাগাত্মিক পদাবলী হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে, তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলিও এই বিষয়েরই সাক্ষ্য প্রদান করে। যাঁহারা মনে করেন যে এই কথা স্বীকার করিলে তাঁহার কবিত্বশক্তিকে খর্ব্ব করা হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত; কারণ প্রেম ভগবানের বিষয়েই হৌক অথবা মনুষ্য বিষয়েই হৌক, তাঁহার পদ্ধতির কোনও ব্যতিক্রম হয় না, তাহা সকল বৈষ্ণব দার্শনিকই কহিয়াছেন। বৈষ্ণব মতে ভগবৎসাধনা এক অপূর্ব্ব রহস্য। বাহ্যতঃ ইহা মানুষের প্রেমের সকল অঙ্গে অঙ্গী; কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সমস্বরে কহিয়াছেন যে কামের লেশমাত্র থাকিলে এই সাধন-পদ্ধতি বোঝা তো যাইবেই না, বরং বিষবৎ পরিত্যজ্য। বৈষ্ণব সাধনার মূলমন্ত্র—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু"

যেমন নায়কের চিন্তায় হৃদয় সমর্পণ করে, সেইরূপ—সংসারের সকল কার্য্যের মাঝে থাকিয়া ভগবানের উপর মন সমর্পণ করা। এ পথ অতি কঠিন ও বিষম পথ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে ইহা চরম পথ, ইহার উপরে আর কিছুই নাই। পরকীয়া রতির সাধনা বিষাক্ত সর্পের সহিত ক্রীড়া, তিলমাত্র অসাবধানতায় তীব্রবিষে জর্জ্জরিত হইতে হইবে, আর যদি সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় তবে সাধক অমৃতময় রসের সাগরে স্নান করিবে। চণ্ডীদাসের নিজের কথায় —

যে মত দীপিকা, উজরে অধিকা
ভিতরে অনল শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা।
জগত ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥

আমরাও পাঠকগণকে এই অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি। চণ্ডীদাসে অমৃতের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব, কেহ কখনও পান করিয়া ফুরাইতে পারিবেন না।

চণ্ডীদাস পরকীয়া নায়িকার গান গাহিয়াছেন, তাহাতে শিহরিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ পরকীয়াভাবে ভগবানে প্রেমার্পণে শুধু যে উল্লাস বেশী তাহা নহে ইহার স্বার্থহানতা ও আত্মসমর্পণও অনেক বেশী মাত্রায় প্রগাঢ় ও সম্পূর্ণ। ইহাতে জোর নাই দাবী নাই, কেবল ভালবাসা দিয়া পরকে আপন করার ভাব আছে, আর অযাচিত ভাবে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া আছে, তাই ইহার মাধুর্য্যের তীক্ষ্ণতা অত্যন্ত প্রখর। ব্রজ গোপীদের সাধনা এই মধুর রসের পুণ্যতম বিকাশ, এই জন্য তাহাদের ভালবাসাকে কেবলা রতি বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লেখ হইয়াছে। এই বিশুদ্ধা কেবলা রতির অবিমিশ্র ভাবে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা সেই জন্য বৈষ্ণবের আরাধ্যা, সদা চিন্তনীয়া।

অনেকে ভাবেন ও বলেন যে সমাজকে শাসিত করিবার উদ্দেশ্যে, এবং আমাদের বাঁধা ধরা সামাজিক নিয়মের প্রতিকূলে স্বাধীন প্রণয়ের বিজয় ঘোষণার উদ্দেশ্যে

বৈষ্ণব কবি তাঁহার পদাবলীর সূচনা করিয়াছেন।* আমাদের বিশ্বাস যে এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। যদি বৈষ্ণবকবি নিজে এই ভাবের সূত্রপাত করিতেন, তাহা হইলে আমরা এই ধারণার সারবত্তা মানিতে পারিতাম, কিন্তু ইহার মূল পদাবলীতে নহে, পুরাণে। পুরাণকার যিনিই হৌন, তিনিই ব্রজগোপী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ভগবৎসাধনার এই নূতন পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। অতএব পুরাণকারই মধুর রসের প্রথম পথপ্রদর্শক। জয়দেব প্রথমে এই রসকে আশ্রয় করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং চণ্ডীদাস সেই পথ, সেই ভাব অবলম্বনে তাঁহার অমর পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, কোনও সামাজিক উদ্দেশ্যে নহে।

পুরাণে যাঁহাকে ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তি বলে সেই মহাভাবময়ী নায়িকা শ্রীরাধার কথা লইয়া চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলী আরম্ভ করিয়াছেন—তাহা হইতেই বঙ্গে পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি! অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যেন চির-তপস্বী হিমাচলের বক্ষ ভেদ করিয়া প্রমত্ত ধারায় ভক্তি-ভাগীরথী ধরণীর কোলে নামিয়া আসিয়া তাহাকে শান্তিরসে অভিষিক্ত করিয়াছে।

চণ্ডীদাসে কলা-নৈপুণ্য নাই, কথার সাজসজ্জা নাই, ছন্দের পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি নাই; তাঁহার রাধিকার বয়ঃসন্ধি নাই, প্রেমের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, চাঞ্চল্য নাই, চপলতা নাই। ইহাঁর হৃদয়ে একটী নাম শুনিয়া এমন প্রবল ও পরাক্রান্ত ঝড় বহিয়া গিয়াছে যে সে ঝড়ের মুখে বিশ্বসংসার ফুৎকারে তৃণের মত উড়িয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত ভালবাসার সম্মুখে আমরা যেন ভীত, স্তম্ভিত হইয়া যাই। চণ্ডীদাসের রাধার কথা বলিতেও আমাদের ভয় করে, কেবল আরও অনেকে অনেক বার এই কথা ভাল করিয়া বলিয়াছেন বলিয়াই নহে, এ চরিত্রের বিশ্লেষণে কোনও রূপ কষ্ট আছে বলিয়া নহে, বরং এ চরিত্রের বিশ্লেষণ অতি সহজেই হইতে পারে; আগুন জ্বলিয়া উঠিলে তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই যেমন সকলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠে, আমাদেরও সেই রকম ভয়। সেই দীপ্ত অনল-শিখার কেহ বিশ্লেষণ করিতে বসে না, তাহার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করে না। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার কথাগুলি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তিনি শ্যামনাম শুনিয়া যে আগুন হৃদয়ে পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই অনল যেন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারের সকল মূল্যবান্ জিনিষ, আমরা যাহাকে মূল্যবান্ ভাবি, সেই সকল বস্তু পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এই একাগ্র, বিক্ষেপহীন ভাব তাঁহার হৃদয়ের সার সামগ্রী, ইহাই তাহার প্রেমের আদ্য, মধ্য ও শেষ। তবে আর ইহার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা কি করিব?

বিশ্লেষণ করিতে হয় বিদ্যাপতির শ্রীরাধা-চরিত্রের, কারণ বিদ্যাপতি ভাল-বাসার ক্রম পরিপুষ্টি চিত্রিত করিয়াছেন। সকলের হৃদয়েই সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা প্রথম

* রবি বাবুর গ্রাম্য-সাহিত্য।

হইতেই আসে না, ক্রমে ক্রমে তাহা আসে। তাই তাহার ক্রমাভিব্যক্তি আঁকিতে হইলে কবিকে অনেক রকম ভাবের ছবি তুলিতে হয়, অনেক হাবভাব আঁকিতে হয়, অনেক ছেলেমানুষির কথাও হয় তো বলিতে হয়। কবি বিদ্যাপতিকে এই সকল দৃশ্য আঁকিতে হইয়াছে, কারণ তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভালবাসা কেমন করিয়া আস্তে আস্তে হৃদয়ে প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং ক্রমে ক্রমে কেমন প্রবল হইয়া উঠে। সাধারণতঃ যাহা হয় বিদ্যাপতি তাহাই দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে ভক্তিরাজ্যের নিয়ম ও ভালবাসার রাজ্যের নিয়ম সমতুল; অতএব ভালবাসার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম ঐশ্বরীয় প্রেমের সম্বন্ধেও তাহা সত্য। সকলেই কিছু আপনা ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে না; ইহাও ধাপে ধাপে উঠে। তাই বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি আছে, ও এই সময় হইতে তাঁহার প্রণয় ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া উৎপত্তিস্থলে নদী যেমন ক্ষুদ্রকায়া হয় তেমনি ক্ষীণ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বিশালকায় হইয়াছে, পরে অনন্ত সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। নদী যখন ক্ষীণকায় তখন তাহার গতির পথে অনেক বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয়, অনেক সময় "মার্গাচল ব্যতিকরা কুলিতের" অবস্থা হয়, —অনেক সময় সে "ন যযৌ ন তস্থৌ" এই দ্বিধাসংকুল অবস্থাপন্ন হয়, এই জন্য প্রলোভন দ্বারা তাহার প্রেমের বেগ বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন হয়; লজ্জা, কলঙ্কভয়, গুরুগঞ্জনার ভয়, সংসার-বাসনা এমনি অনেক বাধা তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। যে ভক্ত এই সকল অবহেলা করিয়া ভক্তির বলে ভগবানকে পাইতে পারে সেই ধন্য; পক্ষান্তরে, যে প্রেমিকা প্রেমের বেগে এই সকল বাধা অতিক্রম করিতে পারে, তাহারই প্রেম পরিপক্ব, তাহারই প্রেমিক-লাভ হইতে পারে। বিদ্যাপতির রাধিকার শেষে তাহা হইয়াছিল। এইজন্য বিদ্যাপতির স্থান বৈষ্ণবকবি-সমাজে অত্যন্ত গণনীয় ও উচ্চ; কিন্তু তাহা বিশেষণ-সাপেক্ষ। যাঁহারা শুধু বাহির হইতে বিদ্যাপতির কাব্য সমালোচনা করেন, তাঁহারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে সমশ্রেণীভুক্ত করিতে নিতান্ত নারাজ; কিন্তু যাঁহারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যথার্থ মর্ম্ম জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে বৈষ্ণব কবি হিসাবে উভয়েই বৈষ্ণবসমাজের গুরু। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস একই ভাবের দুই মূর্ত্তি। প্রভেদ এই যে বিদ্যাপতির যেখানে শেষ, চণ্ডীদাসের সেই খানে আরম্ভ।

যে গভীর আত্মবিলোপী প্রেমে বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বিরহ-দশায় দিব্যোন্মাদ, সেই দিব্যোন্মাদ চণ্ডীদাসের রাধার প্রথম হইতেই উপস্থিত। বিদ্যাপতির রাধা বালিকা, তাহার জটিলা, কুটিলা "শাস-ননদী" ভয় আছে, কল্পিত পতি রায়াণের (সংসারের) আকর্ষণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন ও প্রেমের আকর্ষণও আছে, তাই তাহার দেহবুদ্ধিও প্রথমে বিলক্ষণ আছে, সম্ভোগে সুখ আছে, এবং এই জন্যই তাঁহার

বিরহে অত্যন্ত বেদনা-বোধ আছে। চণ্ডীদাসের রাধা প্রথম হইতেই পাগলিনী; প্রথম হইতেই যোগিনী, প্রথম হইতেই তাঁহার কৃষ্ণানুশীলন এত প্রখর যে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় "সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, যেন যোগিনীর পারা।" প্রথম প্রণয়ের আবেগে বিদ্যাপতির রাধা সখীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদা-কাঁটি করিয়াছিলেন, নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের যে পাগলিনী রাধা তাঁহার মনের ব্যথা ব্যক্ত হইবার নহে; অন্তরঙ্গ যে সখী সেও বুঝিতে পারে না "রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা;" সে এক অকথ্য বেদন—

অকথ্য বেদন সখি বোঝা নাহি যায়।
যে করে কৃষ্ণের নাম পড়ে তার পায়॥

চণ্ডীদাস কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, নচেৎ, একশত বৎসর পরে যে পাগল বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া সকলকে প্রেমের জোয়ারে ভাসাইয়াছিলেন তাঁহার মূর্ত্তি তাঁহার ক্রিয়া কেমন করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারিলেন?

চণ্ডীদাসের পাগলিনীর কাছে কে একবার সংসারের কথা পাড়িয়াছিল, কুলের কথা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার যে উত্তর সেই উত্তর হইতেই সে হৃদয়ের প্রেমের উত্তাপ বুঝিতে পারা যায়,—

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন
এ দুটী নয়ন তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলী
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়।
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হইয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম কপালে আছিল
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সি দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।

মর্ম্মজ্ঞ কবি চণ্ডীদাস ভণিতার ছলে বলিতেছেন—

চণ্ডীদাসে কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুলশীল ছাড়া॥

ঠিক্ কথা, তাই ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

চণ্ডীদাসের রাধার চরিত্র এই একটা মাত্র উপাদানে গঠিত—জ্বালাময় প্রেম তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, সেখানে আর কিছুই নাই; তাহার সুখ নাই, কেবল ক্রন্দন আছে, তাহার রস নাই, তাহা এই প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া গিয়াছে; তাহার দেহ নাই, সে এই মনের যজ্ঞে আহুতিস্বরূপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার দেহ বুদ্ধির এত অভাব যে প্রিয়তমের অঙ্কশায়িনী হইয়াও সে প্রিয়তমের বিরহে

ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে বসে—"দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" ধরণীর বক্ষে একটা অজ্ঞাত আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির উৎপাতের সৃষ্টি করে, এ হৃদয়টীও ঠিক সেই রকম। ইহার খালি ক্রন্দন আছে, আকাঙ্ক্ষা বাসনা সাধ সকলই কাঁদিবার জন্য; আকুল আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া গিয়া বাঞ্ছিতের বুকে আছড়াইয়া পড়ে, যেন অগাধ অমেয় গভীর সমুদ্রের তরঙ্গরাজি পৃথিবীর বক্ষে আছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার তখনি কোমল ক্রন্দনের, অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত সরিয়া যাইতেছে, যাহা চায় তাহা যেন পাইল না, কাঁদিয়া আকুল হয়। ইহার সুখই বা কিসে, আর দুঃখই বা কিসে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কিন্তু এই পাগলিনীর সকলই বিচিত্র, সকলই অদ্ভুত। মিলনে ইহার দেহ-বুদ্ধি নাই—আছে বিরহে। যেখানে আসিয়া বিদ্যাপতির রাধিকা পাগলিনী, ঠিক সেইখানে চণ্ডীদাসের পাগলিনীর জাগরণ। এমন কেন হয়? ইহার উত্তর—শুধু প্রণয়ীর দিক্ দিয়া এইরূপে দেওয়া যায়; তুমি ভালবাস, তোমার ভালবাসা খুব প্রগাঢ় হইতে পারে, তোমার মন প্রেমরসে আর্দ্র হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহা বুঝিব কেমন করিয়া? তুমি মনের আবেগে কাঁদিয়াই আকুল হইলে,- আমরা সঙ্গ যে তোমার প্রিয় তাহা আমি বুঝিব কেমন করিয়া? তুমি আমার বুকে স্থান পাইয়াও কাঁদ—ভালবাসার যে সুখ তোমার তাহার অনুভব নাই; তোমার মন যদি আমার জন্য পাগল, তোমার মনে যদি সর্ব্বস্ব-ত্যাগের গর্ব্ব, তবে তোমার দেহ দূরে থাকে কেন? অনুযোগ তো সত্য। তাই বিরহে চণ্ডীদাসের রাধার প্রথম চৈতন্যোদয়। শুধু মনের জোরে প্রেমিককে ধরিয়া রাখা যায় না, দেহের সাহায্যও প্রয়োজন হয়; তখন যে রাধিকা বিচ্ছেদের সম্ভাবনাও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, সেই আবার কাঁদিতে বসে; সেই তখন মনে মনে ধিক্কার দিয়া বলে যে ছি ছি! কি করিলাম, সামান্য মনের অছিলায় প্রাণের গর্ব্বে তাহাকে তো সুখী করিলাম না, নিজেও সুখী হইতে পারিলাম না; কত সাধ করিলাম কিছুই তো মিটিল না। তাহাকে তো ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। তখন আবার সে সখীর হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া বলে, সখি আর একবার তাহাকে ফেরাও, আমার সাধ আহ্লাদ কিছুই হইল না, "তিয়াসে পরাণ যায়", একবার তাহাকে ফেরাও। আমার

ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন
কাচের সমান ভেল।

যাও সখি তোমরা তাহাকে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আন,

সাধ কহবি কানুর পায়।
যে সুখ সাগর দৈবে শুখায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করল বাদ॥

সখি হামসে অবলা তায়।
বিরহ আগুণ হৃদয়ে দ্বিগুণ
সহন নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সেজন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

চণ্ডীদাসের রাধার এইটুকু বাকী ছিল; বিদ্যাপতির রাধার দৈহিক সম্ভোগ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তাই বিরহে তাহার মনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুমত ব্যাখ্যাও এই ভাবেরই। প্রেমধর্ম্মী বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল মনের দ্বারা কৃষ্ণ-সেবাকে গ্রাহ্য করে না, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ সেবা ইহার প্রতিপাদ্য। মন, প্রাণ, দেহ ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচরণে সর্ব্বস্বের অর্পণ ইহার কঠিন নির্দ্দেশ। তাই সাধন-তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত চণ্ডীদাস বিরহে তাঁহার রাধাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন, ভাব সম্বরণ করাইয়াছেন —পূর্ণ মিলনের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, নিবিড় আত্মসমর্পণের জন্য। চণ্ডীদাস বিরহে জাগিয়াছেন—তাই তাঁহার ভাষা সাজিয়াছে, ছন্দ খেলিয়াছে। তাঁহার প্রাণ যেন একটা বড় কাজের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহার প্রেমের, সাধনার চূড়ান্ত ফলপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে সজাগ করিয়া দিয়াছে। বিরহে আগ্নেয়গিরি শান্ত হইয়াছে, হৃদয়ের উত্তপ্ত বাষ্পরাশি অশ্রু হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া পৃথিবী শীতল করিয়াছে, পাগলিনী প্রেমময়ী হইয়াছে। ইহাই বিরহের পরীক্ষার ফল—অমৃতময় ফল।

তাহার পর চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির রাধার নিজের বলিয়া আর কিছু নাই, আমিত্ব বলিয়াই আর কিছুই নাই; মনের জোর নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, আছে কেবল সেই প্রাণাধিকের চরণ দু'খানি। কি নিরাবিল, কি সুন্দর সেই আত্ম-নিবেদন! কি গভীর সেই আত্ম-সমর্পণ,—কি মধুর, কি মহৎ সেই আত্ম-বিলোপন!

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিয়া প্রেমের ফাঁসী
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

পাগলিনীর আজ চরম সুখ—নিজের প্রেমের গৌরব ত্যাগ করিয়া; আমি যে আমার শ্যামকে বড় ভালবাসিতে জানি এই গৌরব এই গর্ব্ব দূরে ফেলিয়া দিয়া আজ সে সুখী। সে বুঝিয়াছে

না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥

তাই আজ সে তাঁহার বঁধুর চরণ দুখানি বুকে ধরিয়া, তৃণের ন্যায় নীচ হইয়া কাঁদিয়া সাধিতেছে

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥

পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমারি পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ দুখানি॥

আজ নিজের ত্রুটি বুঝিয়া রাধা করুণা ভিখারিণী, 'আমি যে বড় প্রেমিকা' সে ভাব আর তাহার নাই—

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শতকোটী
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি॥

যিনি প্রেমিকের রাজা তিনি কি এমন প্রেমে বাঁধা না পড়িয়া থাকিতে পারেন, তাই তিনিও রাধার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যেন কৃতার্থ হইয়াছেন। যদি এমন *প্রেম জগতে আবার ফিরিয়া আসে,* তবে আমরাও আত্মনিবেদিতা রাধার সহিত ডাকিয়া বলিব—

আজু কোয়েলা লাখ হি ডাকহু
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
বিদ্যাপতি।

এখন—কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় করুক চন্দ॥
চণ্ডীদাস।

জানি না আবার কত দিনে, কত বৎসরে, কত যুগযুগান্তর পরে বিশ্বজগৎ চণ্ডীদাসের রাধার মত বিশ্বপতির মধুর বাঁশরীর তান-লহরী শুনিয়া তাঁহার দিকে এইরূপ উন্মাদ-প্রেমে ছুটিয়া যাইবে, এইরূপ আত্মনিবেদন করিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া বলিবে—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

রামাবতী

(৩)

বহু বৎসর পূর্ব্বে 'সেখ শুভোদয়া' নামক হস্তলিখিত পুথিতে 'রামাবতী'র নাম দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল;—প্রথম প্রবন্ধেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার উল্লেখ করিবার কি প্রয়োজন ছিল, এক্ষণে তাহা বলিতেছি।

'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম হলায়ুধ মিশ্র বলিয়া লিখিত ছিল। গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে গদ্যে বিরচিত হইলেও, তাহার রচনায় চ্যুতসংস্কৃতেরই বাহুল্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। গ্রন্থখানি সেখ্‌শাহ জালালুদ্দীন তব্‌রেজি নামক স্বনামখ্যাত মুসলমান সাধুপুরুষের জীবন-কাহিনীরূপে লিখিত। পারসিক ভাষায় এই সাধুপুরুষের একাধিক জীবনকাহিনীর গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা নূতন। রাজা লক্ষ্মণসেন যখন লক্ষ্মণাবতী নগরে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ে 'সেখ' তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন, এবং অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া, লক্ষ্মণসেন দেবের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া পীর সাহেবকে ভূমিদান করেন, তদুপলক্ষে 'সেখ' রামাবতী প্রাপ্ত হন। এই সকল কথা এই গ্রন্থের প্রধান কথা।

এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; কেন,—কোন্ সময়ে কোন্ প্রয়োজনে লিখিত হইয়াছিল,—গ্রন্থকারের নাম হলায়ুধ মিশ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল কেন,—ইহা মুসলমানের দরগায় রক্ষিত হইতেছিল কেন,—এ সকল কথা প্রথমে প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের এক স্থলে একটি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—'পালান্বয়-মৌলি-মণ্ডনমণিঃ" রামপাল দেব জাহ্নবী-জলমধ্যে অনশনে তনুত্যাগ করেন। তাহার পর, মন্ত্রিবর্গ পরামর্শ করিয়া, শিবোপাসক কাঠুরিয়া বিজয়সেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। এই সকল কথার মধ্যে কোনরূপ ঐতিহাসিক তথ্য কবিকল্পনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে কি না, তৎকালে তাহার রহস্যভেদ করিবার উপায় না থাকিলেও, ভবিষ্যতের তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টায় ফল লাভ করিবার আশায়, মালদহ-নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া, গ্রন্থখানির আদ্যন্ত নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মূল গ্রন্থ হারাইয়া গিয়াছে; নকলখানিও হারাইয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরের অনুসন্ধান-চেষ্টায়, পরম স্নেহাস্পদ পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠজী তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের অনুমতিক্রমে নকল গ্রন্থখানি আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মালদহে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবার সময়ে, নকল গ্রন্থখানি প্রদর্শিত করিবার জন্য, শেঠজী

তাহা চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ঐ গ্রন্থ আবার লুপ্ত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বিপিনবিহারী ঘোষকে উহার অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। এখন শ্রীমান্ বিপিনবিহারী কর্ত্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি,—ঐ গ্রন্থ "মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতি" কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইবে; তাহার সম্পাদন-ভার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে গ্রন্থখানি আর একবার দেখিবার সুযোগ হারাইয়া, স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া, তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। 'সেখ শুভোদয়া'গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, উহার সম্পাদন-কার্য্যে উত্তরবঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয়লাভের প্রয়োজন হইবে।

এই গ্রন্থের সহিত একটি জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহা না জানিলে গ্রন্থখানি চিরদিনই প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহার সন্ধানলাভ করিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছিল,—কোন্ সময়ে কিরূপ প্রয়োজনে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল।

শাহ জালাল তব্রেজির জীবন-কাহিনীর সহিত মুসলমান-শাসনের প্রথম প্রভাবের অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তখন পুরাতন সাম্রাজ্যবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক দিন হইতেই তাহা ধীরে ধীরে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল। তথাপি মুসলমানের পক্ষে সহসা তাহার সকল গ্রন্থি সহজে উন্মোচন করিবার সুযোগ ঘটিতে পারে নাই। উত্তরবঙ্গেই সর্ব্বপ্রথমে শক্তি-পরীক্ষার সূত্রপাত হয়। কোন কোন স্থান মুসলমানের করতলগত হইলেও, অনেক স্থানের রাজরাজন্য পুনঃপুনঃ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যে যুগে নূতন-পুরাতনের এইরূপ শক্তি-পরীক্ষার নানা অভিনয়ে উত্তরবঙ্গ আন্দোলিত হইতেছিল, সেই যুগে মুসলমান-সাধুপুরুষদিগের নিকট ভারতবর্ষ একটি প্রচারক্ষেত্র বলিয়া প্রতিভাত হইবামাত্র, সেনাপ্রবাহের অনুবর্ত্তী প্রচারক-প্রবাহও ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করে। দিল্লী তাহার কেন্দ্রস্থল হয়। সেখ-উল্-ইস্লাম উপাধিধারী ধর্ম্মপ্রচারক তাহার নেতৃত্ব লাভ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচারক প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। পারস্যের অন্তর্গত তব্রেজ সহরে জন্মগ্রহণ করিয়া, ফকিরীব্রতধারী শাহ জালাল সাধুপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া, ঈর্ষাপরবশ সেখ-উল-ইস্লাম তাঁহার শত্রুতা সাধন করায়, শাহ জালাল গৌড়ে উপনীত হইয়া, মুসলমান শাসনকর্ত্তার সম্মানভাজন হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে যে বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন, তাহা এখনও "বাইশহাজারী ষ্টেট" নামে মালদহ জেলায় সুপরিচিত। এই সকল সম্পত্তি মুসলমান-শাসন-সময়েই অর্জ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু-সেবাইতের দ্বারা

তাহার রক্ষণাবেক্ষণকার্য্য পরিচালিত হইত। কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে মুসলমানের দরগার ভূসম্পত্তি হিন্দুর করতলগত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মোগল-শাসনসময়ে ঢাকার নবাব-দরবারে ইহার 'তদন্ত' হইয়াছিল। জনশ্রুতিতে জানিতে পারা গিয়াছে, সেই সময়ে 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থ প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া, হিন্দু-সেবাইত প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, "রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়েই এদেশে সেখ শাহ জালালের 'শুভোদয়' হইয়াছিল, এবং রাজা লক্ষ্মণসেনই ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই সময় হইতে পুরুষানুক্রমে তাহা হিন্দুর রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে।" গ্রন্থখানিকে লক্ষ্মণসেন দেবের শাসন-সময়ে রচিত প্রাচীন প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদিত করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণসেন দেবের ধর্ম্মাধিকার [মহামহোপাধ্যায়] হলায়ুধ মিশ্রকে গ্রন্থকাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; লক্ষ্মণসেনের সভাবর্ণনায় জয়দেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী দেবীরও উপস্থিতি স্থানলাভ করিয়াছে।

গ্রন্থখানি যে মোগল-শাসনসময়েই রচিত হইয়াছিল, এই জনশ্রুতির সাহায্যে তাহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের রচনা-রীতির মধ্যেও আধুনিকত্বের পরিচয় সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থের কোনরূপ ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, থাকিলে, তাহা কিরূপ মূল্য, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য।

মোগল-শাসন-সময় পর্য্যন্ত গৌড়াঞ্চলে পুরাকালের যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, তদবলম্বনেই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। সেই জনশ্রুতি এখন আর প্রচলিত নাই, সুতরাং পুরাতন জনশ্রুতির আধার বলিয়া, এই গ্রন্থের কিছু না কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকা স্বীকার করিতে হইবে।

'রামচরিতম্'-কাব্যে রামপালদেবের বরেন্দ্রী উদ্ধারের কাহিনী যে ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা সমসাময়িক বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল। তিনি লোকসমাজে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় যশস্বী ছিলেন। তাঁহার কাহিনী সমসাময়িক সাহিত্যেও স্থান লাভ করিয়াছিল। তাঁহার কথা যে গ্রন্থে লিখিত হইয়াছিল, তাহা 'কলিযুগ-রামায়ণ' নামে পরিচিত হইয়াছিল। যে কবি তাহার রচনাকার্য্যে যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনিও 'কলিকাল-বাল্মীকি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি তৎকালে সুপরিচিত ছিল বলিয়াই, শীলচন্দ্র তাহা 'যথাদৃষ্টং' নকল করিয়াছিলেন; এবং সেই নকল নেপালের ন্যায় দুর্গম প্রদেশেও নীত হইয়াছিল। রামপালের 'বরেন্দ্রী-উদ্ধার-কাহিনী' বৈদ্যদেবের এবং মদনপালদেবের তাম্রশাসনেও ইঙ্গিতে সূচিত হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণে জানিতে পারা যায়, রামপালের কথা গৌড়জনের পক্ষে সহসা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থে রামপালের মৃত্যুকথা যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এ কালের জনসমাজে অশ্রদ্ধেয় অলৌকিক কাহিনী বলিয়া উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা আছে।

এ যুগে 'প্রায়োপবেশনে' তনুত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত অপরিচিত; তাহার জনশ্রুতি বিলুপ্ত; এবং শাস্ত্রে তাহা কলিযুগের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়াও উল্লিখিত। কিন্তু রামপালদেব সত্য সত্যই এরূপভাবে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকিলে, সে কথা গৌড়জনের পক্ষে সহসা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

'রামচরিতম্'-কাব্যেও [৪।১০] রামপালদেবের গঙ্গাগর্ভে তনুত্যাগ করিবার আখ্যায়িকা উল্লিখিত আছে। তাহা তুল্যকালবর্ত্তী জনসমাজে অধীত হইবার জন্য তুল্যকালবর্ত্তী কবিকর্ত্তৃক উল্লিখিত। সুতরাং তাহাকে কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। রামপালের তিরোভাব-কাহিনীর এইরূপ সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইবার পর, 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থের শ্লোকটি কিয়ৎ পরিমাণে ইতিহাসের মর্য্যাদালাভ করিবার যোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারিবে। এই গ্রন্থোক্ত 'রামাবতী'র নামও যে কাল্পনিক নাম বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না, 'রামচরিতম্'-কাব্যে এবং মদনপালদেবের তাম্রশাসনে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সেখজী কিরূপে 'রামাবতী'-প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইবার আশা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে লক্ষ্মণসেন দেবের দানক্রমেই 'রামাবতী' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থের এই কাহিনী উত্তরকাল-বিরচিত অলীক কাহিনী;—মুসলমানের দরগার সম্পত্তিতে হিন্দুর অধিকার সংস্থাপনের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাহা রচিত হইয়াছিল।

প্রকৃত কাহিনী কি, তৎসম্বন্ধে এখন কেবল সমসাময়িক অবস্থার সাহায্যে কতকগুলি আনুমানিক সম্ভাবনার অবতারণা করা যাইতে পারে। 'রামচরিতম্' কাব্যে তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামপালদেবের তিরোভাবে শিবোপাসক কাঠুরিয়া বিজয়সেন মন্ত্রিবর্গের সহায়তায় গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। সমসাময়িক লিপিপ্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে, এবং 'রামচরিতম্'কাব্যেও প্রসঙ্গক্রমে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, —রামপালদেবের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালদেবের প্রধান মন্ত্রীর পুত্র বৈদ্যদেব রামপালপুত্রের প্রধান মন্ত্রী হইয়া 'অনুত্তর বঙ্গে' [দক্ষিণবঙ্গে] নৌযুদ্ধে বিজয়লাভের পরে, কামরূপাধিপতির বিদ্রোহবিকার নিরস্ত করিয়া, কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পরে, রামপালদেবের পৌত্র তৃতীয় গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, পরলোকগামী হইলে, রামপালদেবের অপর পুত্র [মদনপালদেব] রাজা হইয়া "রামাবতীনগর-পরিসর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার" হইতে তদীয় বিজয়রাজ্যের অষ্টম সম্বৎসরে ভূমিদান করিয়াছিলেন। মদনপালদেবের চতুর্দ্দশ রাজ্য-সম্বৎসরেরও একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং রামপালদেবের

তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বরেন্দ্রীমণ্ডল হইতে পাল-সাম্রাজ্যের অধিকার উৎখাত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সেন-রাজবংশের প্রথম রাজা শিবোপাসক বিজয়সেনদেব বরেন্দ্রীর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে [রাজসাহীর অন্তর্গত বিজয়-নগরে] রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, সেই স্থানের উপকণ্ঠেই একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়তীরে তাঁহার প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে উমাপতিধর লিখিয়া গিয়াছেন,—বিজয়সেন দেব "গৌড়েন্দ্রং অদ্রবৎ"। সুতরাং বিজয়সেন দেবের শাসন-সময়ে সমগ্র বরেন্দ্রীমণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত হয় নাই; তখনও গৌড়েন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিই যে পাল-রাজবংশের বরেন্দ্রী-মণ্ডলের শেষ রাজা, তাহাই প্রতিভাত হয়। তাঁহার নাম এখনও অপরিজ্ঞাত।

'রামচরিতম্' কাব্যে [৪। ২৯] দেখিতে পাওয়া যায়, মদনপালদেবের জয়ন্ততুল্য এক জয়শীল পুত্র ছিলেন। সুতরাং রামাবতী মদনপালদেবের সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্যবিচ্যুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বরেন্দ্রীমণ্ডল হইতে কালক্রমে পাল-সাম্রাজ্যের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইলে, 'রামাবতী' মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া থাকিবে। কারণ, সেনরাজগণ তথায় রাজধানী সংস্থাপিত না করায়, তাহার প্রাধান্য এবং বিভবশ্রী অল্পকালেই বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ক্রমে তাহার নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল! এখন আর বরেন্দ্রীমণ্ডলে 'রামাবতী' নামে কোন স্থানই পরিচয় প্রদান করে না।

শাহ জালালের সম্পত্তি লাভের ইতিহাস কিয়দংশে বাহুবলের ইতিহাস। তিনি অনেক পুরাতন পরিত্যক্ত ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন;—অনেক দেবমন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, এবং সময়ে সময়ে বরেন্দ্রী-মণ্ডলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অনেক ভূসম্পত্তি করতলগত করিয়াছিলেন। মুসলমানশাসনের প্রথম প্রকোপের সময়ে তাহা প্রশংসাযোগ্য কার্য্য বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিল।

এইরূপে শাহা জালাল যাহা অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার অনেক স্থানের পুরাতন স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নামও দূরীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার নিয়ত বাসস্থান পাণ্ডুয়া নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, তাহাই এখনও তাঁহার 'চিল্লাখানা' নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত তাহার আরও কয়েকটি সাময়িক বাসস্থান ছিল। তাহার সাধারণ নাম 'তাকিয়া' বা সাধু-পুরুষের বিশ্রাম স্থান। এই সকল 'তাকিয়া'য় বিশ্রাম লাভ করিয়া, শাহ জালাল তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিকার রক্ষা করিতেন। 'রামাবতী' এইরূপ একটি 'তাকিয়া'র নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। রামাবতী-অঞ্চল যে শাহ জালালের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থের তৎসংক্রান্ত উক্তিতে অনাস্থা স্থাপন করিবার কারণ নাই। সেখজীর 'বাইশ-হাজারী' ষ্টেটের সহিত 'রামাবতী'র সম্পর্ক না

থাকিলে, 'সেখ শুভোদয়া'গ্রন্থে তাহার কথা উল্লিখিত হইত না। 'রামাবতী'র স্থান নির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধানচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, [এই সকল কারণে] 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই 'সেখ শুভোদয়া' গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য।

যাঁহারা পুস্তকালয়ে বসিয়া, স্বদেশের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের অপেক্ষাকৃত আনন্দপ্রদ আয়াস স্বীকারকেই যথেষ্ট আয়াস-স্বীকার মনে করিয়া, আত্মতৃপ্ত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে [প্রয়োজনাভাবেই] কাহারও সাহায্যের অভাব অনুভূত হয় না। কিন্তু কেবল পুস্তকালয়ে বসিয়া পুস্তক-নিহিত সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পুস্তক অধ্যয়নের জন্য নানা স্থান পরিদর্শন করিতে হয় নানা স্থান পরিদর্শনের জন্যও পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। উভয় কার্য্যের প্রয়োজনই পরস্পরের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ। এই সরল সত্যটি অস্বীকার করিয়া, বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলন করিতে বসিলে, আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

'রামচরিতম্'-কাব্যে অনেক সমসাময়িক ঘটনার এবং ঘটনা-স্থানের উল্লেখ আছে ;—অনেক সমসাময়িক ঘটনার এবং ঘটনা-স্থানের ঐতিহাসিক পাত্রেরও উল্লেখ আছে। প্রধান ঘটনাস্থানে [বরেন্দ্রী-মণ্ডলে] এখনও তাহার অনেক স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কিছুই বর্ত্তমান নাই মনে করিয়া, ভ্রমণক্লেশ পরিহার করিবার চেষ্টা করা, অনুসন্ধানবিমুখ বাঙ্গালীর পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক হইলেও, রাম-চরিতোক্ত স্থানাদির অনুসন্ধানের জন্য একবার বরেন্দ্রী-মণ্ডলে ভ্রমণক্লেশ স্বীকার করিতে পারিলে, পল্লীবাসীর সাহায্যে অনেক পরিত্যক্ত পুরাতন স্থানের সন্ধান লাভ করিবার এবং 'রামচরিতম্'-কাব্যের অনেক দুর্ব্বোধ্য অংশ হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা আছে।

যাহারা ইতিহাসের এক বর্ণও অধ্যয়ন করে নাই, এবং কোথায় কোন্ প্রাচীন লিপিতে কিরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সন্ধান রাখিবারও শিক্ষা লাভ করে নাই ;—যাহারা 'রামচরিতম্'-কাব্যের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিবারও সৌভাগ্য লাভ করে নাই,—তাহারাও দিব্যের নাম অবগত আছে, দিব্যের দীঘি দেখাইয়া দিতে পারে ;—ভীমের নাম অবগত আছে, ভীমের ডাইঙ্গ, ভীমের জাঙ্গাল, এবং ভীমের গড় কোথায়, তাহা দেখাইয়া দিতে পারে। তাহারা হরিরাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া দেয়,—চন্দ্রপালের ভিটা, [আশা-পালের ?] উষাপালের বাড়ী, এবং রামপাল রাজার সহর কোথায়, তাহাও দেখাইয়া দিতে পারে। পুরুষানুক্রমে দেশের নিরক্ষর লোক এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনাস্থানের ও ঐতিহাসিক পাত্রগণের কথা যে ভাবে শুনিয়া আসিতেছে, সেই ভাবে বিবৃত করিয়া, পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের প্রভূত সহায়তা সাধন করিতে পারে। তাহাদের পল্লীকুটীরে দারিদ্র্যের মধ্যে

সহৃদয়তা আছে, মূর্খতার মধ্যে সরলতা আছে। তাহারা সত্য সত্যই যাহা কিছু কিঞ্চিৎ অবগত আছে, তাহাদের সেই জ্ঞানের মধ্যে জুগুপ্সা নাই,—সমালোচনার মধ্যেও অহমিকার অভাব! বরেন্দ্রীমণ্ডলের নিরক্ষর পল্লীবাসীর অযাচিত সন্ধান প্রদানে, যেস্থানে যেখানে 'রামাবতী'র ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক যথাকালে প্রকাশিত হইবে। তাহার সহিত 'রামচরিতোক্ত' বিবরণের সামঞ্জস্য আছে কি না, সকলেই তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সোরাব ও রোস্তাম *

ভরিল পূরব নব প্রভাতের শ্যামল আলোকে
'অক্ষসা'-প্রবাহ হ'তে উঠিল কুয়াসা। তীরে তীরে
তাতার শিবির সারি সকলি নীরব—নিশি শেষে
যত লোক ঘুমে নিমগন। একেলা সোরাব—নাহি
তার চখে ঘুম। সারা রাতি ছিল জাগি শয্যা'পরে
উলটি পালটি। যখন শিবিরে তার শুভ্র ঊষা
পশে ধীরে ধীরে—উঠিয়া সে পরিল আপন সাজ
ঝুলাল কটিতে অসি। লয়ে নিজ অশ্বারোহি-বাস
ত্যজিয়া শিবির বাহিরিল হিমসিক্ত কুয়াসায়
আঁধার শিবির বহি' পিরাণু-ইজার ঘর পানে।
তাতার শিবিররাজি কৃষ্ণবর্ণ ছিল বিরচিত
মধুচক্র সম মেশামিশি ছাইয়া সে অক্ষসার
সমতল নিম্ন উপকূল—যথা খর-রবি তাপে
পামিরার চূড়া হ'তে গলিত তুষার বহি' আনে
গ্রীষ্মের প্লাবন। গেল চলি' শ্যামল শিবির বহি'
নিম্ন সেই উপকূল দিয়া। উত্তরিল গিরি' পরে
নদীর সে তীর হতে ঈষৎ পশ্চাতে। যেইখানে
গ্রীষ্মে নদী অতিক্রমি' তরণী প্রথম আসি' লাগে।
আদিম মানবগণ মৃত্তিকার দুর্গ বিরচিয়া
সাজাইয়াছিল তারি ঊর্দ্ধদেশে মুকুটের মত।

* 'ম্যাথিউ আরনল্ডে'র মূল হইতে অনুবাদিত, চন্দননগর সাহিত্য-সভার বিশেষ অধিবেশনে লেখককর্তৃক পঠিত।

সে দুর্গ হয়েছে ধূলিসাৎ। এখন তাতারগণ
পেরাণ্-ইজাব তাঁবু সেইখানে কৈল বিরচন।
কাঠের সে ঘরখানি —শুষ্ক পত্রে ছাউনি তাহার।
সোরাব আসিল সেথা—প্রবেশিয়া তাহে গালিচার
স্তূপ'পরে দাঁড়াইয়া নেহারিল কম্বলশয়নে
পেরাণ-উইজা বৃদ্ধ নিদ্রায় আবিষ্ট হ'য়ে রয়।
অস্ত্র বর্ম আদি তার চারিদিকে রহে ছড়াইয়া।
যদিও পশিল ধীরে—শুনিলেন পেরাণ-উইজা
পদধ্বনি,—আছিলেন বৃদ্ধ সম লঘু নিদ্রাগত,
অমনি বাহুতে ভর করি উঠি' কহিলেন বাণী ;—
"কে তুমি? এখনো উষা হয় নাই সুস্পষ্ট প্রকাশ,
কহ কহ কি সংবাদ—নিশীথে কি পাইয়াছ ভয়?"
সোরাব শয্যার কাছে আসি কিন্তু কহিলেন তা'রে
"পেরাণ-উইজা। চেন মোরে তুমি, আমি আসিয়াছি—
এখনো উঠেনি রবি—ঘুমাইছে অরি। কিন্তু আমি
আছি নিদ্রাহীন—সারা রাত্রি ছিনু জাগি' শয্যা'পরে
উলটি পালটি ;—এখন এসেছি তোমার নিকটে।
অপ্রাশিব নৃপ মোরে দিলেন আদেশ, তব ঠাঁই
আসিয়া সমরকন্দে লইতে মন্ত্রণা—পুত্র সম
পালিতে আদেশ তব সেনা-যাত্রা করিবার আগে।
কহিব তোমারে আমি কি বাসনা জাগে হিয়া মাঝে।
জান তুমি—যে অবধি আসিয়াছি 'আদর-বিজান'
হ'তে তাতারের দলে, অস্ত্র ধরিয়াছি করে আর
তবু 'অপ্রাশিব' নৃপে সেবিয়াছি বহু, দেখায়েছি
বাল্যকালে বীরের বিক্রম। ইহাও ত' জান তুমি
বিজয়ী তাতার ধ্বজা ধরি যবে ফিরি ধরাতল
প্রতি ক্ষেত্রে পার্শীগণে পরাভূত করিয়া খেদাই,
একজনে—একজনে—মাত্র একজনে খুঁজিতেছি
রুস্তাম পিতারে মোর। আশা ছিল মনে, একদিন
একদিন তুমুল সমর মাঝে লবেন সম্ভাষি'
রণভূমে নিজ পুত্রে—যে নহে অযোগ্য পুত্র তাঁর
একান্ত গৌরবহীন ধরা মাঝে নহে যেই জন।

বহুদিন হ'তে আশা অন্তরের মাঝে এমনিই
ছিল মোর। এ অবধি কিন্তু তাঁর পাইনি সাক্ষাৎ।
শুন তবে—শুন তবে দেহ মোরে ভিক্ষা যাহা চাই।
বিশ্রাম করুক আজ উভ সৈন্যদল। রণক্ষেত্রে
আহ্বান করিব আজি দ্বৈরথ সমরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
পারসীক বীরে—একা একা যুদ্ধ করিবারে, যদি
জিনি তাহে—শুনিবেন নিশ্চয় রুস্তাম। যদি মরি
হে প্রবীণ! মৃতজন চাহিবে না কারে, মাগিবে না
কারো কুটুম্বিতা। বিপুল বাহিনী-যুদ্ধে শুনা যায়
ক্ষীণ জনরব, দলে দলে যুদ্ধ হয়—তা'র মাঝে
বহু বীরেন্দ্রের নাম ডুবে যায় একাকার. রণে
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কিন্তু কীর্ত্তি অসংশয় বীরত্ব প্রচারে।"

কহিলা সোরাব—পেরাণ-উইজা তার হাতখানি
নিজ হাতে নিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যজি' কহিলেন—
"হে সোরাব! অশান্ত হৃদয় আজি দেখিতেছি তব
তাতার প্রধান মাঝে রহি ত কি নাহি পার তুমি
সাধারণ যুদ্ধ ফল আমাদের সনে পার না কি
লইতে বণ্টন করি? ভালবাসি তোমারে সবাই।
কেন যেতে চাহ শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আশে দ্বৈরথ সমরে
প্রাণ করি পণ—খুঁজিতে পিতারে, কভু চোখে যারে
দেখনি কখনো। একই বাসনা এই কিন্তু যদি
জাগে নিরন্তর তোমার অন্তরে—বাহির করিতে
খুঁজি' বীরেন্দ্র রুস্তমে—রণের ভিতরে তবে নাহি
কর তাঁর অন্বেষণ। শান্তির মাঝারে খুঁজি তাঁরে
সোরাব! অক্ষত দেহে পিতার বাহুতে দেও ধরা।
দূরে—বহু দূরে তিনি—সেই খানে কর অন্বেষণ।
আমার শৈশব কালে আছিল যেমন এখন ত'
নাহিক সে দিন তাঁ'র। তখন যতেক হ'ত রণ
ধাইতেন সর্ব্ব অগ্রে দুর্জ্জয় রুস্তাম। পরিহরি'
রণভূমি এখন রহেন তিনি সিস্তানে বসিয়া
বৃদ্ধ পিতা 'জালে'রে সেবিতে শুশ্রূষিতে। আপনার
প্রৌঢ়কাল সমাগত বুঝি' মনে মনে—কিম্বা পাছে

নৃপ সনে কলহ হইয়া বুঝি থাকিবে তাঁহার।
যাও যাও। যাইবে না? অমঙ্গল চিন্তা আসে মনে—
বিপদ অথবা মৃত্যু মনে হয় ঘটিবে তোমার
রণভূমে। একান্ত কামনা এই—থাক নিরাপদে,
সুখে থাক যেখানেই হোক্—যদিও আমরা বৎস!
দেখা আর না পাই তোমার! অন্তরে জাগিছে সাধ
এই— শান্তি মাঝে অন্বেষণ করিবে পিতারে তব,
মিছামিছি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নাহি কোন কাজ। কিন্তু হায়!
সিংহশিশু যেই তা'রে বিক্রম হইতে কে বা বারে
রুস্তাম-তনয়ে আর কে রাখিবে রুধিয়া? এস বৎস
দিনু অনুমতি কর নিরন্তর চিত্ত যাহা চায়।"

এমনি কহিয়া তিনি ছাড়িলেন সোরাবের হাত,
ত্যাগ করিলেন শয্যা—উত্তপ্ত সে কম্বল—আচ্ছদ
বেষ্টিত ছিলেন যাহে—নিজ শীতল অঙ্গের'পরে
পরিলেন পশমী পোষাক। পরিলেন পদযুগে
চন্দনের খরম জোড়াটি। শুভ্র এক আস্তরণ
জড়াইয়া দেহে—নিলেন দক্ষিণ হস্তে শাসকের
দণ্ড,—দীপ্ত অসি ত্যজি'। মেষলোমে রচিত উষ্ণীষ
পরিলেন শিরে। কুঞ্চিত উজ্জ্বল কৃষ্ণ, কেবাকুল
লোমে বিনির্ম্মিত। তাঁবুর পর্দ্দাটি তুলি' ডাকিলেন
স্তাবকেরে আপনার কাছে—বাহিরি' গেলেন চলি'।

ইতি মধ্যে উঠি' রবি প্রশস্ত অক্ষসা বক্ষ হ'তে
সমুজ্জ্বল তট বালু হ'তে আর কুয়াসারে কৈল
বিদূরিত। তাতার শিবির হ'তে অশ্বারোহীদল
মুক্ত প্রান্তরের'পরে দাঁড়াইল পিছনে পিছনে
সারি বাঁধি'। 'হামান' আদেশ দিল এইমত সবে।
পিরাণু-ইজার ইনি সহকারী সেনার নায়ক
প্রফুল্ল যৌবন বীরদেহ 'পরে বিরাজে রক্তিম।
দীর্ঘ অশ্বারোহী সারি কৃষ্ণবর্ণ শিবির হইতে
বাহিরিল স্রোতের মতন। অগ্রহায়ণের প্রাতে
পারস্য সাগর তীরে উষ্ণ বায়ু সেবনের আশে
দক্ষিণাভিমুখে যথা দীর্ঘ-গ্রীব সারসের দল

বেগে ধায় পরিহরি' অবালি মোহানা—কিম্বা ঘন
তুষারে আবৃত সেই কশ্যপহ্রদের শরবণ
ধায় দ্রুত কাস্‌বিনে আর এলাব্রজের দক্ষিণে
ঢাল ভূমি ভাগে—সেই মত ছুটিয়া চলিল বেগে
অক্ষসার তাতারীয় সেনা, রাজ-দেহ-রক্ষীদল
চলিল প্রথমে—শিরে কৃষ্ণ শিরস্ত্রাণ মেষ লোমে
যতনে রচিত—প্রকাণ্ড আকার, প্রকাণ্ড অশ্বের
পৃষ্ঠে চড়ি'। বোখারা ও খিভাদেশে তাহাদের বাস
ঘোটকীর দুগ্ধ হ'তে মদ্য তা'রা করে বিরচন।
তা'র পাছে দক্ষিণের শান্তভাবা তুর্কী সেনাদল
তুকাদল সালরের বর্ষাধারী দল—এসেছিল
এরা সব আত্রেক ও কশ্যপ হ্রদের তীর হ'তে।
খর্ব্ব দেহ, খর্ব্ব অশ্বে চড়ি' উষ্ট্রীর কদর্য্য দুগ্ধ
কূপের সলিল আর এরা করে পান। তা'র পাছে
এক ঝাঁক অশ্বারোহী যুদ্ধজীবী, জয় পরাজয়ে
তাহাদের এতটুকু নাহি আসে যায়। তার পরে
ফর্গানা তাতার দল—যক্ষতীসার তীরবাসী
অল্প শ্মশ্রু—শিরে আঁটা ক্ষুদ্র শিরস্ত্রাণ। কিপ্‌চক্‌
দেশে আর উত্তরের রিক্ত মরু মাঝে বাস করে
যে সব বর্ব্বর জাতি কাল মুক, উষ্ক-খুস্ক কেশ
কজাকের ঝাঁক, তা'রা উত্তর মেরুর কাছে কাছে
ঘুরিয়া বেড়ায়,—আর ভ্রাম্যমান খির্গিজির দল,
পামিয়ার হ'তে তারা শ্বেত অশ্ব এসেছিল চড়ি'।
শিবির হইতে সব সারি দিয়া বাহিরি' দাঁড়া'ল
মুক্ত সে প্রান্তর 'পরে। আর দূরে বিপরীত দিকে
পার্শীরা দাঁড়া'ল সারি দিয়া—মনে হয় খণ্ড খণ্ড
লঘু মেঘ বহু অশ্বাকার ধরিয়াছে। হয় জ্ঞান
তাতার তাহারা। খোরাসনবাসী ইলিয়াত আর
তা'র পাছে—পারস্যের রাজ সেনাগণ অশ্বারোহী
আর পদাতিক—দাঁড়াইয়া আছে কাতারে কাতারে,—
শাণিত ফলক যত রবি-করে করে ঝক্‌ ঝক্‌।
পিরাণ-উইজা কিন্তু এল তা'র দূতের সহিত

তাতার-বাহিনী ঘুরি' পুরোভাগে আসি দাঁড়াইল।
পারসীদলের নেতা ফেরুদ যখন দেখিলেন
পিরাণ-উইজা যত তাতারেরে রেখেছে ঠেলিয়া —
বল্লম লইয়া করে পুরোভাগে আসি' সেনাদের
গতি রুধি' আদেশ দিলেন তথা স্থির থাকিবারে,
সে বৃদ্ধ তাতার তবে বালুকার প'রে স্পন্দহীন
উভ সৈন্য মাঝে দাঁড়াইয়া সম্বোধি কহিলা সবে,
"শুন হে ফেরুদ! শুন পারস্য ও তাতার সৈনিক
ক্ষান্ত হোক্ উভ দলে আজিকার মত মহারণ
পারস্য প্রধানগণে দিক্ নির্ব্বাচিয়া এক বীর
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবারে একা একা মোদের পক্ষীয়
বীরবর সোরাবের সনে।"

হেমন্ত প্রভাতে যথা
উজ্জ্বল শিশির বিন্দু শস্যশীর্ষ'পরে যবে করে
ঝক্ ঝক্—আনন্দ হিল্লোল এক বহে মর্ম্মরিয়া
সুগভীর শস্যবন মাঝে—তেমনি শ্রবণ করি
পৈরাণ্-ইজার বাণী, তাতার সৈনিক হিয়া মাঝে
প্রিয় সোরাবের লাগি' বহে গর্ব্ব-আনন্দ হিল্লোল।
কিন্তু যথা একদল ফেরিওয়ালা কাবুল হইতে
ভারতীয় ককেশস্-তল দিয়া অতিক্রম করে
তুষারকিরীটী শুভ্র মেঘচুম্বী বিশাল পর্ব্বতে
অবশেষে আরোহিয়া অতি উচ্চে নেহারে যখন
ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষিকুল শ্বাসরুদ্ধ মৃত আছে পড়ি —
মিষ্ট জম্বুরসে আর নিজকণ্ঠ ভিজাবার আগে
বাঁধিয়া একটি সারি ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে চলে
তুষার খসিয়া পড়ে পাছে পদ চাপে, তেমনিই
পার্সীগণ রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে রয় মহা এক ভয়ে।

(ক্রমশ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র *

জয়পুরের ঐতিহাসিক কথা

কর্ম্মীর জীবনচরিত বুঝিতে হইলে তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরিচয় আবশ্যক। বিশেষতঃ মন্ত্রীর জীবনী বুঝিতে, সে রাজ্যের ইতিহাস জানার একান্ত প্রয়োজন। তাই সংসারচন্দ্রের জীবনী লিখিতে বসিয়া সর্ব্ব-প্রথমে জয়পুর রাজ্যের একটা মোটামুটি ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিতেছি।

জয়পুর-রাজ-বংশ ত্রেতাযুগাবতার ভগবান্ রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশোদ্ভূত। এজন্য ইঁহারা "কাছোয়া" রাজপুত নামে অভিহিত। ঠিক কোন্ সময়ে যে এই শাখা অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র রাজ্য স্থাপনের জন্য বহির্গত হন, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, কেননা তাহা লোকশ্রুতির আবছায়ার মধ্যে লুক্কায়িত। ইঁহারা যখন শোণ নদীতীরে রোহতস্-গড় স্থাপন করেন, তখন হইতে 'ঢুঁঢার' (বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্য) জয় পর্য্যন্ত এই কালের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। রোহতস্ গড় হইতে কাছোয়া রাজপুতগণ গোয়ালিয়রের উত্তরে এবং সিন্ধু ও পাহুজ নদের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ জয় করিয়া পরে বর্ত্তমান গোয়ালিয়র নগর হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে 'নারবর' নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে ইঁহারা প্রায় নয়শত বৎসর রাজত্ব করেন এবং এই সময়েই কাছোয়া-রাজ সুরজ সেন কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১১২৮ খৃঃ অব্দে কুমার দুলে-রাও নারবর হইতে দৌসা রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে তথায় আগমন করেন। আসিবার সময় তাঁহার ভাগিনেয় পরমল দেবকে গোয়ালিয়র শাসনের ভার দিয়া আসেন। কুমার দুলেরাও দৌসায় অনেক দিন বাস করায়, পরমলদেব গোয়ালিয়র সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। এদিকে দৌসারাজের পুত্রাদি নাই—কুমার দুলেরাওই

---

* যে সকল মহাত্মা সংসার সমুদ্রের বেলাভূমে পদচিহ্ন রাখিয়া যান মানুষ স্বভাবতঃ তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতূহলী। কর্ম্মবীরের জীবনী ঘটনা-বহুল, কাজেই তাঁহার জীবনী লেখক সহজেই তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহ সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু যে নিগূঢ় সাধনার বলে তিনি আপনার জীবনকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা কোনো বিশ্লেষণ যন্ত্রে প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা তাঁহার সেই সাধনার ফলমাত্র দেখিতে পাই।

জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্বর্গগত রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন, সি, আই, ই, এম, ভি, ও, মহোদয় সামান্য শিক্ষক হইতে কেমন করিয়া এই বিপুল রাজ্যের মন্ত্রিত্বপদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহা ঘটনা পরম্পরা গ্রথিত করিয়া দেখান সহজ, কিন্তু এই কর্ম্মযোগী অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে কেমন করিয়া প্রতিদিন এই সফলতার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা কে দেখাইবে?

বাংলা দেশের সুপুত্র সংসারচন্দ্রের জীবনী বাঙ্গালীর আদরের সামগ্রী। তিনি তাঁহার কৃতিত্ববলে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বঙ্গমাতার যে সমস্ত সুসন্তান, বাঙ্গালীর রাজকার্য্য পরিচালনের অক্ষমতার কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন, সংসারচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান গৌরব। জয়পুর রাজ্যের শাসনপ্রণালীতে তিনি যে উদারনীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুদূরগামী, এখনও তাহার প্রকৃত সমালোচনার দিন আসে নাই। কিন্তু এ রাজ্যে তিনি তাঁহার চরিত্রের যে প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অম্বরাধিপতির দীনতম প্রজাও অনুভব করিতেছে।

সে রাজ্যের উত্তরাধিকারী। কুমার দুলে রাও গোয়ালিয়র প্রত্যাবর্ত্তনের সংকল্প ত্যাগ করিয়া দৌসাতেই থাকা শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। ঢুঁঢার প্রদেশে এই প্রকারে কাহোয়া রাজবংশের রাজ্য স্থাপিত হইল।

তৎকালে রাজপুতনার পূর্ব্বাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ ঢুঁঢারের আদিম অধিবাসী মিনাগণের দ্বারা অধিকৃত ছিল। রাজ্য বিস্তারের জন্য কুমার দুলেরাও প্রথমে সিরোবংশীয় মিনাগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া তাহাদের 'মাচ'-নামক এক পার্ব্বত্যদুর্গ আক্রমণ করেন। কথিত আছে, দিবাভাগের যুদ্ধে কুমারের সৈন্যগণ মিনাদিগের নিকট পরাস্ত হয়। সন্ধ্যার সময় কুমার পরদিন কি উপায়ে দুর্গ অধিকার করিবেন চিন্তা করিতেছেন—এমন সময়ে এক রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"কুমার, আমি এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জমুয়া দেবী, আমার সাহায্য ব্যতীত তুমি এ দেশ জয় করিতে পারিবে না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে এই স্থানে তুমি আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আমার পূজার ব্যবস্থা করিবে এবং চিরকাল তোমার বংশের সকলেরই চূড়াকরণ-সংস্কার আমার এই মন্দিরে হইবে—তাহা হইলে আমি তোমাকে জয়লাভের উপায় বলিয়া দিতে পারি।" কুমার দুলেরাও অঙ্গীকার করিলে জমুয়া বা জমবায় মাতা যেখানে মিনাগণ জয়োল্লাসে মদ্যপান করিতেছে, সেই স্থানের সন্ধান বলিয়া দিলেন। কুমার দুলেরাও সেই রাত্রেই মিনাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন—মত্ত অবস্থায় কেহ বিশেষ যুদ্ধ করিতে পারিল না। তাহাদিগের অধিকাংশই হত হইল, বাকী কুমারের বশ্যতা স্বীকার করিল। কুমার এই মাচ দুর্গ ভাঙ্গিয়া রামগড় স্থাপন করিলেন। জমুয়া মাতার মন্দির এখন সেই ভীষণ গিরিবর্ত্মের পার্শ্বে বর্ত্তমান। এখনও কাহোয়া রাজবংশের চূড়াকরণ জমুয়া মাতার মন্দিরেই হইয়া থাকে। রামগড় ঢুঁঢার প্রদেশে কাহোয়াগণের দ্বিতীয় রাজধানী।

কুমার দুলেরাও এর মৃত্যুর পর তৎপুত্র কাঁকলরাও পিতার ন্যায় ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সে সময় সুথাবত-বংশীয় মিনাগণের অধিপতি ভাটো মিনা রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অম্বর তাঁহার রাজধানী, কাকলরাও ভাটোকে পরাজিত করিয়া সেখানে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। মিনাদিগের এই পার্ব্বত্যদুর্গই ইতিহাসবিশ্রুত অম্বর, যেখানে বহুশতাব্দী ধরিয়া কাহোয়া রাজগণের রাজধানী ছিল এবং যাহার অভ্রভেদি প্রাসাদসমূহ প্রাচ্য-শিল্প-শোভার ভাণ্ডার ও ভারতীয় স্থাপত্য-নৈপুণ্যের আদর্শ-স্থল। অম্বর জয়ের পর বহুকাল ধরিয়া রাজপুত্রগণকে আদিম মিনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এ সময়ের ইতিহাস রাজপুত ও মিনাদিগের বীরত্ব-কাহিনীতে পূর্ণ।

অম্বররাজ পাজুন, কুমার দুলেরাও হইতে ষষ্ঠ নরপতি। পাজুনের সময়েই অম্বরের ইতিহাস প্রথম মুসলমান আক্রমণের সহিত জড়িত। তাই সেই সময়ের একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে। এই সময়ে

সাহাবুদ্দিন ঘোরী সমগ্র পাঞ্জাবের অধীশ্বর। ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি এবং মুসলমানদিগের একমাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বংশমর্য্যাদায় ও বীরত্বে, পাজুন তখনকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট নরপতি—তাই পৃথ্বীরাজ তাঁহার সহিত নিজ ভগ্নীর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে একজন প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করেন। এক যুদ্ধে পাজুন সাহাবুদ্দিন ঘোরীকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে খাইবার গিরিবর্ত্ম দিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করেন।

এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় বিস্তারিত ভাবে জয়পুরের সমগ্র রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভব নহে—তাই আমরা অম্বরের প্রধান প্রধান রাজাদিগের উল্লেখ করিব মাত্র। মোগলবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর যখন ভারত আক্রমণ করেন—তখন পৃথ্বীরাজ অম্বরের অধিপতি। পৃথ্বীরাজ হইতে মহারাজ সবাই জয়সিংহ পর্য্যন্ত নরপতিগণ, মোগলসম্রাট বাবর হইতে ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক। এই পৃথ্বীরাজের দ্বাদশ পুত্র, কাছোয়া রাজ-বংশের "বারকোটরীর" প্রবর্ত্তয়িতা। পৃথ্বী-রাজের মৃত্যুর পর, ভারমল্ল অম্বর সিংহাসন অধিকার করেন। ভারমল্ল হুমায়ুন ও আকবরের সমসাময়িক ও উভয়েরই সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। তাঁহারা ইঁহাকে বহু সম্মানে "পঞ্চহাজারী মনসবদার" পদে বৃত করেন।

তৎপরে ভারমল্লের পুত্র ভগবানদাস অম্বরের রাজগদি প্রাপ্ত হন। পিতা জীবিত থাকিতেই ইনি "পঞ্চহাজারী মনসবদার" পদ প্রাপ্ত হন। এই বীরপুরুষ সরতানের যুদ্ধে আকবরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম হোসেন মিরজাকে অনুধাবন করিতে করিতে একদিন আকবর সাহ মাত্র ১৫৬ জন রাজপুতসৈন্য লইয়া ইব্রাহিমের সম্মুখীন হইলেন। ইব্রাহিমের সহিত সহস্রাধিক সৈন্য। রাজা ভগবানদাসের পুত্র জগদ্বিদিত মানসিংহ দ্বিধামাত্র না করিয়া সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। এদিকে আকবরকে একাকী দেখিয়া ইব্রাহিমের তিনজন অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রাজা ভগবানদাস সম্রাটের বিপদ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুর সম্মুখীন হইয়া দুইজনকে নিহত করিলেন—অপর অশ্বারোহী পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

রাজা ভগবানদাসের স্বর্গারোহণের পর, ১৫৯০ খৃঃ অব্দে মহারাজ মানসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মানসিংহ আদর্শ রাজপুত ছিলেন—যুদ্ধে অপরাজেয়, মন্ত্রণায় বিচক্ষণ, বিপদে ধীর, রাজভক্তি ও বন্ধুত্বে একনিষ্ঠ এবং শাসনকার্য্যে একান্ত ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ সেনা-নায়ক ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারই বীরহস্ত, আসাম হইতে কাবুল কান্দাহার কাস্পিয়ান হ্রদের তট পর্য্যন্ত* আকবরের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়-মান ও রাজ্য দৃঢ়ীভূত করিয়াছিল। তাঁহারই শাসনে কাবুলের দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্যজাতিসমূহ শান্তভাব অবলম্বন করিয়া, মোগলসম্রাটের

*মহারাজ মানসিংহের আনীত পারস্যদেশীয় কার্পেট এখনও জয়পুর রাজ-প্রাসাদে দেখিতে পাওয়া যায়।

অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। মোগলসম্রাট এই বীরের যথোচিত সম্মান করিতেন এবং তাহাকে যথোক্ত সম্মান —সপ্তহাজারী মনসবদারের পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ মানসিংহের পরবর্ত্তী নরপতি মিরজা রাজা জয়সিংহ, ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক এবং মানসিংহের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তিনি কেমন করিয়া মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীকে মোগল বাদসাহের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এই সন্ধিই তাঁহার কাল হইল। কূটনীতি বিশারদ ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দিল্লীতে বন্দী করিবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু রাজপুত মহারাজ জয়সিংহ নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি শিবাজীর পলায়নের সাহায্য করিলেন। তাহার ফলে তাঁহাকে সম্রাটের ক্রোধে প্রাণ হারাইতে হইল।

অম্বর-রাজধানীর সর্ব্বশেষ নরপতি, —সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ মহারাজ সবাই জয়সিংহ। মহারাজ সবাই জয়সিংহ ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার রাজত্বকালের শেষাংশে দাক্ষিণাত্য-জয়ের সঙ্গী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মোগলসম্রাটের নিকট 'সবাই' * এই বিশিষ্ট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন—এই উপাধি এখনও জয়পুরাধিপতিগণ নিজ নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, যখন দক্ষিণ হইতে দুর্দ্দান্ত মারাঠা-সৈন্য পতঙ্গপালের মত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিল, জাঠেরা যখন মারাঠাদিগের অনুকরণে কেবল লুটপাটকেই জয়ের চরম ফল মনে করিয়া দেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল, যখন নব-প্রবুদ্ধ শিখজাতি আপন বীর্য্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সেই বিশৃঙ্খলা, আত্মবিচ্ছেদের দিনে অম্বরপতি সবাই জয়সিংহ যে ভাবে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পায়। কঠিন রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াও যে তিনি কেমন করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিবার সময় পাইতেন তাহা বিস্ময়ের কথা। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মান-মন্দির * সকল তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। সে সকল আজও সমস্ত সভ্যজগতের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রে হিন্দুদিগের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। মহারাজ সবাই জয়সিংহই বর্ত্তমান জয়পুর-নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য, মহারাজ মানসিংহের বঙ্গদেশ হইতে আনীত যশোরেশ্বরীর পূজারীবংশে জন্মগ্রহণ করেন—তিনি নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে রাজ্যে পূর্ত্ত বিভাগের কর্ত্তা ও পরে রাজমন্ত্রী হয়েন। এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই মহারাজা জয়সিংহের অনুজ্ঞা-ক্রমে এই অভিনব নগরী নির্ম্মাণ করেন। এরূপ ধরণের নগরনির্ম্মাণপ্রথা ভারতেরই শাস্ত্র-সম্মত †, কিন্তু

* সবাই—বা সওয়া (১¼) অর্থাৎ অনন্যসাধারণ।

* জয়পুর, দিল্লী, বারাণসী, উজ্জয়িনী এবং মথুরায় এই মানমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

† অম্বর-প্রাসাদে, অযোধ্যার যে চিত্র আছে, তাহা

ভারতবর্ষ সে আদর্শ ভুলিয়াছিল—মহারাজ সেই আদর্শকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। আধুনিক সিকাগো প্রভৃতি নগরও এই একই প্ল্যানে নির্ম্মিত হইতেছে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ সবাই জয়সিংহ, ঔরঙ্গজেবের ভয়ে বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রী ৺গোবিন্দজী ও গোপীনাথজী বিগ্রহদ্বয়কে জয়পুরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রী ৺গোবিন্দজী এখনও রাজভবনের মধ্যে সসম্মানে পূজিত হইতেছেন—এখন জয়পুর রাজ্যের তিনিই মালিক এবং মহারাজগণ তাঁহার দেওয়ান বলিয়া লিখিত হ'ন।

মহারাজ সবাই জয়সিংহের পর ঈশ্বরী (ইসুরী) সিংহ ও তৎপরে সবাই মাধো সিংহ (প্রথম) জয়পুর-সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাধো সিংহ, উদয়রাজ-দুহিতার পুত্র। তিনি উদয়পুর মহারাণার নিকট ভারতের সুবিখ্যাত দুর্গ "রন্থম্ভোর" প্রাপ্ত হন। এই দুর্গই ইতিহাসবিশ্রুত পদ্মিনী দেবীর জন্য মামুদ ঘোরীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। এই দুর্গ যে কত পুরাতন তাহা নির্দ্ধারণ করার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে ইহার আসল নাম—"রণ-স্তম্ভ-ভোর" অর্থাৎ ভোরবংশীয় রাজার রণস্তম্ভ। দুর্গের সম্মুখের পাহাড়ের নাম "রণ-কি-ভুঙ্গর" —এই নাম হইতে পূর্ব্বোক্ত অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয়। কবে ও কেমন করিয়া যে এই দুর্গ উদয়পুরের মহারাণাদিগের অধীনে আসে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহারই নিকটে মহারাজ মাধো সিংহ জয়পুরের আদর্শে নিজ নামে 'সবাই মাধোপুর' নগর নির্ম্মাণ করেন।

সবাই মাধো সিংহের পর হইতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্তের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সিপাহীবিদ্রোহের সময় মহারাজ সবাই রামসিংহ জয়পুর সিংহাসনে আসীন। এই দুর্দ্দিনে মহারাজ ভারতে শান্তিস্থাপনের জন্য ইংরাজরাজের অনেক সাহায্য করেন, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিবিধ সম্মান ও কোট কাসিম জেলা দান করেন। মহারাজ রামসিংহ শৌর্য্যে বীর্য্যে, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় সে সময়কার ভারতের রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে মহারাজ রামসিংহ স্বর্গারোহণ করিলে, বর্ত্তমান মহারাজ সবাই মাধোসিংহ (দ্বিতীয়) জয়পুরের গদিতে আরূঢ় হইয়াছেন।

বিবিধ বিবরণ

বর্ত্তমান কালে রাজপুতনার মধ্যে জয়পুরই সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী। ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৬ হাজার বর্গ মাইল—লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ২৭ লক্ষ ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, জাঠ ও মিনাদিগের সংখ্যা অধিক। রাজপুতের সংখ্যা প্রায় সওয়া লক্ষ—ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ কছোয়া বংশীয়।

জয়পুরে রাজপুত সর্দ্দারের সংখ্যা ১১৮০, তন্মধ্যে তাজমী * বা প্রধান শ্রেণীর সংখ্যা ১৮০। রাজ্যের মধ্যে নগর ও গ্রামের সংখ্যা ৫৭৭৩—তন্মধ্যে জয়পুর, সীকর, ফতেপুর,

দেখিলে জয়পুর কি প্ল্যানে নির্ম্মিত বেশ বুঝা যায়। রামায়ণে অযোধ্যার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

* ইহা বিশেষ সম্মান। এ শ্রেণীর সর্দ্দার দরবারে নজর করিবার সময় মহারাজ দাঁড়াইয়া নজর গ্রহণ করেন।

নবনগড়, ঝুন্‌ঝুনু, হিন্দোন এবং সবাই মাধোপুর প্রধান। জয়পুর ১১টি জেলায় এবং ৩৩টি তহশীলে বিভক্ত।

জয়পুর রাজ্য রাজপুতনার পূর্ব্বাংশের সমতল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে আরাবলী গিরিশ্রেণী এবং পার্ব্বত্য নদীসমূহ ইহাকে মরুভূমির মধ্যেও শোভায় এবং শস্যসম্পদে শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

বম্বে-বরোদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দুইটি শাখা জয়পুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং নগদা-মথুরা রেল লাইনের ৮৫ মাইল এই রাজ্যের মধ্যে পড়িয়া এই রাজ্যকে সুগম ও ব্যবসা বাণিজ্যের পথ প্রসার করিয়া দিয়াছে।

জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের মধ্যস্থলে সুবিখ্যাত সম্বর লবণ হ্রদ। ইহা দুই রাজার অধিকারভুক্ত এবং উভয়েই গভর্ণমেণ্টের নিকট লবণের জন্য রাজকর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মহাভারতের বিরাট রাজ্য এখন জয়পুরের অন্তর্গত। পুরাতন বিরাট (আধুনিক নাম বৈরাট) নগরীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। জয়পুর বহু পুরাতন হিন্দুরাজ্য—এখানে যে অসংখ্য হিন্দুকীর্ত্তি বর্ত্তমান তাহা বলা বাহুল্য—সে সকলের বিবরণ দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নহে—অভিপ্রায় থাকলেও তাহা দুঃসাধ্য। রাজপুতনার প্রত্যেক গিরিবর্ত্ম, প্রত্যেক দুর্গ, এমন কি বোধ হয় প্রতি প্রস্তরখণ্ড রাজপুতদিগের বীরত্বের কাহিনীর সহিত বিজড়িত। এ সকল কাহিনী ঐতিহাসিকের নিকট বহু মূল্যবান। এক অম্বরের সহিতই ভারত ইতিহাসের কত না স্মৃতি জড়িত আছে! ভারতবর্ষের মধ্যে বর্ত্তমান উদয়পুরের পরই জয়পুর নানা বিপ্লবের মধ্যেও আপন স্বত্বা ও হিন্দুভাব ও পুরাতন প্রথা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। হিন্দুরাজ্যের পুরাতন আচার-ব্যবহার এখনও পর্য্যন্ত এই রাজ্যে যে কতটা পরিমাণে রক্ষিত—তাহা না দেখিলে বুঝা কঠিন।

আমার জীবন

৪র্থ ভাগ

(সমালোচনা)

বহু দিন পূর্ব্বে তৃতীয়ভাগ সমালোচনা করিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম ৪র্থ, ৫ম একবার সমালোচনা করা যাইবে; তাই ৪র্থ ভাগ পাইয়াও সমালোচনা করি নাই। এখন দেখিতেছি, আমরা সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্যসেবী চৈত্র মাসে নবীনচন্দ্রের জন্মভূমি চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম, এ সময়ে একবার সকলকেই নবীনের কথা শুনাইলে মন্দ হইবে না। বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি রায় কালীপ্রসন্ন এবং সেন নবীনচন্দ্র পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সহিত আমাদের বন্ধনের প্রধান রজ্জু ছিলেন; সেই দুইটি রজ্জুই ছিঁড়িয়াছে; তবে এবার চট্টগ্রাম-সম্মিলনী আর একরূপে বন্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন; আমরা

চন্দ্রশেখরাদি দেবদর্শন করিয়া, চট্টলের সাহিত্য সেবিগণের সহিত সম্মিলন করিয়া ঐহিক, পারত্রিক কার্য্য করিয়া আসিয়াছি।

তৃতীয় খণ্ডের সমালোচনার সময় বলিয়াছিলাম "নবানচন্দ্রের কবিত্বের ক্রম-বিকাশের পরিচয় তৃতীয় খণ্ডে পাইব। কিন্তু সে সকল প্রায় কিছুই নাই।" এবার অর্থাৎ ৪র্থ খণ্ড পাইয়া আর আমাদের সে আপশোষ করিবার উপায় নাই। শতপৃষ্ঠারও বেশী রৈবতক কাব্য ও কুরুক্ষেত্র কাব্যের ইতিহাস ও সমালোচনা আছে। এই সুদীর্ঘ সমালোচনা আলোচনা করার পূর্ব্বে গোটা কত গোড়ার কথা মনে করিতে পারিলে ভাল হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙ্গিন কাচখণ্ড ভিতরে দেওয়া কাচের ঠোঙা লইয়া বালক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে, আর প্রতিবার নূতন নূতন সুন্দর চিত্র দেখিতে পাইয়া, কত আনন্দ উপভোগ করে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ঠিক্ সেই রূপ জিনিষ; দুইবার সমান দেখা যায় না—অথচ প্রত্যেক বারই অতি সুন্দর, নয়নাভিরাম, বৈচিত্র্যময়, শৃঙ্খলাপূর্ণ, শতকোণ-বিশিষ্ট। আবার একটু একটু করিয়া ঘুরাও আর দেখ—উঠিছে, পড়িছে, ভাঙ্গিছে, গড়িছে, অথচ সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা সকল সময়েই ফুটিয়া উঠিতেছে।

বহু পূর্ব্ব হইতে, এই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের নানা রূপ ছিল। রাধা-কৃষ্ণ, কুব্জা-কৃষ্ণ, রুক্মিণী-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন মূর্ত্তির উপাসক বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহাদের উপাসনার প্রকরণ-পদ্ধতি পৃথক, অঙ্গের চিহ্ন পৃথক্। আজি চারিশত বৎসর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইয়াছে। আমাদের সময়েও চারি জন প্রসিদ্ধ লোকে চারি রূপে কৃষ্ণচরিত্র বিবৃত করিয়াছেন। (১) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, (২) বঙ্কিমচন্দ্র, (৩) নবীনচন্দ্র, (৪) শিশির-কুমার ঘোষ। সকলেই জানেন প্রথম তিন জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং শেষোক্ত ব্যক্তি রাজনীতির ঘুণ। কেদারবাবুর শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা সংস্কৃত গ্রন্থ, অনুবাদ আছে। পুরাণ বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণ-চরিত্র অনুশীলন তত্ত্বের (culture theory) দৃষ্টান্ত। নবীনবাবুর রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নববঙ্গের মহাকাব্য। শ্রীল শিশির-কুমারের কালাচাঁদ-গীতা অভিনব রসমঞ্জরী। এই সকল লইয়া বিচার-বিতণ্ডা করা চলে না। যিনি যে ভাবে যেদিক্ ধরিয়া আমাদিগকে দেখিতে বলিতেছেন, সেই ভাবেই আমরা দেখিব, আর চিত্রের সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিব। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মুষা বা ঈষা, মহম্মদ বা নেপোলিয়ন নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্ব বৈচিত্র্যের, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার। যত বিভিন্নভাবে তাঁহার চরিত্র অনুশীলিত হইবে, ততই তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষিত হইবে। নবীন বাবু বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী; বঙ্কিমবাবু বলেন (There never was a greater champion of it) তিনি ব্রাহ্মণ্য-স্থাপনের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী। নবীন বাবুর গ্রন্থ হইতেই দুইটা উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরুন যেন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন-পূজা প্রচলিত করেন।

ইন্দ্র দেবরাজ মহাবর্ষণে ব্রজমণ্ডলের লোকগণকে ব্যতিব্যস্ত করেন, বজ্রপাতে মধ্যে মধ্যে সংহারমূর্ত্তিতে তাহাদের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করেন; আর গোবর্দ্ধন, বিষম বন্যার জল আটকাইয়া গোকুল রক্ষা করেন, আর মহাপ্লাবনের সময় নিজের উচ্চ সানুদেশে পশু-সন্তান রক্ষা করিয়া, গোজাতির পোষণের আয়োজন করিয়া রাখেন—শ্রীকৃষ্ণ যদি ঐ ভাবের পূজা না করিয়া এই রক্ষা-কর্ত্তা পোষণকর্ত্তার পূজাব বিধান করিয়া থাকেন—তাহা হইলে তাহাকে কি ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বলা যাইবে? তাহার পর, নবীন বাবু বলিতেছেন "যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেবা ক্ষুধার্ত্ত কিশোর কৃষ্ণকে এক মুষ্ট অন্ন পর্য্যন্ত ভিক্ষা দেয় নাই—ঠিক, কিন্তু তিনি বলেন নাই আমরা বলিতেছি, তাহাদেরই ব্রাহ্মণীরা অতি যত্নে তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়াছিলেন—তাহাতে কোনরূপ বিরোধ বুঝায়? না বুঝায় যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কঠোব নিয়মপালন-কারী ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণ কোমলহৃদয়া।

বঙ্কিমবাবু বন্ধুভাবে মুরব্বিভাবে নূতন করিয়া কৃষ্ণ গড়িতে নবীনবাবুকে নিষেধ করেন। বলেন, "Krishna preached, if he preached any thing, devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him up against the Brahmans. But the modern poet is of course welcome to give new character to Krishna." অন্যত্র "The old Mahabharat is so grand and has such a deep hold of your readers that only first class execution can make the new acceptable to them." কৃষ্ণ যদি কিছু উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণভক্তিই উপদেশ দিয়াছেন; মহাভারত লোকের মনে এত বসিয়া গিয়াছে যে, তাহার স্থলে আর কিছু বসান একপ্রকার অসাধ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া নবীনবাবু প্রথমে দমিয়া গিয়াছিলেন বটে, শেষে কিন্তু নূতন কৃষ্ণ খাড়া করিয়া কাব্য প্রকাশ করেন। তাহাব ফল কি হইয়াছে, আমি কিছু বলিব না, পাঠক মহাশয়েরা সকলেই জানেন। বিশেষ নবীনচন্দ্র একটি কথা বলিয়া, সকল সমালোচনা বন্ধ করিয়াছেন—সেটি এই—

"'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রাবলি কেন এরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই বা কেন এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি যেরূপ লেখাইয়াছেন, আমি সেরূপ লিখিয়াছি। কোন সর্গ লিখিতে বসিলেও যদি কেহ সেই সর্গে কি লিখিব জিজ্ঞাসা করিত, আমি তাহা বলিতে পারিতাম না।" ইহার উপর কোন কথা বলা আর চলে কি? তা কখনই চলে না। এখন ত নবীনচন্দ্র আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরলোকগত, তিনি ইহলোকে থাকিলেও আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিতাম না। সময় তাঁহার একমাত্র সমালোচক।

নবীনচন্দ্রের নাস্থবাব-গীতা পাওয়ার কিছু

দিন পরে, আমি তাহাকে যাহা লিখিয়াছিলাম, নবীনচন্দ্র তাহাই সার্টিফিকেটের মত এই খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে একটু আমারও সার্টিফিকেট হইয়াছে, সেই জন্য আমিও উদ্ধৃত করিতেছি, "দাদা অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিলেন—'তোমার গীতা তোমার বউঠাকুরাণীর কাছে তোমা.পক্ষাও আদরের বস্তু হইয়াছে। প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের বাঙ্গালা ভাগ অনেক মুখস্থ। শিবপূজার পরে এক বা দুই অধ্যায় প্রত্যহ ঠাকুর ঘরে পাঠ করেন। গীতার প্রচার দিন দিন বাড়িতেছে ; তুমি অর্দ্ধমূল্য করিয়া দিলে, তোমার গীতারই ভূয়ো প্রচার হয়।' তদনুসারে আমি এক টাকা হইতে উহার মূল্য আট আনা করিয়া দিয়াছিলাম।" এই শেষ কথা কয়টিই আমার সার্টিফিকেট।

নবীনচন্দ্র ও তাঁহার গীতানুবাদের কথা উঠিয়াছে, এই অবসরে, তাঁহার অনুবাদে একটি গুরুতর ভ্রমের কথা গীতানুবাদ-প্রকাশকদের নিকট জানাইতেছি। গীতার একাদশ অধ্যায়ের বত্রিশ শ্লোক—

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২।

'ঋতেঽপি ত্বাং' নবীনচন্দ্র অর্থ করিয়াছেন 'বিনা তুমি'' এটি ভুল।

যথা—

বিনা তুমি আর থাকিবে না কেহ
প্রতিসৈন্যস্থিত অস্ত্র যোদ্ধাগণ।

এই অর্থ হইতেই পারে না, তাহা হইলে ভগবান মিথ্যাবাদী হন।

এইরূপ হইবে :—

তুমি নাহি থাকিলেও মরিবে সকলে,
সেনার মণ্ডলীমধ্যে যত যোদ্ধাগণ।

ভাবি সংস্করণে এইটি শোধন করিলে ভাল হয়।

রাণাঘাট অবস্থানকালে কবি নবীনচন্দ্র সাহিত্যতীর্থ সন্দর্শন করিতে যান। অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, এবং আজুগোঁসাই ইহাদের ভিটার বা সাধন-মন্দিরের দুরবস্থা দেখেন ; অতি ভক্তিভরে সেই সকল বর্ণন করিয়াছেন, এবং হরিদাসের ভিটায় দীনদুঃখী বৈরাগীরা "একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে" তাহাও বলিয়াছেন।

পরিশেষে সাহিত্য-পরিষৎকে লক্ষ্য করিয়া গুটিকত কথা হৃদয় হইতে বলিয়াছেন, আমরা সেই কথাগুলি আমাদের নিজের কথা ভাবে গ্রহণ করিয়া সেই কথা কয়েকটিতেই এই সমালোচনার উপসংহার করিলাম—

"সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের এই তীর্থস্থানগুলির সংরক্ষণে হস্তক্ষেপ করিবেন কি ? ইহা অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য তাঁহাদের আর কিছু নাই।* বৎসর বৎসর বঙ্গের এই অমর পুত্রদের পুষ্প-চন্দনে পূজা করিয়া, তাঁহাদের চরণতলে যাঁহার যথার্থ সাধ্য প্রণামী দিলে, এই অর্থের দ্বারা সেই তীর্থগুলি রক্ষিত হইতে পারিবে। বঙ্গসাহিত্যসেবীদের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সম্মিলনের ও বঙ্গসাহিত্যের

---

* আছে বৈ কি ? তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করা। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস—কোন গ্রন্থই সমগ্র বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না।—লেখক।

সমালোচনার ক্ষেত্র আর কি হইতে পারে ? বৈরাগীদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সাহিত্য-সেবীরা ভারতচন্দ্রের, মুকুন্দরামের, রামপ্রসাদের, কৃত্তিবাসের, কাশীদাসেব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, মধুসূদনের, দীনবন্ধুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান সংরক্ষণ ব্রতে ব্রতী হইলে, কেবল বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত হইবে এমন নহে, আমরাও মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব।"

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

প্রদীপ *

স্বনামধন্য বড়াল কবির নূতন করিয়া পরিচয় দিবার, সমালোচনার শলাকা দিয়া প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা উজ্জ্বলতর করিয়া দিবার আদৌ প্রয়োজন নাই ; এবং আমার প্রিয় কবির কাব্য-সৌন্দর্য্য ছানিয়া অমৃত উদ্ধার করিবার শক্তিও আমার নাই। আর, যে প্রতিভা মধ্যাহ্ন-গগনচারী ভাস্বর ভাস্করের ন্যায় মৃন্ময়ী গৌড়লক্ষ্মীর পুষ্পখচিত শ্যামল অঞ্চলে ও চিন্ময়ী দেশমাতৃকার মন্দিরচূড়ার হেমকলসে প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমি বিভাসিত করিতেছে, ক্ষুদ্র appreciation'প্রস্তরে'র আলো ধরিয়া—বড়াল কবির ভক্তিপূত ঘৃতপ্রদীপ তুলিয়া ধরিয়াও—সে প্রতিভা দেশবাসীকে দেখাইবার চেষ্টাও যে বিড়ম্বনা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কবির সহিত আমার দুই যুগের সম্বন্ধ ; 'প্রদীপে'র সহিত আমার পরিচয় তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। তৃতীয় সংস্করণের 'প্রদীপে' সেই সম্বন্ধের—সেই পরিচয়ের একটু চিহ্ন থাকে, উভয় বন্ধুর এই ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করিবার জন্য এই পরিচয়ের 'পিলসুজে'র উপর বড়ালের প্রদীপটিকে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বসাইয়া দিতেছি। ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

যে বয়সে 'প্রাণারাম কিবা নির্ম্মল উজ্জ্বল বিভা' জীবনের চারি দিকে খেলা করিত, সেই বয়সে 'প্রদীপে'র কম্পিত শিখায় নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর অনেক প্রদীপ জ্বলিয়াছে, নিভিয়াছে ; কত তখনকার নূতন এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বড়ালের 'প্রদীপ' আমার পক্ষে এখনও নূতন আছে। আমার বিশ্বাস, —এ প্রদীপ ভবিষ্যতেও নূতন থাকিবে। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত বড়ালের 'প্রদীপ'ও—অবশ্য ক্ষুদ্র পরিসরে—সৃষ্টি-কুশলী। জীবনের ও জগতের নানা বৈচিত্র্য 'প্রদীপে'র বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ, মৃদু, আবেগচঞ্চল দীপশিখার মত এক একটি ক্ষুদ্র কবিতা আলোটুকু ছড়াইয়াই, আপনার বক্তব্যটুকু বলিয়াই নিঃশেষিত—নির্ব্বাপিত হয় না, ভাবুকের মানসপটে আলোয় ছায়ায় একটু নব ভাবের রেখা আঁকিয়া দিয়া যায়। বড়ালের গীতি-কবিতার ঝঙ্কারে অনেক বিস্মৃত ভাব ফুটিয়া উঠে, অনেক নূতন ভাব মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে। 'প্রদীপে'র খণ্ড-কবিতায় ভাবকে পূর্ণাবয়বে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস নাই।

---

* গীতিকাব্য। তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। মূল্য ৸৹

তাহা যতটুকু প্রকাশ করে, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক আভাসে ফুটিয়া উঠে। লীলাময়ী তটিনীর মত স্বচ্ছন্দবাহিনী স্বচ্ছ ভাষায় ভাবের ফুলগুলি ভাসিয়া যায়। যে দেখে, সে মুগ্ধ হয়। কিন্তু যে ভাবে, ভাবিয়া দেখে এবং দেখিয়া ভাবিতে পারে, সে প্রত্যেক ফুলে নূতন সৌন্দর্য্যের আভাস অনুভব করে। ফুলের সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও স্ব-রূপের অতিরিক্ত কিছু তাহার মনে ফুটিয়া উঠে। এই শ্রেণীর কবিতায় যে ভাব পাতা-ঢাকা ফুলের মত প্রচ্ছন্ন থাকে, ভাবুকের মনে তাহা রূপে, বর্ণে, গন্ধে সুসম্পূর্ণ হইয়া সার্থকতা লাভ করে। কবিতার যে উন্মাদনা, এই গূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই ব্যঞ্জনা। কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতম। 'প্রদীপে'র অধিকাংশ কবিতা এই ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

'প্রদীপ' কবির প্রথম রচনা। প্রথম বয়সের চিন্তায় 'আপনা'র প্রাধান্যই অধিক থাকে। 'অহম্'ই তাহাতে অধিকমাত্রায় ফুটিয়া উঠে। নবজাগরূক কবি চিত্তবৃত্তির আকস্মিক উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া আপনার সুখের গান, দুঃখের গান গাহিয়া যান। কিন্তু বিশ্বের সুখ-দুঃখের সহিত যাহার সম্বন্ধ অল্প, তাহা কখনও সার্ব্বভৌমিক—সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। সে সঙ্কীর্ণ সুখ-দুঃখের গান নিতান্তই ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে। সে দিন এক জন নিপুণ সমালোচক—স্বয়ং সুকবি—বলিয়াছেন, বড়াল জাত-কবি। সে কথা সত্য। তিনি জাত-কবি, এবং এই কারণেই প্রথম যৌবনেও সেই জাত-কবির স্বধর্ম্ম 'সহজ-বুদ্ধি'টুকুর আলোয় আপনার হৃদয়-বেলাভূমির উপলরাশি হইতে চিন্তামণিগুলি বাছিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার প্রথম রচনাবলীতেও 'ন্যাকামী' নাই বলিলেও চলে। কবি উত্তরকালে 'প্রদীপে'র অল্পবিস্তর সংস্কার করিয়াছেন। তাহাতে 'প্রদীপ' মালিন্যশূন্য—পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।

কবি 'কবিতা'য় নিজেই বলিয়াছেন—তিনি প্রথমে কবিতার 'উজ্জ্বল বিভায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক হারাইয়া', 'প্রদীপ' লইয়া সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যক্রমে তিনি লালসার শিখা—আলেয়ার আলোয় মুগ্ধ হন নাই। এই 'প্রদীপ'ই তাহার প্রমাণ। 'প্রদীপে' রক্ত-মাংসের গন্ধ আদৌ নাই, এমন বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা অত্যন্ত অল্প। যাহাও আছে, তাহাও লালসার—কামের ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধে বীভৎস হইবার অবকাশ পায় নাই। কাঁচা বয়সের প্রবৃত্তির তাড়নায়, মানব-মনের স্বাভাবিক মোহপ্রবণতার প্রেরণায় বড়াল কবির কিশোরী কল্পনা ক্বচিৎ লালসার রাগে রঞ্জিত হইয়াছে; কিন্তু কবি যেন স্বাভাবিক শক্তিবলে সে মোহ অতিক্রম করিয়াছেন। লালসায় যে কবিতার সূচনা, সৌন্দর্য্যের—বহিঃপ্রকৃতির বা অন্তঃপ্রকৃতির উদ্বোধনে তাহার উপসংহার হইয়াছে। মনে হয়, যেন আসারবঞ্চিত শুষ্কপ্রায় জলাশয়ের দুর্গন্ধ পঙ্কবিস্তারে প্রফুল্ল শতদল ঢল ঢল করিতেছে। এই শুচিতাই 'প্রদীপে'র আদিরসাত্মক কবিতাগুলির বিশেষত্ব। 'ভবনেত্রজন্মা বহ্নি' মদনকে 'ভস্মাবশেষ' করিয়াছিল। বড়ালের কিশোরী প্রতিভার শুচি-স্মিত-জ্যোৎস্নায় লালসার মোহিনী

যায়া দগ্ধ হইয়াছে। প্রথম বয়সের কবিতায় এমন সংযম প্রায় দেখা যায় না। উত্তর-কালে কবি স্বীয় রচনায় যে সুরুচি ও সু-নীতির পরিচয় দিয়াছেন, এই 'প্রদীপে'ই তাহার প্রথম সূচনা। বৃক্ষের জীবন ও ধর্ম্ম বীজেই নিহিত থাকে; অল্প পরিসরে তাহারক্রম-বিকাশ-পদ্ধতির অনুসরণঅসম্ভব।

নব্য-বঙ্গের সাহিত্যে প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঙ্গালা কাব্যে বিদেশী ভাবের প্রভাব অল্প নহে। বাঙ্গালীর নূতন গীতিকবিতাতেও প্রতীচ্য দুঃখবাদের ছায়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার অনেক কবি এই দুঃখবাদের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছেন। বড়াল-কবিও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যেও দুঃখবাদ আছে। কিন্তু তাহা গতানুগতিক বা প্রতীচ্য দুঃখবাদের 'হুবহু' প্রতিধ্বনি নহে। তাঁহার কবিতায় 'পেসিমিজ্‌ম্‌' আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রতীচীর 'নিহিলিজম্‌' নহে।

প্রতীচ্য দুঃখবাদের প্রভাব ভয়ঙ্কর, তাহা মানবকল্যাণের—বিশ্বহিতের পরিপন্থী। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ও দর্শনে দুঃখবাদ নাই, এমন নহে। কিন্তু প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দুঃখবাদে প্রভেদ আছে। প্রতীচীর দুঃখবাদ অনেক ক্ষেত্রে 'নিহিলিজমে'র—নাশের প্রবর্ত্তক। দুঃখে তাহার উৎপত্তি, কিন্তু দুঃখেই তাহার নিবৃত্তি নহে। সে দুঃখবাদের প্রভাবে মানব অন্ধ হয়; নিরাশায় বেদনায় মানবের মন মথিত হয়; উদ্‌ভ্রান্তের উন্মত্ত তাণ্ডবে মানব-সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়; নিরাশ, নিরুপায়, দুঃখপিষ্ট মানব অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া বর্ত্তমানকেই সকল দুঃখের হেতু কল্পনা করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য দানব-শক্তির আবাহন করে; দুঃখবাদের জ্বালামুখী অগ্নিধারার উদ্গার করে; সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত সে বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। ইহার ফল নাস্তিকতা, ইহার ফল নাশ, মৃত্যু।

প্রাচ্য দুঃখবাদ এত উগ্র, এত ক্ষিপ্ত, এত প্রচণ্ড নহে। আমাদের দুঃখবাদ সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীপারের দুঃখবাদের মত অন্ধও নহে। জগত নিরবচ্ছিন্ন সুখের লীলাভূমি নহে। মৃণ্ময়ী আমাদের জন্য দুঃখের পসরাও সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সেদিনও বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—'সুখ দুখ দুটি ভাই।' সুখই মানবের কাম্য, দুঃখ নহে। ভারতবাসীও দুঃখে মথিত হইয়াছে, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নূতন দুঃখের সৃষ্টি করে নাই। ভারতের দার্শনিক বলেন,—'দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিঃ পরম-পুরুষার্থঃ'। তাঁহারা দুঃখের মূল-উৎসের সন্ধান করিয়াছেন, এবং মানবকে সেই দুস্তর দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার সেতু দেখাইয়া দিয়াছেন। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই পরম-পুরুষার্থ। তাহাই মানবের কর্ত্তব্য। দুঃখ হইতে দুঃখান্তরের সৃষ্টি ও ধারাবাহিক দুঃখপরম্পরার ভোগ পুরুষার্থ নহে। ভারতের দুঃখবাদে আশা আছে, আশ্বাস আছে, দুঃখনিবৃত্তির উপায় আছে। বেদাদি তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দু দুঃখে অভিভূত হয়, পিষ্ট হয় না; দুঃখ অতিক্রম করিবার চেষ্টাই তাহার পরমপুরুষার্থ। হিন্দুর দুঃখবাদ—আধ্যাত্মিকতার সিংহদ্বার। তাহার পর

সুখবাদের নন্দন। তাহার পর আত্মজ্ঞানের তপোবন। এই তপোবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধক সুখ-দুঃখের অতীত হন, ভূমানন্দ লাভ করেন। এ দুঃখবাদে অবিশ্বাস নাই, নাস্তিকতা নাই। ইহা আত্ম-নাশের প্রবর্ত্তক নহে। দুঃখের স্বরূপ-নির্ণয় ও তাহার অত্যন্ত-নাশে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা,—ইহাই প্রাচ্য দুঃখবাদের প্রতিপাদ্য।

সর্ব্বজয়ী দুঃখ ও তাহার সর্ব্বব্যাপী প্রভাব কবির চিত্তও অধিকার করিবে, ইহা অবশ্য বিচিত্র নহে। প্রাচী ও প্রতীচীর অনেক কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন। কিন্তু উভয় দেশের দুঃখবাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রতীচ্য কবির দুঃখবাদের কবিতায় প্রতীচ্য প্রকৃতির বিকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন প্রাচ্য কবিদের দুঃখবাদে ভারতীয় ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু নব-ভারতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার কারণও অজ্ঞেয় নহে, সুস্পষ্ট। নব-ভারতে সমুদ্র-বেলায় নানা দেশের ভাব ভাসিয়া আসিতেছে। যে দেশের সহিত নব-ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছে, সে দেশের বহু ভাবে আমরা অভিভূত হইয়াছি। সাহিত্যেও সে প্রভাবের আধিপত্য ঘটিয়াছে। আমাদের সোনার বাঙ্গালায় সেই সম্বন্ধ প্রথম বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই যোগের যুগে বাঙ্গালী প্রতীচ্য ভাবের প্রথম পরিচয় লাভ করে। সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন বাঙ্গালার ভাব-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াও বাঙ্গালী সাগর-পারের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকায় আগন্তুকের পদাঙ্ক বোধ করি সহজেই মুদ্রিত হইয়াছিল। দেশের পুরাতন ভাঙ্গিতে লাগিল; অনেক প্রাচীন ভাব ও আদর্শ কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালী নবাগত বিজেতার ভাবে মুগ্ধ হইল। শ্বেত-দ্বীপের দুঃখবাদের ঝঙ্কারও বাঙ্গালী কবিদের বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ইহা অনুচিকীর্ষা হইতে পারে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী, অনতিক্রমণীয় প্রভাবের স্বাভাবিক ফলও হইতে পারে। কারণ যাহাই হউক, বাঙ্গালীর আদর্শ গ্রহণপটু স্বচ্ছ মনে এই বিদেশী দুঃখবাদ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, এবং এখনও হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অক্ষয়কুমারও সাহিত্য-সাধনার প্রথম সোপানে এই ভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায়ও দুঃখবাদের প্রগাঢ় ছায়া আছে। কবির প্রথম রচনা 'প্রদীপে'র নীচেও সে অন্ধকার বিদ্যমান। কিন্তু আমার মনে হয়, বড়ালের দুঃখবাদে একটু বিশেষত্ব আছে। বড়ালের বিষাদ-গাথা—নিরাশার গান হিন্দুর দুঃখবাদ। প্রতীচ্য দুঃখবাদের যাহা আদি, মধ্য ও অন্ত, তাহাতেই বড়ালের দুঃখের গানের সূচনা। প্রতীচ্য দুঃখবাদের প্রভাবে তাহার উদ্ভব বটে, কিন্তু হিন্দুর দুঃখবাদে তাহার পুষ্টি ও পরিণতি। দুঃখবাদে তাহাদের সূচনা, সুখবাদে তাহাদের সমাপ্তি। বড়াল কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন,—কিন্তু সেই দুঃখের হলাহলে সুখের সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি দুঃখে—অমঙ্গলে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হন নাই, মঙ্গলের আবাহন

করিয়াছেন। বড়ালের কাব্যে দুঃখবাদের বিষও অমৃতে পরিণত হইয়াছে। তিনি দুঃখদাবদগ্ধ হইয়াও আস্তিক, বিশ্বাসী; বিধাতার মঙ্গলবিধানে তাঁহার একান্ত নির্ভর। এই জন্যই তাঁহার 'পেসিমিজম'ও অনেকটা স্নিগ্ধ, শান্ত, সংযত। এই জন্যই তাঁহার দুঃখবাদও সুখবাদের পারিপোষক ও আনন্দের নির্ঝরে পরিণত হইয়াছে;—

"জগতের দুঃখ, নাথ, যত তুচ্ছ ভাব,
তত তুচ্ছ নয়।
কে জানে প্রলয়ে কবে, এ বিশ্ব বিলীন হবে,
সহিতেছি নিত্য ভবে সে দুর-প্রলয়।

* * *

পারি না বহিতে আর দুঃখের পসরা,
সুপ্রসন্ন হও।
জীবনে আশ্বাস দিয়া মরণে বিশ্বাস দিয়া,
যেমন গড়িয়াছিলে, পুনঃ গড়ে লও।"

ইহা হিন্দুর কামনা, হিন্দু কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস, আস্তিকের আন্তরিক প্রার্থনা।

অক্ষয়কুমার সৌন্দর্য্যের উপাসক, ভক্ত, ভাবুক। এই ভাবুকতার ফলে তাঁহার কবিতা ধন্য হইয়াছে। তিনি সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করেন নাই। কবি বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছেন, এবং পাঠককে তাহা অনুভব করিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ দিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি অসাধারণ। আন্তরিকতাই সাহিত্যের প্রাণ। অক্ষয়-কুমারের কবিতায় যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি, এই আন্তরিকতাই সেই প্রাণ-বলের অমৃত-উৎস।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় নারী ভোগের উপাদান নহে। কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানস-পুষ্পে অর্ঘ্য দিয়াছেন। এই উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া কবি ভাবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন; তাঁহার কবিতাও পবিত্র হইয়াছে। লালসার অঙ্কুর উদ্গত হইবামাত্র কবি স্বয়ং তাহা পদ-দলিত করেন। তিনি লালসার—বিলাসের ক্রীতদাস নহেন। তিনি রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু বিহ্বল হইয়া পিশিত-পিণ্ডের পূজা করেন না। রূপ অ-রূপের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যায়। বাসনার তরঙ্গ পূর্ণ প্রেমের বিক্ষোভ-বিহীন পারাবারে মিশিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহার প্রেমের কবিতায় লালসার রক্তরাগ নাই। সে প্রেম সর্ব্বত্র অগ্নিপূত শুদ্ধ হেম। তাহা ভোগতৃষ্ণার হাহাকার নহে—আত্মবিস্মৃত ভক্তের আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। কবি এই উচ্চ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইবার ও সন্নিহিত থাকিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় Human interest—'মানবিকতা' আছে। আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। অক্ষয়কুমার মানুষকে ভালবাসেন, মানবের সুখে দুঃখে তাঁহার প্রাণ হাসে, কাঁদে, তাঁহার কবিতা পড়িয়াই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। এই জন্যই তাঁহার কবিতার ঝঙ্কারে আমাদের প্রাণের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাঁহাকে এই বিপুল মানবপরিবারের এক জন,—নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই

মনে হয়;—চন্দ্রলোক-চারী, কমলবিলাসী কবি বলিয়া কল্পনা না করিয়াও তাঁহার কবিতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উপভোগ করিতে পারি। এইরূপ সমবেদনায় সমৃদ্ধ বলিয়াই তিনি বর্ত্তমান কালের বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া, অণু হইতে 'বরাট পর্য্যন্ত—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বাঞ্ছিতকে অনুভব করিয়াছেন। আর সেই অনুভূতির প্রসাদে তিনি 'প্রদীপে'র স্নিগ্ধ আলোয় দেখাইয়াছেন,—মানবের অপূর্ণতা প্রেমে পূর্ণ হয়, এবং সৃষ্টির রহস্য দ্বৈতেই চরিতার্থ হইয়া থাকে।

'প্রদীপে'র পাঠক এই সামান্য ইঙ্গিতে 'প্রদীপে'র কবিতাগুলির অনুশীলন করলে, এই ক্ষুদ্র 'প্রস্তুতি' সার্থক হইতে পারে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

বৈদিক সাধনার আভাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঋগ্বেদসংহিতায় বহু দেবতা গীত, স্তুত ও আরাধিত হইয়াছেন। মন্ত্রদ্রষ্টা আর্য্য ঋষিগণ ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়োলাভার্থ নিত্য আরাধনার দ্বারা ও দীর্ঘ সত্রসকলের অনুষ্ঠান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা করিয়াছেন।

"নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ
নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।"

১।২৭।১৩

"বহুগুণবিশিষ্ট দেবগণকে নমস্কার, অল্পগুণবিশিষ্ট দেবগণকে নমস্কার, যুবা দেবগণকে নমস্কার, বৃদ্ধ দেবগণকে নমস্কার।"

অসীম অপরিমেয় শ্রদ্ধার সহিত তেজঃপুঞ্জ সমস্ত ঋষিগণ দিবারাত্র এই সকল দেবতার পূজা করিয়াছেন। শ্রদ্ধা তাঁহাদিগের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। অতি যত্নে অতি আদরে অতি আগ্রহে তাঁহারা শ্রদ্ধাকে ধারণ ও পোষণ করিতেন।

"শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্য্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ॥"

১০।১৫১।৫

"শ্রদ্ধাকে প্রাতঃকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকে মধ্যাহ্নে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকে সূর্য্যের অস্তগমনকালে আহ্বান করি। হে শ্রদ্ধে, তুমি আমাদিগকে (যজ্ঞ) কর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ কর।"

অমিত অধ্যবসায়, অপরিসীম পরিশ্রম, ও গভীর শ্রদ্ধা সহকারে প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-সায়ংকালে নিত্য উপাসনা দ্বারা, বহুবর্ষবিস্তৃত দিবারাত্রিব্যাপী অজস্রব্যয়সঙ্কুল যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা কি চাহিতেন? কিসের জন্য এত কষ্ট, কিসের জন্য এত সময়ক্ষেপ, কিসের জন্য এত শ্রদ্ধা, কিসের জন্য এত ব্যাকুলতা? অহর্নিশ মন্ত্রী ঋষিগণ

কিসের জন্য কাঁদিতেন, কিসের অভাব পূরণের জন্য যোড়করে আকুলনেত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন ?

"তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি।
স্যাদুত প্ররেচনং॥"

১।৭।১৬

হে মিত্রাবরুণ, তোমাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা যেন ধন ভোগ করিতে পারি ও সঞ্চয় করিতে পারি। আমাদিগের ধন যেন ভোগ এবং সঞ্চয়েরও অধিক হয়।

"মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্যস্য
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে॥" ১।১৮।৩

শক্ররূপী মর্ত্ত্যের হিংসাকারী অভিসম্পাত আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে। এতদর্থে, হে ব্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে রক্ষা কর।

"উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র দেবি
গোমতীরিষঃ॥"
সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা
সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং
বাজৈর্বাজিনীবতি।"

১-৪৮-১৫,১৬

হে উষা, যেহেতু তুমি অদ্য (প্রভাত কালে) উদিত হইয়া অন্তরীক্ষের দ্বারদ্বয় উদ্ঘাটিত করিতেছ, অতএব আমাদিগকে হিংসক-রহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর এবং, হে দেবি, গোযুক্ত অন্ন প্রদান কর। আমাদিগকে প্রভূত, বহুরূপযুক্ত, বহুগোসমন্বিত ধনদ্বারা সম্যকরূপে সিঞ্চিত কর। হে মহনীয় উষা, আমাদিগকে শক্রহিংসাকারী বীর্য্যবতী অন্নসহ যশঃদ্বারা সম্যক্ সিঞ্চিত কর।

"ইন্দ্র শ্রেষ্ঠাণি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং
দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং
বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাং॥"

২।২১।৬

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধনসকল প্রদান কর, দক্ষতার খ্যাতি প্রদান কর, সৌভাগ্য প্রদান কর, ধনসকলের সমৃদ্ধি প্রদান কর, অঙ্গসকলের অরিষ্টি প্রদান কর, বাক্যের শিষ্টতা প্রদান কর এবং দিনসকলের শোভনত্ব প্রদান কর।

"ত্রিবা দিবঃ সবিতর্বার্যাণি দিবেদিব
আ সুব ত্রির্নো অহ্নঃ।
ত্রিধাতু রায় আ সুবা বসূনি ভগ
ত্রাতর্ধিষণে সাতয়ে ধাঃ॥"

৩।৫৬।৬

হে সবিতা, তুমি ভূলোক হইতে বরণীয় ধনসকল প্রতিদিন তিনবার করিয়া প্রেরণ কর। হে ভজনীয় ত্রাতা, তুমি তিনপ্রকার ধন ও গোধন আমাদিগকে দিনের ত্রিভাগে প্রদান কর। হে বাক্, আমরা যেন ধনলাভ করি।

"ওমানমাপো মানুষীরমৃক্তং ধাত তোকায়
তনয়ায় শংযোঃ।
যূয়ং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমা বিশ্বস্য
স্থাতুর্জগতো জনিত্রীঃ॥"

৬।৫০।৭

হে মনুষ্যহিতকারিণী অপ্‌সকল, তোমরা পুত্রপৌত্রাদির জন্য অহিংসিত রক্ষণশীল অন্ন প্রদান কর, উপদ্রবসকলের শান্তি

কর এবং পৃথক্করণোপযোগী পদার্থসকলকে পৃথক কর। কারণ তোমরা সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের জনয়িত্রী অতএব মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভিষক্।

এইরূপে বৈদিক ব্রহ্মবাদিগণ দেবগণের নিকটে ধনৈশ্বর্য্য, অন্ন, গোধন, খ্যাতি, নিরাময় দেহ, শত্রুর নিপাত প্রভৃতি প্রার্থনা করিতেন। ত্রিসন্ধ্যা সবিতৃসকাশে বরণীয় ধন যাচ্ঞা করিতেন। উষঃকালে উষাদেবীর নিকটে বীর্যবতী অন্ন, গৃহ, গো, রত্ন প্রার্থনা করিতেন। তবে কি তাঁহারা অর্থকামলোলুপ বিষয়ী কীটমাত্র ছিলেন? তাঁহাদের বিপুল যাগ যজ্ঞ স্বাধ্যায় তপস্যা কি কেবল ঐহিক সুখপ্রাপ্তির উপায় মাত্র ছিল? সনাতন ব্রহ্মবাণী বেদমাতা সাবিত্রীকে দোহন করিয়া তাঁহারা কি কেবল কতকগুলি গো, অশ্ব, তৈজস, স্বর্ণ, যবব্রীহি সংগ্রহ করিতেন? আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষিত আর্য্যসাধনানভিজ্ঞ কতকগুলি হিন্দুসন্তান বৈদিক ঋষিগণকে এইরূপই অপদার্থ মনে করেন। বেদসংহিতার সর্ব্বত্র এইরূপ প্রার্থনা দেখিয়া, ঋষিগণ গো, অশ্ব পালন করিতেন জানিয়া, অন্ধকার দর্শনে তাঁহারা ব্যাকুল ও আলোক দর্শনে উৎফুল্ল হইতেন বুঝিয়া, এই সকল সমালোচকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, ঋষিগণ পশুপালক সাধারণ কবিশ্রেণীর লোক অর্থাৎ রাখাল কবি ছিলেন। পাছে দস্যুগণ তাঁহাদের ধনাপহরণ করে এইজন্য তাঁহারা অহর্নিশ ব্যাকুল থাকিতেন ও ছড়া কাটিয়া কাটিয়া বিরহী কবির ন্যায় সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণ আকাশ পৃথিবীর নিকট কাতরকণ্ঠে আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেন, অন্ধকারে শিহরিয়া উঠিতেন, আলোক দেখিলে আহ্লাদে ফাটিয়া পড়িতেন। বেদাধ্যায়ী ভক্তিমান্ সত্যানুসন্ধী আর্য্যসন্তান কিন্তু বেদসংহিতায় ঋষিগণের ভিন্ন চিত্র দেখিয়া থাকেন। তিনি দেখেন ঋষিগণ "দেবগণমধ্যে প্রকাশবান্" (স্বরণং—১।১৮।১); তিনি দেখেন যজ্ঞশেষে তেজঃপুঞ্জ ঋষি বলিতেছেন, "হে মরণরহিত অগ্নি, এইবার মর্ত্ত্যগণ তোমার এবং আমাদিগের উভয়ের প্রশংসাসূচক বাক্য বলুক" (অথা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্যানাং। মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ॥ ১।২৬।৯); তিনি দেখেন ইন্দ্র যখন দস্যুর সহিত যুদ্ধে গমন করিতেছেন তখন "সর্ব্বপ্রথম অথর্বা ঋষি যজ্ঞদ্বারা তাঁহার পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন" (যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে—১।৮৩।৫), "দধ্যঙ্ ঋষির অস্থিসকলদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র অপরাজেয় হইয়া নবনবতি সংখ্যক বৃত্র বধ করিয়াছেন" (ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্ব্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীনব॥ ১।৮৪।১৩); তিনি দেখেন বীর্য্যবান্ ঋষি বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র, আমি যজ্ঞদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে পূত করি" (উভে পুনামি রোদসী ঋতেন—১।১৩৩।১)।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ঋষিগণ এতই উচ্চদরের লোক ছিলেন, তবে তাঁহারা কেন অন্ন বা ধনৈশ্বর্য্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ, অতি সরল। এক কথায়, বেদ সাধনশাস্ত্র—বেদে যাহা কিছু আছে তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধকের সাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্নও তাহাই। অন্নের প্রয়োজন ঋষি নিজেই অন্নকে দেবরূপে কল্পনা করিয়া গাহিয়াছেন।

পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্ম্মাণং তবিষীং ।
যস্য ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্ব্বমর্দয়ৎ ॥১
স্বাদো পিতো মধো পিতো বয়ং ত্বা ববৃমহে ।
অস্মাকমবিতা ভব ॥ ২
উপ নঃ পিতবা চর শিবঃ শিবাভিরূতিভিঃ ।
ময়োভুরদ্বিষেণ্যঃ সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ ॥৩
তব ত্যে পিতো রসা রজাংস্যনু বিষ্ঠিতাঃ ।
দিবি বাতা ইব শ্রিতাঃ ॥৪
তব ত্যে পিতো দদতস্তব স্বাদিষ্ঠ তে পিতো ।
প্র স্ব দ্মানো রসানাং তুবিগ্রীবা ইবেরতে ॥৫
ত্বে পিতো মহানাং দেবানাং মনো হিতং ।
অকারি চারু কেতুনা তবাহিমবসাবধীৎ ॥৬
যদদো পিতো অজগন্বিবস্ব পর্ব্বতানাং ।
অত্রা চিন্নো মধো পিতোঽরং ভক্ষায় গম্যাঃ ॥৭
যদপামোষধীনাং পরিশমারিশামহে ।
বাতাপে পীব ইদ্ভব ॥৮
যত্তে সোম গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে ।
বাতাপে পীব ইদ্ভব ॥ ৯
করম্ভ ওষধে ভব পীবো বৃক্ক উদারথিঃ ।
বাতপে পীব ইদ্ভব ॥১০
তং ত্বা বয়ং পিতো বচোভির্গাবো ন হব্যা সুষূদিম ।
দেবেভ্যস্ত্বা সধমাদমস্মভ্যং ত্বা সধমাদং ॥ ১১"
১।১৮৭

আমি (অগস্ত্য) মহৎ লোকের ধারক, বলাত্মক, পালক অন্নকে স্তব করি, যাহার বলে ত্রিত বৃত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বধ করিয়াছিলেন। ১। হে স্বাদু পালক, হে মাধুর্য্যোপেত পানসাধনান্ন, আমরা তোমাকে সেবা করি ; আমাদিগের রক্ষক হও। ২। হে পালক অন্ন, যেহেতু তুমি মঙ্গল অতএব মঙ্গলযুক্ত রক্ষণ সকলের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন কর ; এবং (আসিয়া) সুখের ভাবয়িতা, অদ্বেষ্যরস, (প্রিয়রস ইত্যর্থ), সখার ন্যায় প্রিয়কারী, সুখকর, দ্বয়রহিত (বিপরীতগুণরহিত ইত্যর্থ) হও। ৩। হে পালক অন্ন, তোমার এই সকল রস লোকসকলে অনুকূলভাবে বিবিধরূপে স্থিত, যেমন দ্যুলোকে আশ্রিত বায়ুসকল স্থিত। ৪। হে পালক অন্ন, ত্বদর্থী নরগণ (তোমার ভোক্তা হয়) ; হে পালক অন্ন, তোমার অনুগ্রহে তাহারা তোমাকে দান করিতে পারে ; তোমার রসসকলের আস্বাদানকারিগণ দৃঢ়স্কন্ধ হইয়া উত্তমরূপে বিচরণ করে ।৫। হে পালক অন্ন, পূজ্য দেবগণের মন তোমাতে নিহিত আছে ; তোমার সমীচিন প্রজ্ঞান-লক্ষণ রক্ষণ দ্বারা ইন্দ্র অহিকে বধ করিয়াছিলেন ।৬। হে পালক অন্ন, প্রকাশবান্ বা ধনবান্ পর্ব্বত সকলের, অর্থাৎ মেঘ সকলের, উদক যখন তোমার নিকটে গমন করে, এই সময়ে, হে মাধুর্য্যোপেত অন্ন, তুমি আমাদিগের সম্পূর্ণ ভক্ষণের জন্য সন্নিহিত হও ।৭। যদ্দ্বারা অপ্ সকলের ওষধিসকলের সম্বন্ধীয় সর্ব্বসুখকর অন্ন আস্বাদন করি, হে বাতাপি অর্থাৎ প্রাণধারী শরীর, সেই অন্নোদকসার দ্বারা আপ্যায়িত হও। ৮। হে সোম, গো-বিকারক্ষীরাত্মাশ্রয়ভূত ও যববিকারাশ্রয়ভূত তোমার যে অংশ আমরা ভজনা করি তদ্দ্বারা, হে বাতাপি, আপ্যায়িত হও। ৯। হে করম্ভাদিরূপ শক্তুপিণ্ডাত্মক ওষধি, তুমি স্থৌল্যযুক্ত, ব্যাধি বর্জ্জয়িতা, উর্দ্ধগামী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উদ্দীপয়িতা হও ; হে

বাতাপি তুমি আপ্যায়িত হও।১০। হে পালক অন্ন, সেই (সোমরূপী) তোমাকে আমরা গাভী যেরূপ হবি উৎপাদন করে সেইরূপ স্তুতিদ্বারা সোমরস ক্ষারিত করাইব, যে তুমি দেবগণের সহিত মাদয়িতা হও এবং আমাদিগের সহিত মাদয়িতা হও।১১।

ঋষির নিকটে অন্ন ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার উপাদানমাত্র ছিল না তাঁহার চিত্তে তিনি অন্নের খাদকরূপে প্রতিভাত না হইয়া অন্ন তাঁহার পালকরূপে প্রতিভাত হইত। জীব অন্নহীন হইলে তাহার শরীর নিস্তেজ, মানসিক শক্তি ক্ষীণ, চিত্ত দুর্ব্বল ও বুদ্ধি তমঃদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। ক্ষুধাক্লিষ্ট হীনতেজ ব্যক্তির দ্বারা দুঃসাধ্য সাধনা ত দূরের কথা সামান্য কর্ম্ম পর্য্যন্ত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। উপনিষদের পাঠক জানেন কিরূপে গুরু শিষ্যকে উপবাসী থাকিতে বলিয়া অন্নের মহত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬ অধ্যায়)। সাধকের সাধনার সম্বল শরীর,মন,প্রাণ,বুদ্ধি সমস্তই অন্নের দ্বারা পুষ্ট ও অন্নাভাবে ক্ষীণ হয়। এই জন্য সাধককে সর্ব্বাগ্রে গোধনাদি ও ব্রীহিযবাদি সংগ্রহ করিতে হয়। "এষোঽণুরাত্মা চেতনা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩৫)"—যে শরীরে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পঞ্চরূপে সম্যক্ প্রবিষ্ট সেই শরীরেই এই সূক্ষ্ম আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা বেদিতব্য। আত্মসাক্ষাৎকারের আশ্রয়ভূত বলিয়াই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন,হে প্রাণধারী শরীর, তুমি অন্নোদকের সার দ্বারা আপ্যায়িত হও। সূক্ষ্মরূপে অন্ন সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবের পোষণার্থ ব্যাপ্ত; সোমরূপে অন্ন ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক পালন করিতেছেন। "আদিত্যো হবৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং,যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ,তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।" (প্রশ্নোপনিষৎ ৫)—আদিত্যই প্রাণ, রয়ি অর্থাৎ অন্নই চন্দ্রমা, মূর্ত্ত (স্থূল) এবং অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) যে সকল পদার্থ সমস্তই অন্ন, অতএব মূর্ত্তিই অন্ন। এই জন্যই ঋষি বলিয়াছেন গব্যাদি ও যবব্রীহ্যাদি সোমের অংশ, যদ্দ্বারা ভূলোকবাসী জীবের প্রাণ ও শরীর আপ্যায়িত হয়। ইহার অপরাংশ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণ পুষ্ট হন। অন্নরূপ সোমদ্বারা রক্ষিত হইয়াই দেবগণ অন্ধকার, পাপরূপী বৃত্র, অহি ও দৈত্য সকলকে নিধন করিয়া বিশ্বের পালন ও সাধকের সহায়তা করিতে সমর্থ হন। বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রার্থনা করিলে বরুণদেব তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। তপস্যা করিয়া ভৃগু সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলেন যে অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন হইতেই পরিদৃশ্যমান ভূতসকল জন্মে, জন্মিয়া অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং অন্নেতেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে (অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নে জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তীতি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩২)। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রথম সোপান অন্নকে সর্ব্বভূতের জনক, সর্ব্বভূতের পালক ও সর্ব্বভূতের অন্ত বলিয়া জানা। বৈদিক ঋষি ইহা জানিতেন বলিয়াই নিজের ও স্বজনবর্গের জন্য অন্ন প্রার্থনা করিতেন ও দেবগণকে অন্ন নিবেদন করিতেন।

অন্নের প্রয়োজন প্রাণরক্ষার্থ। সাধকের নিকট প্রাণ বড় প্রিয়, বড় আদরের বস্তু, কেননা প্রাণ না থাকিলে সাধনা হয় না, সাধনা না হইলে ভগবৎসান্নিধ্যলাভ হয় না। বৈদিক ঋষি যেমন অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন তেমনি প্রাণ অর্থাৎ দীর্ঘজীবনও প্রার্থনা করিয়াছে।

"অস্মে প্রযংধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো
বিশ্ববারস্য ভূরেঃ।
অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা অস্মে
বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্॥"
— ৩।৩৬।১০

হে মঘবা (ধনবান্) সোমভোগী ইন্দ্র, আমাদিগকে বিশ্ববরণীয় বহু ধন প্রদান কর। আমাদিগকে শতবর্ষ পরমায়ু প্রদান কর। হে শোভনহনু ইন্দ্র, আমাদিগকে বহু পুত্র প্রদান কর।

'ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা
অসুর যে চ মর্তাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষেঽশ্যামায়ুংষি
সুধিতানি পূর্বা॥" ২—২৭-১০

হে অসুর বরুণ, তুমি সর্ব্ববিশ্বের, যাহারা দেব ও যাহারা মর্ত্ত, তাহাদিগের রাজা। আমাদিগকে শতবর্ষ দেখিতে দাও। আমরা যেন দেবগণের দ্বারা মঙ্গলময় দীর্ঘজীবন লাভ করি।* (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

বর্ণ বা রঙ্

কোন কোন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক আমাদের ছেলেদিগকে বলিয়া থাকেন যে তোমরা রঙ্ কাণা। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই চোখের দোষে বিবিধ বর্ণের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে না। যাহারা রঙ্ লইয়া ব্যবসা করে না, কিংবা যাহারা চিত্র বা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ পরিলক্ষণ করিবার সুবিধা পায় না, তাহারা এক একটি রঙ্গের যত প্রকার প্রকৃতিভেদ আছে, তাহা ঠিক লক্ষ্য করিয়া উঠিতে না পারিলেও, তাহারা রঙ্ কাণা নহে। সম্বলপুরের সাধারণ চাষারা তাহাদের সাধারণ বুদ্ধিতে রঙ্গের দুইটিমাত্র শ্রেণী বা বিভাগ করিয়া থাকে; উজ্জ্বল বর্ণমাত্রেই তাহাদের কাছে গোরা বা গুরিয়া; এবং অনুজ্জ্বল বর্ণমাত্রেই কাল বা কালিয়া। এ স্থলেও এই চাষারা যে ঠিক্ রঙ্ কাণা নহে, তাহা অল্প পরীক্ষাতেই বুঝিতে পারা যায়। সাদা রঙ্গের এবং লাল, কপিশ প্রভৃতি রঙ্গের গোরুকে সাধারণতঃ গুরিয়া বলিলেও যখন রঙ্ বিশেষের জন্য একটি গোরুর রঙ্কে ডুমুরি গুরিয়া বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে পাকা ডুমুরের রঙ্গের মত রঙ্ অন্য রঙ্ হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইয়া থাকে। আমাদের দেশের রঙ্রেজেরা রঙ্গের অতি সাধারণ সাধারণ প্রভেদ চাৎকমর

* পুস্তকের নাম উল্লেখ না করিয়া যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠক ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া জানিবেন।

লক্ষ্য করিতে পারে ; এবং নামের অভাবে অনেক পরিচিত পদার্থের রঙ্গের নাম দিয়া রঙ্গ্ বুঝাইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কালে যখন চিত্রাদির জন্য উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তেমন মনোযোগ করিতেন না, তখন বর্ণবৈচিত্র্যজ্ঞাপক বিভিন্ন শব্দ সৃষ্ট না হইবারই কথা। তথাপি অতি প্রাচীন বৈদিকযুগে যে সকল রঙ্গের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের উল্লেখ হইতে আমাদের প্রাচীন চমৎকার প্রমাণ পাই। সাধারণতঃ শুক্ল বা শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ বলিলে সাদা বা উজ্জ্বল বর্ণ এবং কাল বা মলিন বর্ণ বুঝাইত। কিন্তু দুধের রঙ্গ্‌কে যেখানে শ্বেত বলা হইয়াছে, সেখানে ঐ বর্ণটি কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। আবার শুক্ল শব্দ জ্যোৎস্নায় এবং তাহার আলোক প্রভৃতিতে যখন প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন শ্বেত শব্দ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই। এই শুক্ল কথাটি হইতেই শুক্র শব্দের উৎপত্তি। অগ্নিকে কুত্রাপি শুক্ল বলা হয় নাই,—শ্বেতও বলা হয় নাই, উহার লোহিত বর্ণ সর্ব্বত্র স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) শ্বেত—ঠিক্ white বা সাদা অর্থে ব্যবহৃত ; gray রঙ্গ্‌ও শ্বেত সংজ্ঞায় সূচিত হইত।

(২) শুক্ল—বলিলে অগ্নির রঙ্গ্ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তারার আলোক ও জ্যোৎস্না প্রভৃতি বর্ণ সূচিত হইত। পাকা দাড়ির রঙ্গ্‌কে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বৈদিক ভাষায় শুক্ল বলা হইয়াছে। শুক্ল বৈদিক ভাষায় ঠিক রূপার মত বর্ণ।

(৩) শুভ্র—কথাটি বৈদিক ভাষায় শুভ্ আছে ; শুভ্র নাই। শুভ্ হইল সৌন্দর্য্য বা উজ্জ্বলতা। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে শুভ্র এবং শুক্ল এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) শ্যাম—শব্দটির ঋগ্বেদে অনুজ্জ্বল শ্বেত অর্থই পাওয়া যায় ; শতপথ ব্রাহ্মণেও (৫ম—১ম, ৩, ৭) শ্যাম শব্দের এই অর্থই সূচিত হয়, পরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃত 'পত্রশ্যাম' প্রভৃতি কথায় শ্যাম বলিতে যে বর্ণ সূচিত হয়, সে বর্ণের কথা বৈদিক যুগে সূচিত হইত না। বরং মানুষের গায়ের যে সাদা রঙ্গ্, তাহাই যেন সর্ব্বত্র শ্যাম অর্থে ব্যবহৃত মনে হয়। কোন দেশের মানুষের গায়ের বর্ণই যে ঠিক শুক্ল বা শ্বেত নহে, তাহা আমরা জানি। আমার বিচারে আমরা যে রঙ্গ কে ফর্সা রঙ্গ্ বলিয়া বুঝি, অর্থাৎ যাহাকে fair রঙ্গ বলি, বা ইংরেজেরা যাহাকে skin colour বলে, শ্যামবর্ণ যেন ঠিক্ তাহাই। 'পত্রশ্যাম' প্রভৃতি কথায় অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে অন্য অর্থ সূচিত হইলেও বৈদিক প্রাচীন প্রবাদ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল, মনে হয় না। কারণ অলঙ্কারশাস্ত্রে শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা রমণীর গায়ের রঙ্গ্ তপ্ত বা কাঞ্চনের বর্ণের মত বলিয়া সর্ব্বত্রই বর্ণিত হইয়াছে। উহাই যে আমাদের দেশের খুব ভাল ফর্সা রঙ্গের তুলনা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারি।

সাদা রঙ্গের চারিটি নামের কথা বলিয়াছি, এবারে পীত, পাণ্ডু বা yellow রঙ্গের কথা বলিব। এই রঙ্গের সাধারণ নাম হইল—হরি, হরিৎ, হরিত এবং হরিণ, হরিৎ রঙ্গ্ বলিতে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে সবুজবর্ণ

বুঝাইত; এবং ঐ অর্থই এ দেশে এখন চলিয়াছে। বৈদিক ভাষায় 'হরি' শব্দের অর্থে দেবতার ঘোড়া ছাড়া এবং ঐ বর্ণ ছাড়া অন্য অর্থ পাওয়া যায় না; বেদের কোন ঠাকুরই "হরি" নহেন। অনেকে "হরি ওং" উচ্চারণ করিয়া, বৈদিক ভাষা উচ্চারণ করিতেছেন, ভ্রান্তভাবে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। আকাশে সূর্য্য-দেবের ঘোড়া যে সময়ে ঠিক্ অরুণবর্ণ বিশিষ্ট নয়, খাঁটি orange বা কমলা বর্ণযুক্তও নয়; ববং স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট, তখনই হরিকে চিনিতে পারা যাইত বলিয়া উহার রঙ্গে রঙ্গের নাম। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (২য়—৩, ৬) প্রয়োগের পূর্ব্বে হরিৎবর্ণ পীত ও পাণ্ডু অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই হরিৎ বর্ণ হইতেই বৈদিক হরিদ্র এবং আমাদের হরিদ্রা বা হলুদ নাম হইয়াছে।

লাল রঙ্গের তিনটি নাম পাওয়া যায়, যথা—(১) রুধির, (২) লোহিত বা রোহিত এবং (৩) অরুণ। রুধিরকে scarlet এবং sanguine বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। লোহিত বা রোহিত বর্ণকেও সিঁদুরের রঙ্‌ (vermilion) বলিয়া চিনিতে গোল হয় না; কিন্তু অরুণকে কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ruddy বলিয়া তর্জ্জমা করিয়াছেন। আমার কিন্তু অরুণের উদয়কালের বর্ণ দেখিয়া উহাকে orange বা কমলাবর্ণ বলিয়া মনে হয়, বৃহদারণ্যক উপনিষদের "মাহারজন"কে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা a garment of saffron colour বলিয়াছেন। আমি উহার যথার্থ অর্থ ধরিতে না পারিয়া কিছু লিখিলাম না। জাফরাণের রঙ্‌ একটু 'চড়া' রকমের হল্‌দে; কিন্তু ঐ রঙ্‌টিকে কিয়ৎ পরিমাণে chocolate বলিয়া মনে হইতেছে। আমার বন্ধু যোগেশচন্দ্র রায় ইহার একটা ফয়সালা করিতে পারেন।

নীল বর্ণটি সেকালে একালে এক ভাবই প্রকাশ করিতেছে; তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি স্থানের নীল শব্দের উল্লেখ (৮ম—৬, ১) যখনকৌষিতকি উপনিষদে (৪—১৯) কৃষ্ণ বলিয়া পরিবর্ত্তিত দেখা যায়, তখন পরবর্ত্তী লেখকের বর্ণ বিচারেব দোষ দিতে পারি; কিন্তু নীলের ভিন্নতা অস্বীকার করিতে পারি না। এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দোহাই দেওয়া চলে (ঋ ৮ম—১৯, ৩১) এই খাঁটি blue বর্ণ স্থানে স্থানে green অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়; কিন্তু black বা কৃষ্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই।

কৃষ্ণ এবং শ্যেনী শব্দ সম্পূর্ণরূপে dark এবং black অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুজ্জ্বল বুঝাইতে হইলেও এই শব্দ দুইটি ছাড়া অন্য কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

যাহাকে বিদেশের ভাষায় brown বলে, তাহা বুঝাইতেদুইটি শব্দ পাওয়া যায়, যথা—(১) বভ্রু এবং (২) পিশঙ্গ (৩) পিশঙ্গ রঙ্‌টি ফুলের পীতপ্রায় রজঃ বা pollernএর রঙ্‌; কিন্তু বভ্রু ঠিক পোড়া ইঁটের রঙ্‌। পিঙ্গল বলিতে যে রঙ্‌ বুঝায়, তাহা brown এবং yellow মিশ্রিত। Geldner এই রঙ্‌কে tawny বলিয়াছেন। (৪) কপিশ বর্ণ কি, তাহা বুঝাইতে হইলে উহার বৃৎপত্তি বলিলেই চলিবে। কপি (বানর)

ল হইতে কপিল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কপির গায়ের এই রঙ্গ্ বক্র প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া যাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহারা আদপেই রঙ্গ্‌কাণা ছিল না।

কল্মাষ অর্থ ছিল spotted বা দাগ দ্বারা চিত্রিত; এবং শিল্প বা কর্ব্বুর বলিলে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিবিধ বর্ণে চিত্রিত বা "পাথ্‌রা" বুঝাইত।

শুক্ল বর্ণ যে সপ্তবর্ণের সমষ্টি, তাহার মধ্যে (১) রুধির এবং রোহিত বা লোহিত সাধারণ রক্তবর্ণের নামে পাইতেছি; (২) অরুণ বর্ণকেও সম্ভবতঃ কমলাবর্ণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে; (৩) হরিৎ অর্থে পীত বা yellow পাইতেছি! (৪) শ্যেনী indigo অর্থে পাই; (৫) নীল blue অর্থে উল্লিখিত দেখিতেছি। (৬) সবুজ বা green পররবর্ত্তী সময়ে নীলের অন্তর্ভূক্ত না হইয়া যখন হরিৎ নামে আখ্যাত হইয়াছিল, তখন হরিৎ অর্থে পীত এবং পাণ্ডু বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছিল; কিন্তু কুত্রাপি violet বর্ণের সহিত পরিচয় হয় নাই। রক্তবর্ণের দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর নাম পাই এবং brown নামক মিশ্রিত বর্ণের অনেক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নাম পাই; সাধারণ তামস অবস্থারও কৃষ্ণ নাম পাওয়া যায়; কিন্তু ভায়লেট বর্ণ কি নামে পরিচিত হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই বর্ণটির বিশিষ্টতা কি কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চন্দ্রনাথ

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আমি ভবুয়া হইতে চট্টগ্রাম বদলি হই। তাহার পরের বৎসর শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে "সীতাকুণ্ডের" মেলার ভার প্রাপ্ত হই। এইবারই আমি প্রথম "সীতাকুণ্ড" দেখিলাম। বিদেশীয়েরা ইহাকে "চন্দ্রনাথ তীর্থ" বলেন। চট্টগ্রাম জেলাকে উত্তর দক্ষিণে দ্বিখণ্ড করিয়া যে পর্ব্বতমালা নানা বিচিত্র শৃঙ্গে ও উপশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছে, উহাই 'চন্দ্রনাথ' গিরিশ্রেণী। উহার উত্তরে হিমালয়-সংসৃষ্ট 'আসাম' পর্ব্বতমালা হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় শৈলশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর একটি উচ্চ শৃঙ্গ "চন্দ্রশেখর" বলিয়া পরিচিত। এই শৃঙ্গোপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দির। তাহাতে যে শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহার নাম 'চন্দ্রনাথ'। মন্দিরটি বহুদূর হইতে অশ্বত্থ পাদপ ছায়ায় উপবিষ্ট একটি কপোতের মত বোধ হয়। চন্দ্রশেখরের পদতলে 'ব্যাসকুণ্ড' ক্রোড়দেশে 'শম্ভুনাথ' বা 'স্বয়ম্ভুনাথের' মন্দির। শম্ভুনাথও শিবলিঙ্গ। উহা পর্ব্বতের সঙ্গে একাঙ্গ। এজন্য ইহার নাম 'স্বয়ম্ভু'। উহা স্বতন্ত্র স্থাপিত শিবলিঙ্গ নহে। এই লিঙ্গের চতুর্দ্দিকের প্রস্তর কাটিয়া আমার পিতামহ ৺ত্রিপুরাশরণ রায় 'অষ্টমূর্ত্তি' অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী স্বাভাবিক শিল্পী (born artist) ছিলেন। তিনি কখনও গৃহের বাহির হন নাই, কাহারও কাছে কখনও

শিক্ষা করেন নাই, অথচ এমন শিল্পবিদ্যা নাই যাহাতে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। সেই শিল্পশক্তি আমার পিতৃদেবে কাব্যপ্রিয়তা ও কবিতাশক্তি সঞ্চারিত করে। আর সেই কবিতাশক্তি হইতেই আমি কবি। যাঁহারা এই অষ্টমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার পিতামহের শিল্প-প্রতিভা বুঝিতে পারিবেন। চন্দ্রশেখরের বক্ষঃস্থলে 'বিরূপাক্ষের' মন্দির। 'বিরূপাক্ষ' স্থাপিত শিবলিঙ্গ। তাহার পর শিখরের সানুদেশে চন্দ্রনাথের মন্দির। তুমি যতই পর্ব্বতারোহণ করিবে ততই তোমার চক্ষে চারিদিকে ইন্দ্রজাল সৃষ্টিবৎ নৈসর্গিক শোভা ভাসিয়া উঠিবে, এবং চন্দ্রশেখরের সানুদেশস্থ মন্দির ও অশ্বত্থ ছায়ায় দাঁড়াইয়া তুমি যে দৃশ্য দেখিবে তাহার তুলনা ভারতবর্ষে নাই! তোমার উত্তরে দক্ষিণে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতমালা তরঙ্গ খেলিয়া যতদুর দেখা যায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার অনন্ত বৃক্ষলতাবৃত শ্যামল শোভায় নয়নে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে কত ফুল ফুটিয়াছে! কতরূপ পাখী উড়িতেছে, বসিতেছে এবং কলকণ্ঠে কাননের নির্জ্জনতার সঙ্গীতলহরী তুলিতেছে! হরিণের কাননভেদী কণ্ঠধ্বনি বনকুক্কুটের মধুর বংশীধ্বনি, শ্রবণে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। তোমার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অনন্ত গ্রামব্যূহ উপবনের মত স্বর্ণপ্রসূ শস্যক্ষেত্র সুরঞ্জিত কোমল গালিচার মত, এবং গো, ছাগ, মহিষাদি ক্ষুদ্র পুষ্পের মত, এবং নদ নদী রজত সর্পের মত শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে দীর্ঘায়ত শস্য-শ্যামল সমতল ক্ষেত্রের পর—মরি! মরি! কি দৃশ্য! অনন্ত পয়োধির অনন্ত লহরীমালা তটাঘাতি কর্দ্দম-ধবল সলিলরাশি ক্রমে কেমন নীল, নীলতর, নীলতম হইয়া আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখরের তিন মাইল দক্ষিণে "বাড়বকুণ্ডের" জল সহিত অগ্নি ক্রীড়া করিতেছে। তাহারও তিন মাইল দক্ষিণে নিবিড় কানন মধ্যে "কুমারীকুণ্ড"। সমস্ত কুণ্ডই পার্ব্বত্য নির্ঝর। আগুন দেখিলেই কুণ্ডসলিল জ্বলিয়া উঠে। চন্দ্রনাথের উত্তরে 'লবণাক্ষ' কুণ্ড। এখানে লবণ, মধুর ও উত্তপ্ত সলিলবাহী বহু নির্ঝর। তাহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র গিরি প্রপাত 'সহস্রধারা'। কি নির্ম্মল, সুশীতল সলিল সহস্রধারায় শত হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে পড়িতেছে! এই লবণাক্ষের 'গুরুধ্বনি' তীর্থে, ও চন্দ্রশেখর পাদ-তলে জ্যোতির্ম্ময় তীর্থে, প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া অগ্নিশিখা কি কৌতুকক্রীড়া করিতেছে! এমন সুন্দর ও বিস্ময়কর তীর্থ ভারতে নাই। জগতে আছে কি না জানি না। প্রবাদ এরূপ যে "রামাওত" সম্প্রদায়ের 'গিরি' সন্ন্যাসীরা আগে এই তীর্থের মোহন্ত ছিলেন। 'রামসীতা' নামক এক কুণ্ডের লুপ্ত চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু 'বন' সম্প্রদায় বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া ইহাকে শৈব তীর্থ করিয়াছেন। 'বারাহীতন্ত্র' চন্দ্রশেখর তীর্থের ভূগোল। ইহার মতে এখানের মূল বিগ্রহ 'চন্দ্রশেখর' পর্ব্বত,—"চন্দ্রশেখরমারুহ্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। চন্দ্রশেখর,—ভৈরব। শক্তি—দক্ষিণা কালী। ত্রিপুরাধিপতি এই কালীকে তাঁহার রাজধানী উদয়পুরে লইয়া যান। তিনি এখনও উদয়পুরে আছেন। প্রবাদ উক্ত ত্রিপুরাপতি শম্ভুনাথকেও লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিগ্রহ পর্ব্বতের অঙ্গমাত্র বলিয়া স্থানান্তর করিতে পারেন নাই। *

৺ নবীনচন্দ্র সেন।

---

* স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের "আমার জীবনী" ৫ম খণ্ডে ইহা ছাপা হইতেছে। এবং প্রকাশক মহাশয়ের তৎপূর্ব্বে সঙ্কলয়িতার বঙ্গদর্শনে বাহির হইল। বঃ সঃ

অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মিলন

চট্টগ্রামের সাহিত্যসম্মিলন অক্ষয়চন্দ্রকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া অতি ভাল কাজই করিয়াছেন। আজ অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্য-জগতে একটা পুণ্যস্মৃতির মতন হইয়া পড়িয়াছেন বটে, আধুনিক বাঙালী পাঠকেরা বা বাংলা লেখকেরা প্রত্যক্ষভাবে অক্ষয়-চন্দ্রের প্রভাব যে অনুভব করিয়া থাকেন, এমন বলা যায় না। কিন্তু ইহা এই জগতেরই চিরন্তন বিধান। পুরাতন সর্ব্বত্রই ক্রমে চলিয়া যায়, তার স্থলে নূতন আসিয়া অভিষিক্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া, প্রকৃত পক্ষে পুরাতনের মর্য্যাদা কোনও মতেই যে কমিয়া যায়, তাহাও নহে। নূতন পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু সমাজের প্রাণের মূলে, ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে সাক্ষী চৈতন্য বিরাজিত আছে, সে জানে পুরাতনের পুরাতত্ত্বকে আত্মসাৎ করিয়াই নূতনের যাবতীয় শক্তি-সাধ্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই জন্যই ইতিহাস সর্ব্বদা সকল স্থানেই পুরাতনের সমধিক পক্ষপাতী হয়। সম্যকদর্শী সুধীগণ, এই কারণেই, সর্ব্বদা প্রাচীনের প্রতি ভক্ত্যবনত হইয়া থাকেন। চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনী অক্ষয়চন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়া এই সম্যক দর্শন ও এই ভক্তিপ্রবণতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাংলা-সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান কোথায় স্থায়িত্ব কতটুকু হইবে, বলা সহজ নহে। অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যে কোনও নূতন যুগের প্রবর্তন [illegible] নাই। তাঁর অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার কিম্বা অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতার যে কোনও দাবী আছে, এমনও বলা অসম্ভব। কিন্তু যেমন চূড়াতেই মন্দির নির্ম্মিত হয় না, সেইরূপ কেবল অলোকসামান্য প্রতিভা বা অনন্যসাধারণ চিন্তাশক্তির দ্বারাই কোনও সাহিত্য বা সমাজ-জীবনও গড়িয়া উঠে না। বহু বস্তুর সাহচর্য্যে, বহু শক্তির সমবায়ে, বহু গুণের সম্মিলনে, দুনিয়ার যত কিছু ভাল জিনিষ সকলই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ ছোট বড় বহু সাহিত্যিকের সমবেত চেষ্টা ও শক্তির দ্বারাই সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি সাধিত হয়। যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ একজনই হয়েন। কিন্তু তাঁর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ থাকেন। এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গকে লইয়াই তিনি তাঁর যোগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা একান্তই অঙ্গাঙ্গী, কোনও মতেই আকস্মিক নহে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তিনি বাংলা ভাষাতে, বাঙালীর চিন্তাতে ও ভাবেতে, আদর্শে ও চরিত্রে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রেরণায় আজ পর্য্যন্ত বাংলার হিন্দুসমাজ আপনার নিয়তি-পথে চলিতেছে। এরূপ শক্তি-সঞ্চার রাজা রামমোহনের পরে, এক কেশবচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ করেন নাই। এ সকল ক্ষেত্রে তুলনায় সমালোচনা করা সর্ব্বদা সঙ্গত নহে। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দু'জনার মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ প্রশ্ন তোলাই অন্যায়। বাঙালী দু'জনার

নিকটেই সমভাবে ঋণী। ইহাঁরা মূলে একে অন্যকেই সাহায্য করিয়াছেন। পরস্পরে পরস্পরের আদর্শ ও প্রেরণাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমনই বা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কি কেশবচন্দ্র কি বঙ্কিমচন্দ্র দুই মহাপুরুষের কেহই আপন আপন সাঙ্গোপাঙ্গকে ছাড়িয়া এ কাজটী করিতে পারিতেন না। প্রতাপচন্দ্র, গৌর-গোবিন্দ, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, প্রভৃতিকে একদিকে ও এক সময়ে কেশবচন্দ্র যেমন আপনার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রেরণার দ্বারা ফুটাইয়াছিলেন, ইহাঁরাও সেইরূপ আপন আপন সাধনসম্পত্তি দিয়া কেশব-চন্দ্রের প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। এ জগতে একাকিত্বের মধ্যে মৃত্যুর অবসাদই কেবল পাওয়া যায়, জীবনের প্রেরণা মিলে না। যেমন কেশবচন্দ্র আপনার সাঙ্গোপাঙ্গগণের গুণেই এত বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ, আধুনিক বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে, আপনার সহচর ও সহযোগিগণের শক্তি ও সাধনাকে আশ্রয় ও আত্মসাৎ করিয়াই এমন অনন্য-সাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেন। যে সে লোক আপনার উপযোগী লোক বাছিয়া লইয়া, নিজের পার্শ্বে টানিয়া আনিতে পারে না। আর যে সে লোক আপনার পারিপার্শ্বিক শক্তি ও সাধনাকে এমনভাবে আত্মসাৎ করিয়াও লইতে পারে না। এরূপভাবে যাহারা দুর্লক্ষ্য সূত্রে চারিদিক হইতে উপযোগী সহচরদিগকে আপনার কাছে টানিয়া আনিতে পারেন ও টানিয়া আনিয়া তাহাদের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে তাহাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে পারেন, তাঁরাই সত্য সত্য মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজটী যেমন ভাবে ও যতটা পরিমাণে করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করিতে পারেন নাই। বোধ হয় এ আকর্ষণী শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে রাজা রামমোহনেরও ছিল। তিনিও কতকগুলি প্রতিভাশালী লোককে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে' কালের ভিতরকার খবর আমরা তেমন জানি না। রাজার প্রখর প্রতিভার আওতায় পড়িয়া তাঁর সমসাময়িক প্রতিভাশালী বাঙালীগণের প্রতিভা লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশের অবসর পায় নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র না কি কতকটা আমাদেরই সময়ের লোক; তাঁকে দেখিয়াছি, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের সমগ্র ইতিহাসটাই একরূপ আমাদের চক্ষের উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদিগের সকলকে না হউক, অনেককে আমরা স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ ভাবেই দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, আর সেই জন্যই বাংলা দেশটা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভার নিকটে ঋণী, সেইরূপ তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়চন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির নিকটে কতটা পরিমাণে যে ঋণী ছিল, ইহার সংবাদও আমরা কতকটা রাখিয়াছি। আর বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে, অক্ষয়চন্দ্রই যেন, আমার মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিলেন। তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আর

সকলেই অবসর মত সাহিত্যসেবা করিতেন। একমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্যসেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্য এক সময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান সহায় হইয়া উঠেন। সে কালের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের কোন কোন রচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া সন্দেহ হইত। গ্রন্থসমালোচনার ভার অনেকটা বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের উপরেই অর্পিত ছিল। সম্ভবত কোন কোন সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছাপ'ও থাকিত। সেই সব সাহিত্যসমালোচনার মধ্যে তাঁহাদের মত এমন করিয়া প্রখরে মধুরে মিলাইতে এমন করুণ কঠোর কষাঘাত করিতে আর কেহ পারিতেন কি না, সন্দেহ। "মালঞ্চনিবাসিনী মধুসূদন সবকারস্য"কে এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই। আর আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "হেলেনা কাব্যের" ভূমিকায় যে অত্যুক্তি ছিল, তাহার প্রতি বঙ্গদর্শন যে তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিল,—সে বিদ্রূপের মধ্যে কতবিধ রস উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও মনে আছে। ফলতঃ বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন প্রচার বন্ধ হইয়া অবধি বাংলা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন সে ধারা রাখিয়াছিলেন, আর মাঝে মাঝে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সে পুরাতন স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলেন; কিন্তু সচরাচর আজ বাংলাসাহিত্যে সমালোচকের ধর্ম্মাসনে তেমন একটীও যোগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ইংরাজের আদালতে যেমন মোকদ্দমার সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই সরাসরি বিচারের পদ্ধতিটাও অযথা পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে, বাংলাসাহিত্যেও গ্রন্থকারের সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই সরাসরিভাবে সাহিত্যসমালোচনার প্রবৃত্তি এবং রীতিও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এখন অনেকস্থলে সমালোচকের পদে মোসাহেব অধিষ্ঠিত। এ অবস্থায় সাহিত্যের সম্মান রক্ষা বাস্তবিকই দায় হইয়া পড়িয়াছে। আর চারিদিকের এই অবনতি-ধারা প্রত্যক্ষ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র যে কাজটা এক সময়ে এমন অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে করিতেন, তার মূল্য ও মর্য্যাদা যেন আমার চক্ষে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা না থাকিলেও, ভাষার একটা অনন্যসাধারণ শক্তি ও সরলতা আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর এ বস্তুটী তাঁর নিজস্ব। কবিতা-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শব্দসম্পদের পরিচয় দান করিয়াছেন, গদ্য লেখাতে অক্ষয়চন্দ্র সে সম্পদেরই প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। সুললিত, সহজবোধ্য, বিবিধ রসোদ্দীপক শব্দধারার সৃষ্টি-কুশলতায় বাংলা লেখকদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের নকলনবিশ অনেক হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও হয়েন নাই, সকল সময়ে যে অক্ষয়চন্দ্রের শব্দ প্রবাহ ঠিক সার্থক হয় তাহা নাও বা বলা যাইতে পারে। সে

ধর্ম্ম রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও যে নাই, এমন কথাই কি বলা যায়? কিন্তু শব্দের যে একটা নিজস্ব মোহিনী প্রভাব আছে, সুযোজিত-ধ্বনিধারার যে একটা মাদকতা-সঞ্চারিণী শক্তি আছে, এও তো সত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই, রসাত্মক বাক্য যোজনা করিতে যাইয়া, স্বল্পবিস্তর পরিমাণে এই মাদকতা-সঞ্চারিণী শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন। এ অধিকার যাঁর নাই, তিনি চিন্তাশীল হইতে পারেন, বহু জ্ঞানের অধীশ্বর হইতে পারেন, বহু তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তাও হইতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক হইতে পারেন না। স্বর্ণকারের ব্যবসায় যেমন টাকা কড়ি লইয়া, সাহিত্যিকের ব্যবসায় সেইরূপ শব্দ লইয়া। যার যে পরিমাণে টাকা কড়ি চালাইবার ক্ষমতা থাকে, সেই যেমন স্বর্ণকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাজনপদ বাচ্য হয়; সেইরূপ যে লেখকের শব্দ-সম্পদ যত বিশাল ও সেই শব্দরাশির যথাযোগ্য যোজনায় নিপুণতা যাঁর যত বেশি, সাহিত্যজগতে তিনি তত শ্রেষ্ঠ—সাহিত্যাচার্য্য উপাধি পাইবার উপযুক্ত। এই হিসাবে অক্ষয়চন্দ্রকে ন্যায়তঃই সাহিত্যাচার্য্য বলিতে পারা যায়। বাংলা গদ্যরচনায় এমন তুবড়ী ফুটাইয়া তুলিতে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।

এ জগতে সকল বস্তুরই উপযোগিতা যত কমিয়া আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে উপকারিতাও ক্রমে কমিয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যরচনার প্রণালীটী আজ হয় ত ঠিক তেমন ভাবে আর উপযোগী নহে। দেশের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। বস্তুজ্ঞান জন্মুক আর নাই জন্মুক, বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষাটা বেশই জাগিয়া উঠিতেছে। লোকচিত্ত এখন শব্দের মোহিনী মায়া কাটাইয়া গভীরতর ভাবে অর্থের অন্বেষণে ছুটিতেছে। ক্রমে এ ভাবটা বাংলা সাহিত্যেও স্বভাবতঃই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য বাংলা গদ্যের আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে বদলাইয়া যাইতেছে। সাহিত্যের শক্তি এককালে ধ্বনিগত ছিল, এখন ক্রমে ক্রমে চিন্তাকে, গবেষণাকে, যুক্তি-বিচারকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে লেখার অন্তরালে চিন্তার জোর আছে, তাহাই এখন শক্তিশালী লেখা বলিয়া গণ্য হয়। কেবল ভাবের, রসের, শব্দের ফোয়ারার উপরে সাহিত্য-সম্পদ ও সাহিত্যিকের প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব নহে। এই কারণে অক্ষয়চন্দ্র যে গদ্যরচনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার মূল্যও আজিকার বাজারে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। আজিকার বাংলা-সাহিত্যে গদ্য-রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগরও বঙ্কিমচন্দ্রের পর অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, কি কালীপ্রসন্ন, ইহাঁরা সকলেই সাহিত্যে মহারথী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা-ভাষায় গদ্য রচনার ক্ষমতাটা যে কত বড়, ইহা রবীন্দ্রনাথ যেমনটা প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাঁদের কেহই তেমনটা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এমন নিরেট গাঁথুনী বাংলা-ভাষার শক্তিতে যে সম্ভব ইহা লোকে

পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমক্ষে অক্ষয়চন্দ্রের পদ্য-সাহিত্যসৃষ্টি আজ অনেকটা মলিন হইয়া পড়িলেও এক সময়ে তিনিও যে বাংলা শব্দকে লইয়া বিচিত্ররসের খেলা খেলিয়াছিলেন, আর সে খেলাতে বাঙ্গালী চকিত, পুলকিত, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সে জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে আজিও অক্ষয়চন্দ্র অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য ভোগ করিতেছেন। তবে তাঁর গদ্যের আদর্শটা যে আজি কালি লোকচক্ষে কতকটা হেয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বস্তুতঃ অক্ষয়চন্দ্রেরও দোষ নহে। দোষ তাঁর অনুকরণকারীদের। ইহাঁদের না ছিল অক্ষয়চন্দ্রের ধারণা, না ছিল তাঁর চিন্তার শক্তি বা রসানুভূতির প্রাপর্য্য,—ছিল কেবল কাণ। তাই তাঁহারা কেবল কাণের জোরে অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যরচনার প্রণালীর অনুকরণ করিতে যাইয়া, তাহার ভিতরকার শক্তি ও সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। অকৃতি অথচ গুরুমর্য্যাদালোলুপ শিষ্যের হাতে পড়িয়া অনেক গুরুরই যেমন দুর্দ্দশা ঘটে, শিষ্যের আতিশয্য দেখিয়া লোকের গুরুর প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, অক্ষয়চন্দ্রের অকৃতি অনুকরণকারীদের হাতে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভারও সেই দশা ঘটিয়াছে। এ উৎপাতের আবির্ভাব না হইলে আজি পর্য্যন্তও বাংলা-সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের পূর্ব্ব স্থান বজায় থাকিত।

অন্যান্য দেশে জ্ঞানালোচনার জন্য বড় বড় সভা-সমিতি আছে। আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল রাষ্ট্রীয় কোলাহল লইয়াই বিব্রত ছিলাম। দেশের অন্যান্য অভাব ও অভিযোগের, ভাব ও কর্ম্মচেষ্টার প্রতি দৃকপাত করিবার অবসর ছিল না। এ বিষয়ে বাংলা দেশে যে পরিমাণ অনবধানতা দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাহা দেখা যায় নাই, বোম্বাইএ বহুকাল হইতে, গ্রীষ্মের প্রাক্কালে, একটা করিয়া বিদ্বজ্জন-সমাগম হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে দেশের মনীষীগণ বিবিধ বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার সহায়তা করিবার চেষ্টা করেন। এ সকল সভাতে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমবেত হইয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করেন, মান্দ্রাজেও কিছুকাল হইতে এই পদ্ধতিটী প্রচলিত হইয়াছে। সেখানেও প্রতিবর্ষে বসন্ত সময়ে, কোনও পর্ব্বাহকে আশ্রয় করিয়া এক একটা বিদ্বজ্জন সমাগম হয়। এবারে এই উপলক্ষে অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের এ সকল সভা কতকটা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ এসোসিয়েষণের ছাঁচে গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করি নাই। কিন্তু বিগত কতিপয় বৎসর হইতে বাংলাসাহিত্য-সম্মিলন সেরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ এই বার্ষিক সম্মিলনটীকে আমাদের নিজেদের সাহিত্য ও সাধনার একটী বিশেষ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এখানে দেশের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ সমবেত হইয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা

করিবেন, চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে, বিজ্ঞানের রাজ্যে, কাব্যের রাজ্যে, মৌলিক-গবেষণায় ও রসসৃষ্টিব্যাপারে, দর্শনে, ইতিহাসে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে, সমস্ত জীবনের ও স্বজাতির সাধনার বিবিধ বিভাগে, বৎসর কাল মধ্যে আমরা কতটা উন্নতিলাভ করিয়াছি, কোন্ দিকে কতটা নূতন চেষ্টা হইয়াছে, কোন্ দিকে কতটা সংশোধন আবশ্যক, এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবেন। এইরূপে ইংরেজ মনীষীসমাজে ব্রিটিশ এসোসিয়েশন যে স্থানটা অধিকার করিয়া আছে, বাংলার সুধীমণ্ডলীমধ্যে আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলন ঠিক সেই স্থানটী অধিকার করুক, এই দিকেই এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটীকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা কেহ কেহ, হয় ত ইতিমধ্যেই, এইভাবে এই সাহিত্য-সম্মিলনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আর যাঁরা এই আদর্শ মনে লইয়া চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণের বিচার-আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁরা সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে যে কিয়ৎপরিমাণে নিরাশ হইবেন না, এমন বলিতে পারা যায় না। অক্ষয়চন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের বঙ্কিম যুগের এক জন প্রধান কর্ম্মী। তাঁর চক্ষের উপরে বাংলায় এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি সাক্ষাৎভাবে এ যুগের জন্ম-কর্ম্ম সকলই অবগত আছেন। আমরা তাঁর নিকটে বিগত চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের ভিতরকার বিকাশের ইতিহাসটী শুনিব, আশা করিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শন প্রথমে বাংলা দেশে ও বাংলাভাষাতে যে নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তোলে, তার পরে ক্রমে সেই ভাব, সেই শক্তি, সেই চিন্তা, পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁর আপনার "নবজীবনে" ও বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচারে" যে আকার ধারণ করে, কেমন করিয়া বঙ্গদর্শনের প্রথম বয়সের বহির্ম্মুখীনতা ক্রমে আপনাকে খুঁজিতে যাইয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়া তুলে, এবং ক্রমে পুনবায় আত্মস্থ হইয়া, নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য লালায়িত হয়, কেমন করিয়া একদিকে "নবজীবন" ও অন্য দিকে "প্রচার" এই প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাস রূপে বাংলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তার পর ক্রমে আজ সেই প্রত্যাবর্ত্তনই পূর্ণতর, গভীরতর, বিশদতর আকারে, সমধিক সত্যোপেত হইয়া, এক বিরাট ও সর্ব্বতোমুখী সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে—বাঙালীর প্রাণপণের এই চল্লিশ বৎসরের এই পবিত্র পুরাণ-গাথা অক্ষয়চন্দ্রের মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হইব, ভাবিয়াছিলাম। এ কথার সঞ্চয়-রূপে, বাংলা-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আজ এক অক্ষয়চন্দ্রই বাঁচিয়া আছেন। এই আশা করিয়া যাঁরা তাঁর চট্টগ্রামের অভিভাষণটী পড়িতে বা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁরা যে হতাশ হইয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কিন্তু এ হতাশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সকলে সকল কাজ করিতে পারে না। বঙ্কিমযুগের সাহিত্য-সমালোচনার কাজ এ বয়সে অক্ষয়চন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। তবে

তিনি একটা কাজ করিতে পারিতেন। কেবল এবারতের দিক দিয়া চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে, ভাল কি মন্দ, উন্নত না অবনত হইয়াছে, এ কথাটা অক্ষয়চন্দ্র যেমন ভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন, তেমনভাবে উপদেশ দিবার শক্তি ও অধিকার বাংলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আর কাহারও বড় বেশী আছে কি না সন্দেহ। এই এবারতে—ইংরাজীতে ইহাকে style বলে,—অক্ষয়চন্দ্র এক সময়ে অসাধারণ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন। আজকাল তো, বলিতে গেলে, দু'চার জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখাতে ভিন্ন এবারত বস্তুটাই বাংলা সাহিত্য হইতে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাসাহিত্যের যে অপকার করিতেছেন সাহিত্য-সম্মিলন হইতে তার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল। আর অক্ষয়চন্দ্রের এ বিষয়ের ব্যবস্থা দিবার যতটা অধিকার আছে, আর কোনও জীবিত সাহিত্যিকের সে অধিকার নাই। অক্ষয়চন্দ্র এ বিষয়ে যে একেবারেই কোনও আলোচনা করেন নাই, তাহাও নহে। কিন্তু আলোচনাটা আরো গভীর, আরো পরিস্ফুট হইলে ভাল হইত।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অভিভাষণে এবারতের বা styleএর একটা দিকমাত্র দেখাইয়াছেন। ভাষা প্রাণময়ী হইবে। দেশের, অর্থাৎ দশের প্রাণবন্ত সংস্পর্শে ভাষা আপনার প্রাণশক্তি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের প্রাণের চাবিটী হাতে লইয়া, সাহিত্যিককে সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কথাটা খুবই সত্য। তোড়ায় বাঁধা ফুলের ক্ষণিক রূপ যতই থাকুক না কেন, প্রাণগত রস যে নাই, ইহা সকলেই জানে। ধার করা কথাও কতকটা এই রূপ। তার রস থাকে না, দুদণ্ড পাঠককে মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু চিরদিনের জন্য স্নিগ্ধ করিবার শক্তি তার থাকে না। ইংরেজ ক্লান্ত হইলে, ক্লিষ্ট হইলে, 'ডিয়ার' 'ডিয়ার' বলিয়া হাই তুলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ডিয়ার কথাটা খুবই মিষ্ট হইতে পারে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা 'মা' বলিয়াই হাই তুলি, গা ভাঙ্গি, দুঃখক্লেশে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি। এই 'মা' কথাই আমাদের প্রাণ জুড়াইবার সঙ্কেত। এখানে প্রিয় বলিলেও চলিবে না, জননী বলিলেও চলিবে না। 'মা'ই বলিতে হইবে। এইরূপ ভাবের রাজ্যে, প্রাণের রাজ্যে, ভিতরকার আদানপ্রদানের ব্যবসায়ে, দেশের ও দশের চিরাভ্যস্ত প্রাণের কথাগুলি ব্যবহার করিতেই হইবে, না করিলে, বাংলাসাহিত্য ও বাংলাভাষা একটা জীবন্ত বস্তু আর থাকিবে না। রস-সাহিত্যে—কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে,—এই প্রাণের ভাষার সেতুকে আশ্রয় করিয়া দেশের প্রাণের সঙ্গে একটা জীবন্ত যোগ রাখিতেই হইবে। এখানে জলধরপটলসংযোগে কোনও রূপ-রসের বর্ণনাতে রসভঙ্গ হইবেই হইবে। নিতান্ত পরের ধনে পোদ্দারি করিয়া যে সকল ভুঁইফোড় লেখক সহসা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা দিগ্‌গজ খ্যাতি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তাঁরা ছাড়া, আর কোনও কবি, বা ঔপন্যাসিক, বা নাটককার, বোধ হয় এ উদ্ভট চেষ্টাও করেন না।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অভিভাষণে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টীর অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন। এ ছাড়াও যে সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, ইহা যেন তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন, মনে হয়। ভাষা ভাবের বাহন। ভাবে অশেষবিধ বৈচিত্র্য থাকে। কোনও একটা রসকে ধরিয়া সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। কখনও ঐশ্বর্য্য, কখনও মাধুর্য্য; কখনও বীভৎস, কখনও বাৎসল্য; কখনও রুদ্র, কখনও করুণ। এখন প্রশ্ন এই যে দেশের ও সমাজের নিম্নস্তরে এ সকল বিবিধ রসের প্রকাশ যথাযোগ্য ভাবে ভাষায় হয় কি? রসের যন্ত্র ভাষা নহে,—স্নায়ু ও পেশি। অশিক্ষিত চাষী যখন রুদ্রভাবে উন্মত্ত হইয়া পড়ে তখন তার হাতের ও বুকের পেশি সকল ফুলিয়া উঠে, তার চক্ষু জবাফুলের মত হয়, মুখভাব সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করে;—কিন্তু রুদ্ররসের উপযোগী শব্দ-প্রবাহ সে ফুটাইয়া তুলিতে পারে কি? হদ্দমুদ্দ "আয় তো শালা" বলিয়া সে বাক্যস্ফোট করিয়া ছুটিয়া যায়। আচ্ছা, এই চিত্রটী সাহিত্যে ফুটাইতে গেলে, নিতান্ত সহজ, গ্রাম্যজন-বোধসুলভ ভাষায় কি তাহা সম্ভব হইবে? সমাজের নিম্নস্তরের অন্তরটা শিশুর মতন; তাদের ভাষাও স্বল্পবিস্তর শিশুরই ভাষা—আধ আধ। তাদের মুখে ঐ ভাষাতে সকল রসই ফুটিয়া উঠে, আর ফুটিয়া উঠে, কেবল শব্দ সহায়ে নয়, কিন্তু মুখের ভাবে, চলনের বা দাঁড়ানর ভঙ্গীতে। পুস্তকে তো আর এই সকল আনুসঙ্গিক রসগুলিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। করিতে গেলে, হয় এ সকলের লিপিচিত্র আঁকিয়া তুলিতে হইবে, না হইলে, যে রস ইহারা কতকটা কথায়, কতকটা হাবেভাবে প্রকাশ করে, সেই রসের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন। অক্ষয় বাবু যে এ সকল কথা জানেন না, বা বুঝেন না, এমন অসঙ্গত ও অবাস্তব কথা কল্পনাও করি না। কিন্তু তিনি এই অভিভাষণে এদিকে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই বলিয়া, এবারতের বা style এর সমালোচনা হিসাবে তাঁর বক্তৃতাটী অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

আর এবারতের বা style এর সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র যে দিকটা দেখাইয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও আংশিক সত্য মাত্র, ক্ষেত্র বিশেষেই তাঁর বিধান শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য, সকল ক্ষেত্রে তাঁর কথা মানিয়া চলিতে গেলে ভাষার গতির দিকটা, উন্নতির দিকটা, জটিলতার ভিতর দিয়া যে কলা-কুশলতা প্রকাশিত হয়, সেই প্রাণহারী জটিলতার দিকটা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, এমন কথা বলিতে পারি না; অক্ষয়চন্দ্রের মতন এমন সুকৃতি লেখক নিজেও এ কথা বলিবেন, বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এ ছাড়া এবারতের আর একটা দিক্‌ও আছে। সে দিক্‌টার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও অক্ষয়চন্দ্র কোনও উপদেশ করেন নাই। বাংলা ভাষার এবারতটা বাংলায় হইবে, আর কোনও দেশের হইবে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু কথাটা যে কত বড়, সকল বাঙালী সাহিত্যিকও ইহা ভাল করিয়া সর্ব্বদা ধারণা করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ। মানুষের চেহারা যেমন, তাহার

এবারত সেইরূপ। অর্থাৎ সকল মানুষের রক্তমাংস পেশি অস্থি মজ্জা মেদ, শারীর উপাদান ও শারীর প্রকৃতি মোটের উপরে এক হইলেও, এই সকল উপাদান ও এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেক মানুষের মুখে, ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, বিশেষ এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াতে এমন একটা বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে, যাহা অপর সকল মানুষে ফুটে না। শরীর সম্বন্ধে এই বিশেষত্বটুকুই সে ব্যক্তির নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব। সেইরূপ মনেরও একটা বিশেষত্ব আছে। যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে ছাঁচে ফেলিয়া সে জগতের অশেষ বিধ বস্তু ও বিষয়কে আপনার মনের ভিতরে গুছাইয়া রাখে, এবং যে আকারে এ সকল বিষয় সে অন্যের নিকটে প্রকাশ করে, এ সকলের ভিতর দিয়া, তার মনের নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বস্তু ফুটিয়া উঠে। এইটাই তার নিজের 'এবারত' বা style; এই এবারতটা মানুষের মনের, চিন্তার, ভাব-রাজ্যের, অন্তর্জ্জগতের চেহারা। কার চিন্তার ছাঁ-টা কিরূপ, কার মনের শক্তি ও গতি কোন্ দিকে, তার এবারতের ভিতর দিয়া তাহা ধরা পড়ে। বাঙালীর একটা মন আছে—অর্থাৎ সমষ্টিগত এই যে বঙ্গ-সমাজ, বহু শতাব্দ সহস্রাব্দ ধরিয়া এই ভারতবর্ষে যে সমাজ অপরাপর ভারতীয় সমাজ হইতে একটু পৃথক্ হইয়া, একটা কিছু অল্পবিস্তর বিশেষত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ও বাড়িয়া উঠিয়াছে, তার মনের চেহারায় সেটা গাঁথিয়া আছে। বাংলা সাহিত্যে, খাঁটি বাংলা এবারতে বা styleএ বাঙালীর এই মানসিক চেহারাটা ধরা পড়ে। এই চেহারাটা যেখানে নাই, বাংলা এবারত, অর্থাৎ বাঙালীর খাঁটি সাহিত্যের ছাঁচটাও সেখানে নাই। এ ছাঁচটা আধুনিক বাংলাসাহিত্যে খুবই যেন উলট্ পালট্ হইয়া যাইতেছে। বিদ্যা যখন হজম হয় না, তখন সাহিত্যে অজীর্ণ-লক্ষণ সর্ব্বত্রই দেখা গিয়া থাকে। বিদেশের বিদ্যাশিক্ষায় কোনও অপরাধ হয় না। না শিখিলে বরং স্বদেশের প্রাণবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতির সাহিত্যও জীর্ণ ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ বিদ্যা কোনও দেশ বা জাতির নিজস্ব বস্তুও নহে। এই একাদশ ইন্দ্রিয় আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড,—এই লইয়াই তো সকল প্রকারের লৌকিক বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলিও সকল মানুষেরই আছে, আর এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও সকলেরই ভোগদখলে রহিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাটাও সকলেরই সম্পত্তি। কিন্তু বিদেশের বিদ্যা শিখিলেই তো হয় না, হজম করাও চাই। এই হজমটা যারা করিতে পারে না, তাদের হাতেই বিদেশের বিদ্যাপ্রভাবে স্বদেশের অন্তঃপ্রকৃতি ও স্বদেশী সাহিত্যের এবারত, উভয়ই নষ্ট পাইবার উপক্রম হয়। এ বিপদটা আমাদের বড় বেশী। আমাদের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকেরাও সকল সময়ে, সকল বিষয়ে এ বিপদের হাত এড়াইতে পারেন নাই। বিদেশী ধর্ম্মের প্রভাবে, আমাদের মধ্যে, আধুনিক স্বাদেশিক ধর্ম্মসাহিত্যে, এমন কতকগুলি শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার, লোকপ্রকৃতির

ও সমাজপ্রকৃতির কোনই সঙ্গতি নাই। শব্দ ধার করা যে টাকা ধার করার মতন একটা অতিশয় গুরুতর অন্যায়, এমন কথা বলি না। কিন্তু যখন নিজেদের সাহিত্য ও শাস্ত্রভাণ্ডারে সে অর্থপ্রকাশক শব্দ পাওয়া যায় না, তখনই তো শব্দ ধার করা প্রয়োজন। এ ভাবে ধার করাতে কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে বিষয়ে নিজেদের কোনও দৈন্য নাই, সে বিষয়ে পরের পরিভাষা ধার করিয়া আনিলে, নিজের শব্দসম্পত্তির বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, ভাবরাজ্যে এবং জ্ঞানরাজ্যে পর্য্যন্ত একটা অলীকতা আসিয়া পড়ে। শব্দ, বস্তুর বা রসের সঙ্কেত বই তো আর কিছুই নয়! যদি বস্তুই আমাদের না থাকে, যে শব্দ যে রসের সঙ্কেত সে রসের আস্বাদনই যদি আমাদের ভাগ্যে কখনও না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দ আনিলেই তো চলিবে না। সে শব্দকে সত্যোপেত ও শক্তিশালী করিতে হইলে, সে বস্তুটীকেও লাভ করিতে হইবে, সে রসেরও সাধনা করা আবশ্যক হইবে। আর এইখানেই যত বিপদ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা জাগিয়া উঠে। এ বিপদে পড়িয়া কোনও দিকে কেবল বাংলা এবারত ও বাংলা সাহিত্য নয়, কিন্তু বাঙালীর চরিত্র পর্য্যন্ত ভিত্তিহীন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথাটা বিশদ করিবার চেষ্টা করিতে পারি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বাংলা ভাষাকে নানা দিকে খুবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, যদিও বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতন, কেশবচন্দ্রের সাহিত্যসেবার বড় একটা বেশী উল্লেখ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্য দিকে কেশবচন্দ্র বাংলা ভাষায় এমন দু চারিটা নূতন শব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যাহা খাঁটি বাংলা নয়, যার ভিতরকার বস্তুর বা রসের সঙ্গে আমাদের ভিতরকার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বা ইতিহাসের কোনই সম্পর্কও নাই। "বিবেক-বাণী" এই জাতীয় একটা কথা। আমাদের চিন্তাতে ও সাধনায় বিবেক শব্দের প্রতিষ্ঠা বহুকাল হইতেই হইয়াছে। উপনিষদ যুগে ইহার প্রথম পরিচয় পাই কিন্তু সে বস্তু আর কেশবচন্দ্র যাকে বিবেক বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ বস্তু, এক নহে। আমাদের বিবেক সাধন-রাজ্যের একটা অতি নিগূঢ় ও প্রত্যক্ষ বস্তু। অনিত্য সংসারকে নিত্য পরমার্থ হইতে পৃথক বলিয়া জানার নাম আমাদের বিবেক। এ বিবেক অতি দুর্লভ বস্তু। লাখের মধ্যে একেরও এ বস্তু লাভ হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু কেশব বাবু "বিবেক" বলিয়া যে বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলেন, সিদ্ধ অসিদ্ধ সকলেই তার দাবী করে। এ বস্তু ইংরেজের কন্‌সয়ান্স্ (Conscience); আমাদের বিবেক নয়। ইংরেজ যাকে conscience বলে, আমরা তাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া আসিয়াছি। বিবেক ইহার অনেক উপরকার রাজ্যের কথা। আর কেশব বাবু ইংরেজের conscienceকে আমাদের প্রাচীন সাধনার বিবেকের আসনে প্রতিষ্ঠিত

করিয়া, আমাদের আধুনিক ধর্ম্ম-চিন্তার ও ধর্ম্মসাধনার যে একেবারেই কোনও অনিষ্ট করেন নাই, এমনই বা বলা যায় কি? রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বহুবিধ অভিনব শব্দসম্পদে পরিপুষ্ট করিয়াছেন সত্য, এ ঋণ বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করিবে। কেশবচন্দ্রের মতন, তিনিও দু একস্থলে বিদেশীয় ভাবের অনুকরণে এরূপ দু একটী শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর বিশ্বমানব কথাটার উল্লেখ করা যায়। ইংরেজের 'হিউম্যানিটি' রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বমানব।" এই হিউম্যানিটি বস্তু আধুনিক য়ুরোপীয়েরা কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়াছে, সাধনাবলে লাভ করে নাই। ইহা কৃষ্ণত্ব, শুক্লত্ব প্রভৃতির মতন একটা গুণবাচক শব্দ মাত্র, নিজস্ব বস্তুত্ব বা স্বরূপ ইহার কিছুই নাই। অথচ য়ুরোপীয়েরা হিউ-ম্যানিটি বলিয়া যে তত্ত্বকে হাতড়াইতেছে, তাহা আমাদের সাধনাতে বহুকাল হইতে, নারায়ণ নামে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই নারায়ণ গুণবাচক শব্দ নহে, বস্তুবাচক শব্দ। নারায়ণ abstraction নহেন, কিন্তু person. আমাদের এমন নারায়ণ থাকিতে য়ুরোপীয় হিউম্যানিটিকে আমাদের ভাষাতে ও চিন্তাতে "বিশ্ব-মানব"-রূপে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রয়োজন আছে কি? এইরূপ অকারণে পরের সাধা সুর ভাঁজিতে গিয়া নিজের অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠতর স্বরগ্রামকে ভুলিবার উপায় করিয়া আমরা অলক্ষ্যে ভাষার ও সাহিত্যের কোন অমঙ্গল সাধন করিতেছি কি না ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র এদিক্ দিয়া এবারতের (style) আলোচনা করেন নাই। এই সকল দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তিনি আপনিই আপনার সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। ভাষা দেশের লোকের প্রাণসংস্পর্শে প্রাণময়ী হইবে, কথাটা অতি সত্য। কিন্তু প্রাণবস্তু তো আর জড় নহে। নিয়তই যে এই প্রাণ স্ফূরিত হইতেছে; নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য নূতন শক্তিও নিত্য নূতন রস আকর্ষণ করিয়া, দেশের প্রাণবস্তু উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ প্রাণ যে সেই মহাপ্রাণেরই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যেই সেই অনাদি অনন্ত বিশ্ব-প্রাণ, অনাদি অনন্তরূপেই লুকাইয়া আছেন। এই জন্যই এই প্রাণ ক্রমে বাড়িয়া উঠে। এ বিকাশের বিরামও নাই, শেষও নাই। সুতরাং যতটুকু ফুটিয়াছে, তাহাকে ধরিয়াই পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। যা এখনও ফোটে নাই—কিন্তু ফুটিবার উপক্রম করিতেছে, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং কেবল স্থিতির দিক নয়, গতির দিক দেখিয়াও সাহিত্যকে চলিতে হইবে। দেশের পুরাভ্যস্ত কথার সাহায্যে, দেশের প্রাণের অন্তঃপুরে সাহিত্যিককে যেমন প্রবেশলাভ করিতে হইবে, সেই-রূপ আবার ভিতরের ও বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের চিত্তে যে সকল নূতন নূতন ভাব ও আদর্শ স্ফুটনোন্মুখ হইতেছে, অভিনব শব্দ সৃষ্টি করিয়া, সে গুলিকেও ফুটাইয়া তুলিতে

হইবে, নতুবা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত রাখা যে অসাধ্য হইয়া পড়িবে। অক্ষয়চন্দ্র এ সকলই জানেন ও বুঝেন; তবে তাঁর অভিভাষণে এদিকটা তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। লোকে কি জানি তাঁহাকে ভুল বুঝে, এই জন্যই এ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল। অক্ষয়চন্দ্র যদি নিজে আর একদিন সাহিত্যের এই গতির দিক্‌টা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, আমরা সকলেই কৃতার্থ হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অভিভাষণ

উত্তরে ফেণী নদী, পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে আরাকান সীমার নাব-নদী এবং বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বঙ্গসমুদ্রের বারিবিস্তার—এই স্বভাব-সীমার মধ্যস্থিত ২৪৯৮ বর্গ মাইল জনপদখণ্ডই আমাদের চট্টলমাতা, কিঞ্চিদধিক ১৫ লক্ষ লোক ইহার জনসংখ্যা।

এদেশে ইংরাজ-অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই ইহা হিন্দু, মুসলমান, পর্ত্তুগীজ ও বৌদ্ধ এই চতুষ্টয় ধর্ম্মশক্তি এবং সমাজসভ্যতার মিলনভূমি হইয়া ছিল। হিন্দুরা প্রধানতঃ ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে, বাঢ়বঙ্গে মুসলমান-বিপ্লবের সময় এই দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়া এদেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন—তাঁহারা আপনাদের ক্ষত্রিয় ও রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দেন।

হিন্দু ও মুসলমানের আগমনের পূর্ব্বে এ প্রদেশ আরাকানের নৃপতির অধিকারে ছিল। পরাজিত মগেরা এখন পার্ব্বত্য আবাস গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু, মগধেশ্বরী এখনও এ স্থানের গ্রাম-দেবতা, এখনও সর্ব্বত্র তাঁহার পীঠস্থানগুলি অক্ষুণ্ণ আছে। হিন্দুর পুরাণ-বিখ্যাত ভৈরব ও চট্টেশ্বরী পীঠ, মুসলমানের বারওয়ালির স্থান, পীরবদরের সমাধি ও ফকির বায়জিদ বোস্তামীর স্মৃতিরক্ষক দরগাহা, আন্দরকেল্লাস্থ ঔরঙ্গজেব-সহোদর সাহ সুজার মস্‌জিদ, রঙ্গমহাল পর্ব্বতনিম্নে নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধ আমলের ভগ্ন বিহার মন্দির ও সার্দ্ধসহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার বিপুলকায় বুদ্ধমূর্ত্তি, এবং কাকুস্‌ বাজার, পাহাড়তলী প্রভৃতি স্থানসমূহে বৌদ্ধ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ক্যাং বা তপোবন, প্রভৃতি ইহার অতীত গৌরব এবং কীর্ত্তি-স্মৃতি বহন করিতেছে। এখনও এই প্রদেশ এবং লঙ্কাদ্বীপ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পালিশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

এদেশ বাণিজ্যের জন্য পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ Porto Piqueos বা ক্ষুদ্র বন্দর সপ্তগ্রামের তুলনায় ইহার নাম দিয়াছিলেন Porto Grando বা বৃহৎ বন্দর। এইস্থানেই বঙ্গে

* চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতার সারাংশ।

ইংরাজ প্রবেশের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজকর্ত্তৃক চুঁচুড়া হইতে বিতাড়িত হইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, হুগলি বালেশ্বর প্রভৃতির তুলনায় এই চট্টগ্রামকেই শ্রেষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যকর বন্দর বিবেচনা করিয়া কমাণ্ডার হীথ ও চার্ণকের অধীনে এতদ্দেশে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাৎকালিক মুসলমান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক তাহা বিধ্বস্ত না হইলে হয় ত এই চট্টগ্রামই ভারতের রাজধানী হইতে পারিত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক ইংরাজের করে অর্পিত হয়।

১৪০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে চীনসম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত সচীব চেঙ্গ হো, ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে আরবীয় ভ্রমণকারী ইবন বতুতা এবং চৈন পরিব্রাজক মাহুন্দের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা এদেশের তাৎকালিক বাণিজ্য-প্রসারের পরিচয় পাই। ভারত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ, চীন, ব্রহ্মদেশ, জাবা, সুমাত্রা এমন কি সুদূর মিশরদেশে পর্য্যন্ত ইহার বাণিজ্য-পোত যাতায়াত করিত। রুমের সম্রাট আলেকজান্ড্রিয়ার (Alexandria) ডক কারখানায় প্রস্তুত জাহাজ অপেক্ষা চট্টগ্রামের নির্ম্মিত জাহাজের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, এবং এইখান হইতে প্রয়োজনানুযায়ী জাহাজ তৈয়ার করাইতেন। ১৮৭৫ (?) খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বেও এক হিন্দু সওদাগরের বকলণ্ড নামক জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া স্কটলণ্ডের টুইড নদী পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিল। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশোপযোগী ৪।৫ শত বৎসরের মত স্থায়ী কাগজ এদেশে এককালে অনেক প্রস্তুত হইত; সমুদ্রোপকূলে যে লবণের কারখানা ছিল, সমস্ত বঙ্গের অভাব তাহাতে মোচন হইতে পারিত। আজ সে সব কোথায়? —আজ আমাদের মস্তিষ্কের প্রসার, বাহুর শক্তি এবং আত্মিক সাহসের সেই পালতোলা মাহাত্ম্য-তরণী অদৃশ্য হইয়াছে।

আমরা এখন শক্তি হারাইয়াছি, শতদলবাসিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতীমাতার জন্য হৃদয়মধ্যে মণিমুক্তার শতদল নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই—উভয়েই আজ আমাদের প্রতি বিরূপা। যখন এ দেশ সমুদ্র-কন্যা লক্ষ্মীমাতার পূজা জানিত, তখন ষোড়শোপচারেই সরস্বতীমাতারও পূজা সে করিয়াছে। এই দেশের ইতিহাস ও সাহিত্য হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত ৪৪৩ জন লেখকের বিবরণ ও রচনাদির পরিচয় পাইয়াছি। প্রাচীন বঙ্গের অনেক বিলুপ্ত কবির রচনাও এখানে উদ্ধার হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এখনও সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত হয় নাই, হওয়া সম্ভবপরও নহে। এদেশের খাস কবিগণের মধ্যে—৩২৬ বৎসর (নবাবিষ্কৃত হস্তলিখিত পুঁথির প্রমাণে ৬০০ বৎসর) পূর্ব্ববর্ত্তী সুচক্রদণ্ডী নিবাসী দ্বিজ রতিদেব সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত "মৃগলুব্ধ" বঙ্গসাহিত্যে শৈবপ্রভাবের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন। ঔপনিবেশিক হিন্দুগণের মধ্যে অধিকাংশই শৈব ছিলেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব পরবর্ত্তী কালের। চন্দ্রশেখরের "ভবানী" পীঠ ও বৈষ্ণবের "সীতাকুণ্ড" এখনও গুপ্ত রহিয়াছে। শ্রুতিবিহিত অনুষ্ঠান বিষয়ে শৈব সেন-

রাজের সভাপণ্ডিত হলায়ুধের মতই বহুকাল প্রচলিত ছিল। নব্যমত নবদ্বীপ শিষ্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক মাত্র ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত।

১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত দেবগ্রামনিবাসী মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ২৫০ বৎসর পূর্ব্বের কায়স্থ কবি ভবানীশঙ্করের চণ্ডীকাব্য, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, দ্বাবিংশ কবির সৌভ্রাত্র সমবায় বিরচিত বৃহৎ "মনসার পুঁথি", বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহার উজীর সহৃদয় পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নন্দী এবং তৎপুত্র শ্রীকর নন্দী বিরচিত পরাগলী মহাভারত, বৈষ্ণব কবি করমালির রচনা, আলিরাজা ওরফে কালু-ফকিরের জ্ঞানসাগর যোগ কালন্দর ও পদাবলী, কাজী বদিয়ুদ্দিনের চিপ্ত ইমান, ভারতচন্দ্রের তুল্যাসনাধিকারী প্রসিদ্ধ কবি আলাওল প্রণীত সুবৃহৎ উপাখ্যান—কাব্য সপ্তক,—সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্য-গঙ্গার সহিত আপনাদের ধারাস্রোত মিশাইয়া রাখিয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থের ভাষা বিশেষভাবে রাঢ়দেশের ভাষা। রাঢ়-বঙ্গের প্রাচীন ভাষা কি ছিল এই সকল গ্রন্থ হইতেই তাহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। পর পর বৌদ্ধ, মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের সম্পর্ক-সংঘর্ষের ফলে বঙ্গভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ফলে, ইহা এখন সংস্কৃতবহুল ও অনেক স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমরা এ দেশের লোক, কথাবার্ত্তায় নানা দিকে দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার রাঢ়ীয় ভাষাই প্রচলিত রাখিয়াছি। সমগ্র বঙ্গের কথিত ভাষার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে এখন অনুসন্ধান চলিতেছে—তাই এ কথার উল্লেখ করিলাম।

এখন সাহিত্য জিনিসটা কি তাহাই দেখা যাউক। আমাদের 'সাহিত্য' শব্দ কাব্যের প্রতি-নাম মাত্র, কাব্যও (আমাদের শাস্ত্রে) রসাত্মক বাক্য। পরন্তু "সাহিত্য" শব্দ নিজেই চিরকাল সম্মিলনভাব-মূলক। সুতরাং এই যে সাহিত্যের ভাব ইহা শুধু সম্মিলনের ভাব নহে, রসাত্মকের ভাবও বটে। ইহার মূলে একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। ভারতবর্ষ প্রথম হইতেই জানে যে সাহিত্যের প্রধান নিমিত্তকারণ এই সম্মিলন। ধর্ম্ম-তন্ত্রের বিভিন্ন সমাজের ভেদের আদর্শ এবং সকল সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে কেবল এই সাহিত্যই তাহার একমাত্র মিলনভূমি হইয়াছে—এই সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সে যাহা কিছু উদারতা, সার্ব্ব-জনীনতা এবং একত্বের রস অনুভব করিতে পারিয়াছে। এখন যদি, ইউরোপের আদর্শে আমাদের "জাতীয়তা" লাভ করিতে হয়, তাহা হইলেও এই সাহিত্যের পথেই তাহা একমাত্র সম্ভবপর হইবে। ভাষাই সম্মিলনের প্রাণ, সুতরাং জাতীয় সম্মিলন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষারও উন্নতি চেষ্টা করিতে হইবে।

বঙ্গদেশে সম্মিলিত ভাবে জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন চেষ্টা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ব্যক্তিগত প্রতিভাশক্তি—নিষ্ঠা, সাধনা প্রভৃতির উপর সাহিত্যের প্রধান উন্নতি নির্ভর করে, এ কথা সত্য; কিন্তু

যদি তাহা জনসাধারণের সম্মিলিত সহানুভূতি বা সাহায্য না পায়, তাহা হইলে তাহার ভিত্তি লাভই হয় না। তাহা কয়দিন টিকিতে পারে? সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিভার অর্থই—একের মধ্যে বহুর সম্মিলন, আপনার অন্তস্তত্বে 'বিশ্বমানবত্বে'র (Humanity সমাধান। সাহিত্যক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত যে কয়জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের মাহাত্ম্য ব্যক্তিগত ভাবেই অথবা তাঁহাদের অল্পসংখ্যক অনুসরণকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—সমগ্র সাহিত্যসেবীর মধ্যে তাহা ছড়াইয়া পড়ে নাই। যাহাকে বিশ্বসমতা বলে সে ভাব তাহা পায় নাই। আমাদের শিক্ষাব্যাপার জাতীয় ভাষায় সাধিত হয় না বলিয়াই—আমাদের বাক্-দেবতা ও জ্ঞান-দেবতা এক নহে বলিয়াই হয় ত আমাদের সাহিত্যের এই বিক্লবতা। আমরা ইংরাজীতে দিগ্বিজয়ী অথচ মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া কেবল লজ্জাগ্রস্ত হই। কেন এমন হয়? প্রবেশিকা এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর উপযোগী বঙ্গসাহিত্যের আমাদের এত অভাব কেন? সমবেত চেষ্টায় ভাষার সম্যক অনুশীলন করিয়া তাহাকে যদি আমরা 'উন্নত প্রতিভার সহজ-সিদ্ধ কর্ম্মভূমি' রূপে দাঁড় করাইতে পারি—তবেই ইহার প্রতীকার হয়।

সাহিত্য-পরিষদ্ গত ত্রয়োদশ বৎসর হইতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস সকলের দিকেই আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছে। অবশ্য পরিষদের এই ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী কার্য্যগুলি অকিঞ্চিৎকর নহে। কিন্তু এখন তাহাকে অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে একটা বিশেষ অভাব আছে,—তাহা ভাবের পুষ্টি ও গভীরতা। মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রতিবৎসরই বাড়িতেছে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি কতটুকু হইতেছে তাহাই বিচার্য্য। আমাদের লোকরুচি এখনও মননকার্য্যে সহিষ্ণুতা লাভ করে নাই। সকল লেখকই প্রায় দেশ-প্রচলিত অভিরুচির পরিপোষণ করিয়া চলিতেছেন, কাজেই সাহিত্য বিশেষভাবে "লৌকিক ও লোকায়ত" হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাধারণের রুচি-পরিচর্য্যা হইতে আপনার লেখনীকে স্বাধীন ভাবে চালাইয়া উন্নত ভাব, চিন্তা এবং দেশবিদেশের উন্নত সাহিত্য-আদর্শকে প্রয়োগ করিয়া, বিশ্বসাহিত্যের সহিত আমাদের সাহিত্যকে মিলাইবার শক্তি, চেষ্টা বা সাহস কয়জনের আছে? তাহার উপর আমাদের কবি ও প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র নিজ-হৃদয়ের আনন্দ-প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন—চলিবেনও। ফলে, একালের সভ্য সাহিত্য-সমূহের ভাব, ভাষা ও চিন্তা-পদ্ধতি, উহাদের প্রসার এবং গভীরতা আমাদের চিন্তা-প্রণালীর মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে না। এই বাধা আমাদের দূরীকৃত করিতেই হইবে। ইয়ুরোপের সদ্গ্রন্থ নিচয়ের প্রকৃত শক্তি দ্বারা বঙ্গভাষাকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। অবশ্য, অন্য ভাষার ভাব এবং জ্ঞান-সম্পত্তিকে অক্ষুণ্ণ ভাবে ভাষান্তরিত করিতে হইলে একশ্রেণীর প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভার উদ্বোধন এবং পুষ্টি করাই

আমাদের সম্মিলিত শক্তির কার্য্য হইবে। প্রাচীন বঙ্গ বা সংস্কৃত-সাহিত্য এখন থাক্,—পরবর্ত্তী লেখকগণের সাহিত্যে আমরা বিশেষ ভাবেই ত তাহা পাইয়াছি; প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার ভাবগতি আমাদের অস্তুতন্তুতে জড়াইয়া আছে। এখন বৈদেশিক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। তাহার সাধনা চাই। সাহিত্য চিরকালই সাধনার সম্পত্তি; কেবল সখনবিশী আলোচনা কিম্বা সৌখিন ও খামখেয়ালি চেষ্টায় তাহার প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব।

নব বর্ষে প্রার্থনা

গেল বর্ষ;—নব বর্ষে নূতন প্রভাত!
সুপ্তপ্রাণ, মোহনিদ্রা টুটিল কি তাব?
কত আশা, কত হর্ষ, বেদনা-আঘাত
লভিয়াছি, করিব না তাহার বিচার।
মুছে দাও আজি সব, হে মোর দেবতা।
পেয়ে যদি থাকি সুখ, যদি কোন মান,
তোমারি প্রসাদ তাহা, নহে গর্ব্বকথা;
পেয়ে যদি থাকি দুঃখ, সে তোমারি দান!

২

জনে-জনে,—ক্ষুদ্র আমি,—মোর নিবেদন,—
করিয়াছি যত ত্রুটি, অপরাধ যত;
শত্রু হও, মিত্র হও—যে হও আপন,
চাহি ক্ষমা নতশিরে আজিকার মত!
লহ প্রীতি, লহ প্রেম,—ভুল' বিসংবাদ;
এস কাছে,—অভিমানে যে বা আছ দূর;
এস বক্ষে—যে বঞ্চিত মিলন-আস্বাদ,
নব বরষের দিন কর সুমধুর!

৩

লহ—লহ নব বর্ষে করি' আবাহন;
নব অতিথির নাহি চাহি পরিচয়!
দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, করিয়া বরণ—
লহ সমাদরে,—সে যে সর্ব্ব দেবময়!
গৃহী যদি,—হও তুমি পূর্ণ ধনে-জনে,—
অতিথির আশীর্ব্বাদ হ'বে না বিফল;
হে সন্ন্যাসি, ইষ্টলাভ ধ্যান তব মনে,
লভ' সেই ইষ্ট, যাহে বিশ্বের মঙ্গল!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্যবধান

তুমি ছিলে কত দূরে কোন্ কল্পনার পুরে
অনন্ত ভুবনে,
ভাসিয়া কালের স্রোতে এ জগতে কোথা হ'তে
এসেছি দু'জনে।
দু'জনার শিরোপরি নীলিমা বিস্তার করি'
আছে সীমাহীন এক অখণ্ড আকাশ,
এক ধরণীর বুকে আছি দোঁহে সুখে দুখে
এক সমীরণে মিশে দোঁহার নিশ্বাস।
এক নিশা অন্ধকারে ঢেকে দেয় দু'জনারে
একটি চাঁদের পানে দোঁহে চেয়ে থাকি,
এক উষা—এক রবি— এক নিখিলের ছবি
মুগ্ধ করে আঁখি।

২

হেথা এত কাছাকাছি যদিও দু'জনে আছি,
—এ কি ভাগ্য-ছল!
দু'জনার মাঝে কেন তবু ব্যবধান হেন
কঠিন নিশ্চল!
তুমি ভেসে যাও ধীরে শুভ্র অভ্র গিরিশিরে
আমি লুটি পদমূলে—অশান্ত নির্ঝর,
সহি শত শিলাঘাত দারুণ ঝটিকাবাত
অজ্ঞাত প্রান্তর পানে ছুটি নিরন্তর।
কি যে গাহি কলভাষে— কোন্ ছায়া হৃদে ভাসে
কি আবেগ-আকুলতা—কেহ নাহি জানে।
কখনো কি ঊর্দ্ধ হতে বন্ধুর এ শিলা-পথে
চাহ মোর পানে!

৩

এই ভাল—কাজ নাই, যা পেয়েছি—থাক্ তাই,
চাহি না মিলন,
এমনি তোমার ধ্যানে এমনি প্রেমের গানে
কাটিবে জীবন।
অপ্রত্যাশী অনুরাগ, নিষ্কাম এ প্রেম-যাগ,
এ নহে আঁখির তৃষা—মোহের স্বপন।
চাহে না এ বিনিময় হৃদি-জয়-পরাজয়,
এ যে শুধু আপনার সর্ব্ব-সমর্পণ।
মানস-মন্দির মাঝে তোমার প্রতিমা রাজে,
বিশ্বের শোভায় তব মাধুরী অম্লান;
অন্তরে বাহিরে চাই— তোমারে দেখিতে পাই,
কোথা ব্যবধান!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

উপবাস ও ক্লান্তি *

উপবাস ও ক্লান্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে অনেক ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। বিনা পরিশ্রমে ক্ষুধার সময় প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিতে পাওয়াই কিছুকাল হইতে বাঙ্গালী জীবনের সুখের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তবে আজকাল সেই আদর্শ পরিবর্ত্তনের জন্য কতকটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে; অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম করাটা ভাল, এ কথা অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং গোলদীঘিতে দুই এক পাক খাইয়া যথেষ্টমাত্রায় ব্যায়াম করা হইয়াছে ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেন। কিন্তু উপবাস সম্বন্ধে লোকের মতের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই; অধিকাংশ লোকেরই ধারণা উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। এই ধারণা কতটা সত্য তাহা স্থির করিবার জন্য আমি উপবাস সম্বন্ধে পরীক্ষা, চিন্তা ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই। এই সকলের ফলে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, মাঝে মাঝে উপবাস, অধিকাংশ সাধারণ লোকের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। বিশেষতঃ যাহারা প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া থাকেন, অথচ যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রমে নারাজ, তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপবাস একান্ত প্রয়োজনীয়। তদ্ব্যতীত কোন কোন প্রকার গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কালে উপবাস হিতকর। আর মাঝে মাঝে ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নাকে বিদূরিত করিয়া দিবার মত ক্ষমতা রাখাও সামান্য নৈতিক লাভ নহে।

উপবাস সম্বন্ধে অধ্যয়ন সময়ে যে সকল তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি তাহাতে আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, সম্ভবতঃ অনেক পাঠকও হইবেন। গৌহাটী ভ্রমণ-কালে এক পাণ্ডা বলিয়াছিল যে, সেখানে পাণ্ডাদের পিতামাতার কাহারও মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি অন্নজল ত্যাগ করিয়া থাকিতে হয়। সে কথা তখন মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। প্রাচীনকালে কোন কোনও ব্রতে আট নয় দিন উপবাস করিতে হইত বলিয়া কথিত আছে। সে সকল কথাও অসম্ভব ভাবিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান কালের শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতগণের সমক্ষে অনেক লোক সাত আট দিন উপবাসে কাটাইয়াছে এবং তিন চারিটি ব্যক্তি প্রায় ত্রিশ দিন ব্যাপী উপবাস করিয়াছে। পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে দীর্ঘ উপবাসের পর যথারীতি আহার গ্রহণ করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি শীঘ্রই আবার নিজ নিজ দেহের পূর্ব্ব অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছিল, কাহারও শারীরিক কোন স্থায়ী ক্ষতি হয় নাই।

উপবাসকালে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে আমি নিজের উপর কয়েকবার উপবাস সম্বন্ধীয় পরীক্ষা চালাইয়াছিলাম।

---

* চট্টগ্রামে গত সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত।

সে পরীক্ষাগুলি প্রতিবারেই চব্বিশঘণ্টা ব্যাপী হইয়াছিল। পরীক্ষার সময় উপলব্ধি করিতাম যে ভোজনের নিয়মিত-কাল উপস্থিত হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এবং সময় যতই যায়, উত্তরোত্তর ততই ক্ষুধার জ্বালা বাড়িতে থাকে। ভোজনের নিয়মিতকাল অতিবাহিত হওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যে ক্ষুধার জ্বালা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায়। এই সময় শরীর বড় দুর্ব্বল মনে হয়; অল্প পরিশ্রমেই মাথা ঘুরিয়া উঠে। কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা যায় না। কয়েকবার উপবাস করিলে ক্রমে কিন্তু এই অবস্থার কষ্ট আর বড় বেশী মনে হয় না। যাহারা কোনও কালে উপবাস করে নাই তাহারা ভাবে এই যন্ত্রণাটা বুঝি ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিবে। কিন্তু না; তা বাড়ে না। ঐ সময়ের পর হইতে ক্ষুধার যন্ত্রণা একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে। পরে আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে উহা একপ্রকার বিলুপ্তই হয়। এই সময় ক্ষুধার তাড়না থাকে না, তবে খাইবার ইচ্ছা থাকে। শরীর ক্রমশঃ খুব লঘু ও স্বচ্ছন্দ বোধ হয়। সেই সময়ে দেখিয়াছি যে যথেষ্ট মাত্রায় মানসিক পরিশ্রম করা যায়। মনসংযোগ দিবার শক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি এই সময় খুব তীব্র হইয়া উঠে। কোন বিষয়ে একাগ্র-মনা হইবার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট সময়। এই মানসিক পরিশ্রমের পর অন্য দিনের মত ভ্রমণাদি শারীরিক পরিশ্রম করা হইয়াছিল; তাহাতে কোনও বাধা জন্মে নাই, তবে শরীর কিছু দুর্ব্বল ছিল।

ঐ সকল ঘটনার শারীরবিধানশাস্ত্র (Physiology) সঙ্গত ব্যাখ্যা এইরূপ—পাকস্থালীতে কিম্বা যকৃৎযন্ত্রে সঞ্চিত খাদ্য যখন ফুরাইয়া যায় তখন ক্ষুধার উদ্রেক হয়। ক্ষুধার প্রথমে শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন কোষগুলি খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাইতে থাকে। শরীর-যন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষসমষ্টির দ্বারা গঠিত। এই সকল কোষ যখন কার্য্য করে তখন কিছু কিছু খাদ্য পুড়াইয়া ফেলে। এক একটী কোষ এক একটী ক্ষুদ্র ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিন যেমন কয়লা খাইয়া কার্য্য করে, শরীর-নির্ম্মাণকারী কোষগুলিও তেমনই কিছু খাদ্য পুড়াইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কোষগুলির যখন যাহা প্রয়োজন হয় রক্ত তখন তাহা পাকযন্ত্র, যকৃৎযন্ত্র প্রভৃতির নিকট হইতে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রদান করে। উপবাসের সময় কিন্তু পাকযন্ত্র যকৃৎযন্ত্র প্রভৃতিতে খাদ্য থাকে না, কাজেই মাংসপেশী প্রভৃতির কোষগুলি খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতে থাকে। উহাই ক্ষুধার তাড়না।

কিন্তু ক্ষুধাটা কিছুক্ষণের মধ্যে পড়িয়া যায়। ইহার কারণ এই যে শরীরের মধ্যে কতকগুলি কোষ আছে, তাহাদিগকে ভাণ্ডারীকোষ এই নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই ভাণ্ডারীকোষগুলি (adepose tissue cells), দেহ যখন প্রচুর খাদ্য পায়, তখন অতিরিক্ত খাদ্যভাগকে চর্ব্বিতে পরিণত করিয়া নিজেদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত রাখে। আবার যখন শরীরে খাদ্যের অভাব হয় তখন তাহারা চর্ব্বিকণাগুলিকে দ্রবীভূত করিয়া রক্তে ঢালিয়া দেয় এবং

রক্ত তাহা লইয়া গিয়া ক্ষুধার্ত্ত মাংসপেশী প্রভৃতিতে দিয়া তাহাদের পোষণ করে। এই ভাণ্ডারীকোষ ঠিক যেন কোন সংসারে সুগৃহিণী, ঘরে চাল,—নাই কয়লার অভাব, বাজার দূরে, অথবা পয়সার অস্বচ্ছলতা, সময়ে হাঁড়ি চড়ে নাই, বালক-বালিকারা ক্ষুধায় অস্থির, রোগী পথ্য বিনা ছটফট করিতেছে, ধমকে চমকে, আশা ভরসায় কিছুতেই তাহারা যখন আর বর্গ মানে না, কান্নাকাটি জুড়িয়া দেয়, তখন সুগৃহিণী আপনার গোপন ভাণ্ডারে সঞ্চিত মুড়ি মুড়কি মিঠাই জলপান মিছরি বাতাসা দিয়া ক্ষুধার্ত্তদের আশু শান্ত করেন! আমরা বুঝিলাম শরীরস্থ ভাণ্ডারীকোষের প্রধান কার্য্য নিজের মধ্যে খাদ্য সঞ্চয় রাখা ও প্রয়োজনমত তাহা বাহির করিয়া দেওয়া। ক্ষুধা যখন পড়িয়া যায় তখন বুঝিতে হইবে ভাণ্ডারীকোষগুলি নিজেদের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা নিজেদের চর্ব্বির সম্ভার লইয়া ক্রমশ রক্তে ঢালিয়া দিতেছে। এই অবস্থায় তাই আর ক্ষুধার বেগ থাকে না।

ভাণ্ডারীকোষের সঞ্চয় করা ও ব্যয় করা এই উভয় কার্য্যই পরম প্রয়োজনীয়। কাহারও কাহারও ভাণ্ডারীকোষ শুধু সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু ব্যয় করিতে শিখে নাই। আমি দেখিয়াছি, স্থূলকলেবর ব্যক্তি, এক সপ্তাহ উপবাস করিলেও যাহার বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা নহে, কেবল জল খাবারটা সময়মত না জুটিলেই, তিনি ক্ষুধায় একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। যাহাদের ভাণ্ডারীকোষ একেবারে ব্যয় করিতে শিখে নাই, তাহাদের বড় দুঃখ! তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত চারি পাঁচ সের চর্ব্বির বোঝা বহন করিতে হইতেছে, যাহা তাহাদের কোন কালেই কোন কাজে লাগিবে না। যাহারা নিয়মিত উপবাস করে তাহাদের ভাণ্ডারীকোষ ব্যয় করিতে শিখে এজন্য উপবাসে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয় না।

শুধু যে উপবাসের দ্বারা ভাণ্ডারীকোষকে ব্যয় করিতে শিখান যায় এমন নহে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করিয়াও তাহাদিগকে ঐ শিক্ষা দেওয়া যায়। চুপ করিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া একদিন উপবাস করিলেও যে ফল হয় পাঁচঘণ্টা ধরিয়া শিকার করিলে বা পর্ব্বতারোহণ করিলেও সেই ফল লাভ হয়। কেবল প্রভেদ এই যে প্রথম উপায়ে সঞ্চিত খাদ্য ধীরে ধীরে ক্ষয়িত হইয়া যায়, আর দ্বিতীয় উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায়।

কোন কোন প্রকারের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের সময় উপবাসে কেন সুফল হয় তাহা এক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। খুব গুরুতর পরিশ্রমের সময় উপবাস হিতকর। আমি মাঝারী-গোছের পরিশ্রমের কথা বলিতেছি না, অত্যধিক পরিশ্রমের কথাই বলিতেছি। মাঝারী পরিশ্রমে ক্ষুধা বেশ উদ্দীপ্ত হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াও যায়। শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে খাদ্য সামগ্রী উদর মধ্যে প্রেরণ করিয়া পরিপাক করিতেও যথেষ্ট পরিশ্রম লাগে। হৃদয়যন্ত্রকে, খুব খানিকটা কোদাল পাড়িবার

সময় যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, এক পেট ভাত হজম করিবার সময়ও সেইরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। যখন কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে তখন শরীরের সমস্ত রক্ত মাংস, পেশী ও মস্তিষ্ক প্রভৃতিতে যাওয়া আবশ্যক—রক্তের পাকযন্ত্রে গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাকে পঞ্চাশ মাইল পথ চলিতে হইবে কিম্বা উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিতে হইবে সে যদি শরীরে বলাধান হইবে বলিয়া উদরকে উত্তমরূপে পূর্ণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করে তবে সে একেবারে ঠকিবে। গুরু পরিশ্রম আরম্ভ করিবার অল্পক্ষণের মধ্যেই পাকযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইবে। তখন তাহার পক্ষে খাদ্যের বোঝা বহাই সার হইবে। গুরু পরিশ্রম করিবার সময় শরীরকে তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত খাদ্য খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে হইবে। ভাণ্ডারীকোষগুলি যাহাদের ব্যয় করিতে শিখিয়াছে তাহাদেরই এই কার্য্যে সুবিধা হয়।

চরিত-চিত্র

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও স্বাদেশিক কর্ম্মক্ষেত্রে একটা নূতন বস্তুর আমদানী হইয়াছে। ইহার নাম নেতা বা নায়ক বা "লীডার"। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এ কথা আমরা শুনি নাই। কৃষ্ণদাস জমিদার সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না, মুখপাত্র বা প্রতিনিধি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বা আনন্দমোহন, শিশিরকুমার কি কালীচরণ, ইহাঁদের কেহই সে'কালে নেতা উপাধি লাভ করেন নাই, কিন্তু দেশের নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে ইহাঁদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আমার মনে হয় যে, সে সময়ে আমরা যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শ ধরিয়া চলিতেছিলাম, তাহা কোনও লোকবিশেষের নেতৃত্বের দাবী সহ্য করিতে পারিত না বলিয়াই, সে যুগে আমাদের মধ্যে নেতার বা নায়কের বা লীডারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। এখন যে বস্তুকে আমরা নেতা বলি সে বস্তু তখনও ছিল। মনের ভাবে তো আর সংসারে কোথাও বস্তু-বিপর্য্যয় ঘটে না। তবে আমরা তখন সে বস্তুকে নেতা বা নায়ক বা লীডার বলিয়া ডাকিতাম না, ইহাই কেবল সত্য।

আর আজ আমরা এই সকল নাম দান করিতেছি বলিয়াই যে নূতন বস্তু লাভ করিতেছি, এমনই কি বলা যায়? সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কর্ম্মী ও মনীষীগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি তখনও ছিলেন, এখনও আছেন। আমরা এখন তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি না বলিয়া নেতা বলিতে বেশি ভালবাসি; কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের কথার জোরে তাঁরা নেতা বা নায়ক হইয়া উঠেন, এমনও বলা যায় না। ফলতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত নায়কত্ব লাভ করা এমন সহজ ব্যাপারও নহে। আমরা

লেখাপড়া জানি কিম্বা না জানিলেও জানি বলিয়া আমাদের যে অভিমান জন্মিয়াছে, তাহার দরুণই কেহ আমাদের প্রকৃত নেতা হইতে পারেন না। আমরা বিচার করি, যুক্তি করি, পরখ করি, লাভালাভ গণনা করি, তার পরে যাঁর কথা আমাদের মনোমত হয়, তাঁহাকে আমাদের মুখ-পাত্র বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু কাহারও কথায় আমরা উঠিতে বসিতে পারি না। কাহারও পশ্চাতে যাইয়া আমরা দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে জানি না। কাহারও মান বা প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি না। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে কচিৎ ধর্ম্মের ব্যাপারে সম্ভব হইলেও, সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই কেবল ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লোক-প্রতিনিধি বলা যায়, কিন্তু লোক-নায়ক বলা যায় না।

বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল একজনমাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত।

অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন; সদ্বক্তা, কিন্তু দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নহেন! সুললিত বাক্য যোজনা করিয়া তিনি বহু লোককে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের বন্যা ছুটাইয়া তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন না। তিনি সাহিত্যিক,—তাঁর ভক্তিযোগ বাংলাভাষার একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁর নাই। তিনি দরিদ্র নহেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তির দ্বারা তাঁর সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হয়; কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি, এল পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণীদলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমত চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়াও লোক সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্বিনীকুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্ম্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্বলাভ করা যায়। অশ্বিনীকুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; ইচ্ছা করিলে অশ্বিনীকুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁর বিদ্যার ও চরিত্রের গুণে রাজকার্য্যে তিনি যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম্ম ও-কৃতিত্ব-বলে, সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্বলাভ হয়, অশ্বিনীকুমার তার কিছুরই দাবী করিতে

পারেন না। তথাপি, তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।

ফলতঃ আমার মনে হয় যে, আমাদের চিন্তানায়ক অনেক আছেন, কিন্তু লোক-নায়ক নাই। কেহ বক্তা, কেহ (বলিলেও চলে) কবি; কেহ মসীজীবী, কেহ ব্যবহার-জীবী; কেহ বা ধনে, কেহ বা পদে বড়। এই সকল লোকে মিলিয়া দেশের মনের গতি ও কর্ম্মের আদর্শ বদলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। ইহাঁরা না থাকিলে বাংলা আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে যাইতে পারিত না। ইহাঁরা দেশের প্রাণতা বাড়াইয়া দিয়াছেন, লোক-চরিত্রকে উদার ও উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁরা কেহই, সত্য অর্থে, লোকনায়ক নহেন। লোকে ইহাঁদের পুস্তক আনন্দ করিয়া পড়ে, ইহাঁদের বক্তৃতা আগ্রহ করিয়া শোনে, ইহাঁদের গুণগান প্রাণ খুলিয়া করে; ইহাঁদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চ আসনে লইয়া গিয়া বসায়, পথে দেখা হইলে সসম্ভ্রমে ইহাঁদিগকে পথ ছাড়িয়া দেয়; দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইহাঁদিগকে আদর করিয়া পৌরহিত্যে বরণ করে। এ সকলই করে; করে না কেবল, সত্যভাবে, ইহাঁদের অনুবর্ত্তন। যতদিন লোকের মনের সঙ্গে ইহাঁদের কথা মিলিয়া যায়, লোকের ভাবের সঙ্গে ইহাঁদের উপদেশ মিশ খায়, লোকে যাহা আপনা হইতে চাহে যতদিন ইহাঁরা সে পথে নিজেরা চলিতে ও তাহাদিগকে চালাইতে রাজি থাকেন, ততদিন ইহাঁদিগকে সকলে মাথায় করিয়া রাখে। কিন্তু মতভেদ উপস্থিত হইলেই ইহাঁদিগকে অবলীলাক্রমে, সরাসরিভাবে, ছাড়িয়া আসিতেও দ্বিধা-বোধ করে না। ইহাকে প্রকৃত লোকনায়কত্ব বলে না, বা বলা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত লোকনায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে। এক সময়ে, হিন্দু ও মুসলমান-সমাজে, যে জাতীয় লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে ক্রমশঃই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃপিতামহেরা যেভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বাস করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তাঁরাও সময় সময়, বিষয়-কর্ম্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়া দূরদূরান্তে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই থাকিতেন। যেক্ষেত্রে তাঁহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতেন, সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণগত, অন্তরঙ্গ যোগ কখনও নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে তাঁরা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, গ্রামে আসিয়া, আপনার আত্মীয়কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের মধ্যেই সে অর্থ ব্যয় করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাঁহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী হইত; সাক্ষাৎভাবে তাহারা তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার

দ্বারা সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্যলাভ করিত। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে, দোলদুর্গোৎসবাদি নৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণে, নিত্য দেবসেবা ও অতিথিসেবার ভিতর দিয়া, গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা নিকট সম্বন্ধ জমাট হইয়া যাইত। আর এই জন্য, তাঁরা যেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেন, শত শত লোকে সেখানে যাইয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইত। তাঁরা যে কাজ করিতে যাইতেন, সকলে সে কাজে রত হইত। ইঁহারা যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিনা ওজরে, বিনা বিচারে, সে পথ ধরিয়া চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোক-নেতৃত্ব ছিল। ইঁহারাই সেকালে প্রকৃত লোকনায়ক ছিলেন।

আর আজ—'তে হি নো দিবসাঃগতাঃ'। সে দিনও নাই—সে সমাজও নাই। লোকে লেখাপড়া শিখিয়া, যারা লেখাপড়া জানে না তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিতে'র, 'বিজ্ঞে'র ও 'অজ্ঞে'র মধ্যে এককালে এ সাংঘাতিক ব্যবধান ছিল না। গ্রামের বিদ্যাভূষণ বা তর্কসিদ্ধান্ত বা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে আপামর সাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁর চতুষ্পাঠীতে, যখন তিনি শিষ্যমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্মৃতি বা ন্যায়ের অধ্যাপনা করাইতেন, তখনও গ্রামের চাষী ও ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত এবং তাঁর তামাকাদি সাজিয়া, তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। তাদের সঙ্গে তাঁর বিদ্যার ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশি ছিল না। আর এই একপ্রাণতা নিবন্ধন, দেশের আপামর সাধারণে এ সকল উদারচরিত ব্রাহ্মণের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে, কথাবার্ত্তার গুণে অনেকটা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুল-পাঠশালায় মিলে না। আমরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায়, ভাবে, আদর্শে, অভ্যাসে, সকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিষ্ট লাগে না, আমাদের কথাও তাদের বোধগম্য হয় না। তাদের আমোদপ্রমোদে আমরা গা ঢালিয়া দিতে পারি না; আমাদের উৎসব-ব্যসনাদিতেও তারা আমাদের কাছে ঘেষিতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে তারা সাহস করিয়া আসে না, আমরাও আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকি না। ইংরেজকে তারা যে ভাবে দেখে, যেরূপ সম্মান করে, আমাদিগকেও প্রায় সেইরূপই করে। আর এই জন্য দেশের লোকে যেমন ইংরেজের শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু আপনা হইতে প্রাণের টানে সরকারের অনুবর্ত্তন করে না, আমাদের আন্দোলন-আলোচনা-দিতেও এখন দেশের লোকে ঠিক ঐ ভাবেই আসিয়া যোগদান করে;—খাতিরে করে, ভয়ে করে, বড়লোক ভাবিয়া আমাদের "মাস্‌মিটিংএ" আসিয়া জনতা করে, কিন্তু আপনার জন বলিয়া, অন্তরের

টানে, প্রাণের দায়ে আমাদের কাছে তারা আসে না। এ অবস্থায়, প্রকৃত লোক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভবে না।

তবে অশ্বিনীকুমারের পক্ষে ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরেজি-নবিশদিগের মত জীবনটা কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া, কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে, আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারের একবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রস্তাব হয়, এরূপ শুনিয়াছি। প্রবীণ সাহিত্যিক, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রায়ই দেওঘরে যাইয়া বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। অশ্বিনীকুমারের কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিয়া, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে এমন আত্মঘাতী কর্ম্ম করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন। অশ্বিনীকুমার যদি এ নিষেধ না শুনিতেন, আমাদের দশজনের মতন যদি তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেন, তাহা হইলে, বাংলার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার বসিয়াছেন, সে স্থান কিছুতেই পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

প্রথম যৌবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালে যাইয়া স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সে সময়ে লাট রিপন্ প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বা Local Self-governmentএর খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ দেশের ব্যবহারজীবিগণ এই স্বায়ত্তশাসনেতেই দেশের ভবিষ্যতের স্বাধীনতার পত্তন হইল ভাবিয়া উৎসাহ সহকারে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রীক্ট্‌বোর্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অশ্বিনীকুমারও সেই পথ ধরিয়াই নিজের সহরের এবং জেলার সেবাতে নিযুক্ত হন। এবং ক্রমে ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যতদূর আমার মনে আছে, বোধ হয় তিনি বহুকাল ধরিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ক্রমোন্নতি সহকারে অশ্বিনীকুমারের উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়। এবং অশ্বিনীকুমার একজন মনীষাসম্পন্ন স্বার্থত্যাগী লোকশিক্ষকের খ্যাতিলাভ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বিশেষ ভাবে আমাদের মধ্যে অল্প বেতন লইয়া উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। আজিকালি দেশে এ শ্রেণীর অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল-কলেজ হইয়াছে, কিন্তু এক বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত এই বে-সরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রায় অপর সকলেই, এগুলিকে জীবিকা-উপার্জ্জনের একটা প্রশস্ত উপায় রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা করেন নাই। সে প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে, অশ্বিনীকুমারের মতন আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশীয়-

দিগের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। এইজন্য আজি পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালনাকার্য্যে কোনও প্রকারের ব্যবসা-দারীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অশ্বিনী-কুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু ব্যসন ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন, কখনো তাহার এক কপর্দ্দকেরও প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্তযুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা পরি-মাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনী-কুমারের শিষ্যেরাই পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বদেশী যে পূর্ব্ববঙ্গে এতটা শক্তিশালী হইয়াছিল, এবং এখনো হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা। স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, অশ্বিনীকুমার কখনো এমনটা মনে করেন নাই। শিষ্যদিগের চরিত্রগঠনের জন্যও তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্রগঠনের উপায় কেবলমাত্র উপদেশ নহে, কিন্তু সদনুষ্ঠান। অশ্বিনীকুমার আপনার স্কুল ও কলেজের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্রগঠনের মূলে পরার্থ-পরতাসাধন। লোকসেবার ভিতর দিয়া যে ভাবে ও যে পরিমাণে এই পরার্থপরতাসাধন করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়ে তাহা পারা যায় না। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা দল বাঁধিয়া বরিশালের আর্ত্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বহু দিন হইতেই বরিশালে মাঝে মাঝে বিসূচিকার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকেরা সে সব সময়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে পল্লীগ্রাম হইতে বহু লোক সর্ব্বদাই বরিশালে যাতায়াত করে। বরিশাল মুসলমানপ্রধান স্থান। সহরের এই সকল অভ্যাগতদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যাই বেশী হয়। ইহারা সহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া থাকে। এই সকল হোটেলের স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই যে নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; বিশেষতঃ আপ-নার পরিবার পরিজন হইতে দূরে আসিয়া এরূপ বন্ধুহীন স্থানে বিসূচিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত না দুর্গতি হয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা সর্ব্বদা নিতান্ত আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন: ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ইহাদিগের মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপন্ন লোকের ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের মৃতদেহের সৎকার পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

সহরের বারাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত ইহাদের এই সেবা হইতে কখনো বঞ্চিত হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কখনো কোনো দিন কোনো প্রকারের জাতিবর্ণের বিচার করেন নাই। আকালে, অন্নকষ্টে, হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে ইঁহারা দেশের এবং বিদেশের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিপন্ন জনের ক্ষুন্নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের লোক-সেবা কেবল যে সহরে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বহু দিন হইতে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কতকটা নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আর কতকটা আপনার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষেও তিনি আপনার জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। এই সকল সফরের সময় দেশের গরীব লোকেরা সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য এবং সেবা পাইয়া আসিয়াছেন; অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও আসিয়াছে, শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর-মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগী ঔষধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায়, জিজ্ঞাসু উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছুই নাই, সেও তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া কেবল মাত্র কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়। সকলের অভাব বা প্রার্থনা যে তিনি সর্ব্বদা পূরণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। ভগবানের নিকটেও মানুষ সর্ব্বদা কত কি চায়, কিন্তু যাহা চায় তাহাই যে পায়, এমন নহে; তথাপি ঈপ্সিতলাভ না হইলেও, তাহাদের প্রাণে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও কতকটা তাই হয়। সকলের প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, কোনো মানুষই তাহা পারে না। তবে মিষ্ট কথায়, স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়া সকল মানুষই অপর মানুষের প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারে। অশ্বিনীকুমার এটী সর্ব্বদাই করিয়াছেন। এই জন্য বরিশালের জনসাধারণের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাঁহার একটা গভীর প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কি সহজ উপায়ে, তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটী সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে বেশী দিনের কথা নয়; স্বদেশী আন্দোলনের তখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে একটা অতি বিস্তৃত ও স্বল্প-বিত্তর সঙ্গতিসম্পন্ন নমঃশূদ্র-সমাজ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান হইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ লেখাপড়াও শিখিয়াছে। এই সকল সূত্রে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রভাবও কিয়ৎপরিমাণে এই নমঃশূদ্র-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। নমঃশূদ্রেরা কোনও বিষয়েই দেশের অপরাপর শূদ্রগণ অপেক্ষা হীন নহে; অথচ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতর

শ্রেণীর লোকেরা সচ্ছন্দে অপর শূদ্রদের জল গ্রহণ করেন; নমঃশূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। নমঃশূদ্রেরা এ জন্য আপনাদিগকে অযথা অপমানিত মনে করিয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে একটী প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশীর মুখে নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনটা বেশই বাড়িয়া উঠে। স্বদেশীদলের আত্মবিরোধ বাধাইবার জন্য স্বদেশীর বিরোধিগণ নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনে নানা ভাবে ইন্ধন প্রদান করিতে আরম্ভ করে। বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান স্বদেশসেবক নমঃ-শূদ্রকে একদিন কেহ বলেন যে, "বাবুরা ত 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া ভাই ভাই একঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাদের ভাই, কথাটী মন্দ নয়!" এ কথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খটকা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনীবাবু সেই অঞ্চলেই উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নমঃশূদ্র স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়া ছিলেন। শয্যার নিকটেই একটা ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তার পর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন—"বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন তাহাতেই, বুঝিয়াছি, 'বন্দে মাতরম্' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।" ঘটনাটী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে কি সহজ, কি সামান্য ও স্বাভাবিক উপায়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ব্রহ্মবিদ্যা *

Theosophy [গ্রীক Theos (ঈশ্বর) এবং Sophia (জ্ঞান)] বা ব্রহ্মবিদ্যা কোন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা ধর্ম্মমত নহে। ইহা কাহাকেও তাহার চিরানুসৃত ধর্ম্মমত পরিহার করিয়া নূতন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে বলে না। প্রতি ধর্ম্মের অভ্যন্তরে

* চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলন শেষ হইলে পরদিন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল। বঃ সঃ

যে অনুপম সৌন্দর্য্যভাণ্ডার রহিয়াছে, আপন জ্ঞানালোকে তাহারই সহিত ইহা পরিচয়-সাধন করিয়া দেয় মাত্র। ইহার সাহায্যে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অভ্যন্তরে অনেক নিগূঢ় সৌন্দর্য্য ও প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং যে সকল মত এতদিন ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল, তাহাদের সত্যতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ,— 'ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ মরুদ্ব্যোম্ এই মূল পঞ্চভূত লইয়াই আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতে জড়জগৎ। পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্‌গণ কিন্তু এ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ-শতাধিক মূল ভূতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের সে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্মুখে আমাদের সে ঋষি-কথিত 'পঞ্চভূত' ভ্রমাত্মক ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ধারণা জন্মাইতেছিল। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার কল্যাণে আমরা এখন জানিয়াছি- শাস্ত্রকথিত যে পঞ্চভূত তাহা পঞ্চ element নহে; যে যে বিশেষ অবস্থায় জড়পদার্থ অবস্থান করিতে পারে—অর্থাৎ কাঠিন্য, তরলত্ব, উষ্ণত্ব ইত্যাদি -"ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ" আদি সংজ্ঞা দ্বারা কেবল তাহাই মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের কাছে এতদিন এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত জড়ের অন্য কোন অবস্থা পরিচিত ছিল না। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে যে Ether (ঈথর) ও সম্প্রতি যে Etherin নামক সূক্ষ্ম পদার্থদ্বয়ের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাদের আমাদের "মরুৎ" ও "ব্যোম" সংজ্ঞার সহিত সমানার্থবাচক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ আধুনিক জড়বিজ্ঞান, বহু চেষ্টা ও চিন্তার ফলে বহুবর্ষ পূর্ব্বেকার আর্য্যঋষি-প্রচারিত সত্যগুলির পুনরাবিষ্কার সাধন করিতেছে মাত্র।

গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা "ভূর্ভুবস্বঃ" —ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক এই ত্রিলোকের সন্ধান পাই। প্রাচীন ঋষি-গণের মতে আমরা স্থূলদেহে ভূর্লোকে, সূক্ষ্মতর দেহে ভুবর্লোকে, এবং সূক্ষ্মতম (কারণ) দেহে স্বর্লোকে বিচরণ করি। স্থূলদেহে এই ভূর্লোকে অবস্থান কালেও আমরা অপর দুই লোক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি না। জাগ্রতাবস্থায় এই লোক, স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোক এবং সুষুপ্তাবস্থায় স্বর্লোকের সহিত আমরা সংযুক্ত থাকি। এতদিন আমরা এই ভূর্লোক (অর্থাৎ) স্থূলজগতকেই একমাত্র বাস্তব লোক বলিয়া মনে করিয়া আসিতাম। সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের মহাকবি Wordsworthএর জীবনীলেখক মায়ারস্ সাহেব (Mr. Myers) এ সম্বন্ধে আড়াই হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী যে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে যুক্তি, তর্ক ও গবেষণার দ্বারা তিনি ঋষিকথিত এই ত্রিলোকের কথা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই যে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সকল ইহা ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিদিগের দ্বারাই প্রথম আবিষ্কৃত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ছাড়পত্র না পাইলে আমরা সহজে এ সব কথা বিশ্বাস করিতে চাহি না—কিন্তু যাহা সত্য তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও কালবশে পুনঃ প্রকাশিত হয়—তাহা চিরকাল গুহানিহিত থাকিতে পারে না। Theosophyই ক্রমে ক্রমে

জগতের সকল ধর্ম্মের নিগূঢ়ভাব এবং সত্যতত্ত্বের উদ্ধার-সাধন করিয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য প্রদান করিবে।—সনাতন আর্য্যশাস্ত্রের অন্ধকার-নিহিত তত্ত্ব-গুলির যথার্থ স্বরূপ এইরূপে একে একে আমাদের উপলব্ধি হইতেছে। হিন্দু-শাস্ত্রের সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব থাকিলেও, সর্ব্বলোকমহেশ্বর "সর্ব্বস্য ঈশানঃ" এক ভিন্ন দুই নয় বলিয়া আর্য্যঋষিগণ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বহুদেব-পূজক বা কেবল জড়বাদী ছিলেন না; জড়ের মধ্যে সূক্ষ্মকে, বহুর মধ্যে এককে অনুভব করিয়া, সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত সর্ব্বব্যাপী সেই চিন্ময় বিষ্ণুরই তাঁহারা ধ্যান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই দৃশ্যমান গ্রহাদিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের পশ্চাতে যে অনন্তকোটি গ্রহতারামণ্ডিত অসংখ্য সৌরমণ্ডল রহিয়াছে "সেই সর্ব্ব-সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" যিনি তিনিই আমাদের একমাত্র বরেণ্য; তাঁহারই উদ্দেশ্যে ঋষিগণ বলিয়াছেন—"ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

ফলতঃ ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র পরাবিদ্যা—অপর সকল বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাভূমি। ইহারই প্রভাবে মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

বিলাতের কথা

ইংরেজ-চরিত্রের একদিক

ইংরেজের অনেক দোষ আছে, আমাদের অনেক গুণ আছে। আবার আমাদেরও বিস্তর দোষ আছে, ইংরেজেরও বিস্তর গুণ আছে। দোষে গুণে সকল মানুষ যেমন, সকল জাতিও সেইরূপ মিলিয়া মিশিয়া বিধাতার হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিলাতে যাইয়া অশেষ ব্যাপার দেখিয়া আমাদের ঘৃণা হয়, আবার অনেক ব্যাপার দেখিয়া আমাদের নিজেদের জাতের প্রতি যে একটুও লজ্জার ভাব জাগিয়া উঠে না, এমনও বলিতে পারি না। কিন্তু বহুদিন ইংরেজকে দেখিলে, ঘনিষ্ঠভাবে ইংরেজের সঙ্গে বিবিধ সামাজিক সম্বন্ধে মিলিবার মিশিবার সুযোগ পাইলে, একটা বিষয় কিছুতেই অস্বীকার করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, সেটা এই যে ইংরেজের যা কিছু দোষ, যা কিছু পাপ, যা কিছু ক্রটী-দুর্ব্বলতা থাক্ না কেন, সে যে নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা নয়, খামাকা খামাকা যে সে লোকের সঙ্গে কলহ-বিবাদ বাধায় না, ক্ষুদ্র বিষয়ে আপনাকে টানিয়া বড় করিতে যে যায় না, ইহা কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা দেবত্ব কপচাই, সনাতনী ফলাই, ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াই, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বড়াই যাই করি না কেন, মোটের উপরে আমরা ছোট, আর ইংরেজ বড়, এ কথাটা মাঝে মাঝে মনে করা মন্দ নয়।

ইংরেজ স্বার্থপর, আমরাই কি একেবারে

সকলে নিঃস্বার্থ? আমরাও স্বার্থহীন নই। অথচ ইংরেজ, স্বার্থপরতাতেও আমাদের অপেক্ষা বড় বই ছোট নয়। তার স্বার্থ-পরতার ভিতরেও একটা অদ্ভুত উদারতা আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই—ইংরেজ মাংসাশী জীব, আমাদের যেমন ভাত প্রধান খাদ্য, ইংরেজের মাংস সেইরূপ প্রধান খাদ্য। কিন্তু তথাপি মোটের উপরে ইংরেজের যে জীবে দয়া কার্য্যতঃ আমাদের অপেক্ষা একান্তই অল্প, এমন কথাই কি বলিতে পারা যায়? আমরা ইতর জন্তুকে মারিয়া খাইতে শঙ্কা বোধ করি; মাছ মাংস আহার করিতে আমাদের ভাবুকতায় আঘাত লাগে, এও একটা সংস্কার মাত্র নয় কি? কিন্তু অন্যদিকে ইংরেজ যেমন পশুর সেবা করে, আমাদের এক জৈনেরা ভিন্ন আর কেউ কি সে ভাবে সে মমতা সহকারে, পশুর সঙ্গে সে ভাবের আন্তরিক সখ্য ও সহানুভূতি স্থাপন করিয়া, কখনও পশুকুলের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে? শাস্ত্রে গো ভগবতী—বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের এক পর্য্যায়ভুক্ত; অথচ এই গো-কুলকে আমাদের রাখালেরা, গাড়োয়ানেরা এমন কি কৃষকেরা পর্য্যন্ত কত না অযথা উৎপীড়ন ও অবলীলাক্রমে কতটা অবহেলা করে, ইহাও তো একেবারেই অজানা নয়? পশুর সঙ্গে বান্ধবতা কচিৎ আমাদের মধ্যে কোনও লোকে করেন। সাধুসন্তেরা সর্ব্বদাই এটী করেন, কারণ তাঁদের সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি জন্মিয়াছে। কিন্তু গৃহস্থেরা কি করে? গো-ছাগাদিকে খামাকা তাড়া করে না, বা তাড়না করিতে দেখিলে বেদনা পায় ও তাহাতে বাধা দিতে যায়, এমন ক'টা লোক দেশে দেখিতে পাই? কিন্তু ইংরেজ চাষা তার গরু-ঘোড়া-ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের কি যে যত্ন করে, কি যে নাওয়ায় ধোওয়ায়, কি যে দলাই মলাই করে, কত যত্নে যে তাদের খট্‌খটে ঘরে শীতাতপ হইতে বাঁচাইয়া রাখে, দেখিলে আমাদের 'জীবে দয়া' পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোমুখ হইয়া যায়। আমরা মাঝে মাঝে গরুর পা পূজা করি, বৎসরে বিশেষ তিথি উপলক্ষে গোরুর গায়ে রং মাখাইয়া তাকে মালা দিয়া সাজাইয়া থাকি। কিন্তু প্রতিদিন যে তার সেবা প্রয়োজন, তাহা মনে রাখি না। তাই দেশে গোধনের এমন দুর্দ্দশা হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। যেমন গো-সম্বন্ধে সেরূপ সকল পশুসম্বন্ধেই এটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাদের পূজা আছে, আদর নাই; নৈমিত্তিক সম্বর্দ্ধনা আছে, নিত্য সেবা নাই। আমরা তাদের হাতে করিয়া একেবারে বধ করি না। কিন্তু অযত্নে, পীড়নে, ধীরে ধীরে অশেষ ক্লেশ পাইয়া তিলে তিলে মরিতে দেই এবং মারিয়াও থাকি। ইংরেজ এ সব করে না। প্রয়োজন মত, খাদ্যের প্রয়োজনে বা প্রমোদের খাতিরে, সে পশুকুলকে নিজের হাতে বধ করে। কিন্তু যতদিন না প্রয়োজন বা প্রলোভন উপস্থিত হয়, ততদিন তাহাদিগকে কি যে আদর কি যে যত্ন করে, তাদের সঙ্গে কি যে আত্মীয়তা পাতায় দেখিলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। ঘোড়াটীকে চড়িবার আগে চুম খায়। গোরুটীকে কাজে লাগাইবার পূর্ব্বে কত না তার গায়ে মৃদুভাবে হাত বুলায়। যেমন পশু-পক্ষীর সঙ্গে

ব্যবহারে, সেইরূপ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারেও, ইংরেজকে সময় সময় আমাদের অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া যে মনে হয় না, তাহা নহে। আমাদের দেশের চাকর-বাকরের সঙ্গে ইংরেজ মানুষের মত বড় একটা ব্যবহার করে না, ইহা সত্য। এর জন্য কে দায়ী তার বিচারও এখানে করিব না। কিন্তু ইংরেজ তার নিজের দেশে, নিজের জাতের লোকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে, তাই দেখিতে হইবে। ইংরেজ-সমাজ ঘড়ির কাঁটার মতন চলে। সুতরাং চাকর ও মনিবের সম্বন্ধটার ভিতরেও যে একটা পাকা নিয়মের বাঁধাবাঁধি আছে, ইহা বিচিত্র নহে। চাকর তার কর্ত্তব্য করিবে; কিন্তু সেও মানুষ তো, তারও তো আরাম-বিরামের প্রয়োজন আছে; তারও সখ আছে, সুখ আছে, সৌখিনতা আছে; আমোদ-প্রমোদের প্রবৃত্তি আছে। অতএব ইংরেজ সম্বন্ধে ইংরেজের বাড়ীতে চাকর-মনিবের সম্বন্ধের ভিতরেও এ সকলের একটা বিধি-ব্যবস্থাও আছে। রাত্রি সাড়ে নয়টার পর হইতে বাড়ীর চাকর-চাকরাণীরা স্বাধীন। তার পরে, বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে, মনিবকে নিজের কাজ নিজে করিয়া লইতে হয়। এ ছাড়া সপ্তাহে এক বেলা তাদের ছুটী আছে। রবিবারে মধ্যাহ্ন-আহারের পরে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তারা যেখানে খুসী যাইবে, সে দিনের ঐ সময়টা তার নিজের, মনিবের নয়। তার পর প্রতি মাসে সে একটা দিন পুরা ছুটী পাইবে। খাটিবার সময়, সে চাকর বা চাকরাণীর পোষাক পরিবে। চাকরাণীদের মাথায় এক রকম টুপি আছে, যার দ্বারা তারা যে চাকরাণী ইহা চেনা যায়। এই টুপি ও তার সঙ্গে সঙ্গে একটা এপ্রণ (Apron) থাকে এটা চাকরাণীদের চিহ্ন। যতক্ষণ মনিবের কাজ করে, ততক্ষণ এগুলি পরিয়া থাকিবে, না পরিলে মনিবের অবমাননা হয়। কিন্তু অন্য সময়ে, তার ছুটীর সময় সে সুন্দর জমকাল পোষাক পরিয়া, ভদ্র মেম সাজিয়া বাহির হইবে। তখন সে আর দশজন স্ত্রীলোকের মতন সম্মানও পাইবে। আমাদের দেশের চাকরবাকরের দশা অন্যরূপ। তাদের একটুকুও নিজের সময় নাই। ভোরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তারা মনিবের কাজে লাগে, আর পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, যখন যাহা হুকুম হয়, তাই তামিল করে। তারা মাসের প্রতিদিন, বছরের প্রতিমাস, যতদিন চাকরী করিবে, ততদিন সর্ব্বদাই মনিবের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবে। তাদের ডাকার সময় অসময় নাই। কাজের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এ বিষয়েও ইংরেজ আমাদের চাইতে বড় নয় কি? ইংরেজ মনিবও আমাদের চাইতে বড়, ইংরেজ চাকরও আমাদের চাকরের চাইতে বড়।

তবে এক সময়ে আমাদের দেশে ভৃত্যে ও পুত্রে আমাদের ভেদবিচার ছিল না। সে আর এক কথা। সে দিন তো আর নাই। আমি আজিকালিকার কথাই বলিতেছি, সে কালের কথা নয়।

তারপর ইংরেজ ব্যবসায়-ও-বিষয়-কর্ম্মে আমাদের চাইতে যে কত বড়, ইহার ইয়ত্তাই হয় না। কেবল বেশি টাকা

উপার্জ্জন করে বলিয়া বড় বলিতেছি না, কিন্তু মানুষের হিসাবেই বিষয়-বাণিজ্যে, ব্যবসাদিতে ইংরেজ কতটা যে বড়ও আমরা কতটা যে ক্ষুদ্র তাহার পরিমাণ হয় না। ইংরেজ ব্যবসাই করিতে চাহে, ব্যবসা করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্যই ব্যস্ত, এবং তার জন্য যা কিছু সবই করিতে প্রস্তুত ও করিয়া থাকে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতন যে ইংরেজ ব্যবসা করে, এ কথাটা বলি না। কথাটা সত্য ও নয়। আর আর দেশের বৈশ্যেরা যেমন লোককে ঠকায়, ইংরেজও তেমনি করে। ভেজাল যেমন আমাদের দেশের ব্যবসাদারেরা চালায়, ইংরেজও সেইরূপই চালায়। পাটকে রেশম বলিয়া, চর্ব্বিকে মাখন বলিয়া, কাচকে কাঞ্চন বলিয়া যতটা কাটাইতে পারা যায়, ইংরেজ সে চেষ্টা করে। কিন্তু তথাপি এর ভিতরেও একটা ভদ্রত্ব আছে, একটা মনুষ্যত্ব আছে। আজ এ সকলের কারণের সন্ধান বা আলোচনা করিব না। বস্তুটা কিরূপ তাই বলিতে ও বুঝাইতে চাই। ব্যবসায়ীরূপে ইংরেজ ঠকাক বা না ঠকাক, সত্য কথাই বলুক আর মিথ্যা ব্যবহারই করুক,—এ সকল অসত্য, অধর্ম্ম প্রায় সকল দেশের ব্যবসায়ীরাই করে,—কিন্তু মানুষ হিসাবে ইংরেজ এখানেও যে বড়, এটাই বলিতে চাই। ইংরেজ ভেজাল চালায়, কিন্তু বলিয়া কহিয়া চালায়, শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের উপরই চালায়, এক জনকে ভাল জিনিষ দিয়া আর একজনকে ভেজাল দেয়, অথচ সব ক' জনার নিকট হইতে একই দাম লয়, এটা কদাপি দেখি নাই। রাজার নিকটে যে দামে জিনিষ বেচে, গরিব প্রজার নিকটেও সেই দামই লয়। গলা দু'জনারই হয় ত কাটে; কিন্তু সমানভাবে কাটে। এ সাম্যটাই কি কম জিনিষ?

ইংরেজ কিরূপে যে ব্যবসা করে, বহু বৎসর পূর্ব্বে একদিন তার অতি সুন্দর নমুনা পাইয়াছিলাম। সেবারে আমি প্রথম বিলাতে গিয়াছিলাম। দু'বৎসর পরে দেশে ফিরিবার সময়, পথে জাহাজে ব্যবহার করিবার জন্য আমার এক জোড়া ডেক্ সু কিনিবার প্রয়োজন হয়। আমি লণ্ডনে এক জুতার দোকানে গেলাম। "ডেক্ সু আছে কি?" জিজ্ঞাসা করিলাম। "আছে বৈ কি? কত দামের দিব বলুন তো?"—সবিনয়ে দোকানী জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—"এই, খুব কমদরের—২ শিলিং ২॥০ শিলিং এর ভিতর।" "বসুন।" আমি বসিলাম। আদর করিয়া আমাকে এ ব্যক্তি বসাইল। আমি যে কত ছোট্ট খরিদদার ইহা সে জানে, কিন্তু "খদ্দের লক্ষ্মী"—এ কথাটাও সে খুবই জানে। ছোট হউক না কেন? "খদ্দের" তো। আর খদ্দের হিসাবে ছোট বড় সবই সমান। তার পর দেখিলাম সে দোকানী একই সঙ্গে ৫ জোড়া জুতা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল। এক জোড়া ২ শিলিং, এক জোড়া ২॥০ শিলিং, এক জোড়া ৩॥০ শিলিং, এক জোড়া ৫ শিলিং, আর এক জোড়া ১১ শিলিং দামের। পাঁচ জোড়াই পাশা-পাশি করিয়া রাখিল। আমি একটা একটা করিয়া সবগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া শেষে ১১ শিলিংএর জুতা জোড়া কিনিয়া লইয়া

আসিলাম। কেমন ব্যবসাদারী? আর আমাদের বেণ্টিক ষ্ট্রীটে বা চাঁদনীতে যদি ১৸০ কি ২৲ টাকার এক জোড়া জুতা চাই—প্রথমে দোকানদার তো গ্রাহ্যই করিবে না। তারপর ৸০ আনার কি ১।০ সিকের জুতা আনিয়া ২৲ কি ২॥০ টাকা চাহিয়া বসিবে। কত বচসা, কত সময়ের, কত শক্তির অপব্যয় করিয়া পরে, এক জোড়া জুতা কেনা শেষ হয়। কোনও দোকানে ভাল জিনিষ কিনিতে গেলে, দোকানী কখনই একেবারে সব চাইতে সেরা জিনিষটী বাহির করিবে না। প্রথমে ৪৲ টাকার জিনিষ বাহির করিয়া ৮৲ ৯৲ টাকা হাঁকিতে আরম্ভ করিবে। যদি বলি,—এ জিনিষ চাই না, তখন তার চাইতে একটু ভাল জিনিষ বাহির করিয়া আনিবে। এইরূপে কত সময় নষ্ট করিয়া পরে যে জিনিষটী চাই তাহা পাইতেও বা পারি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি বলিব না যে ব্যবসায়েতেও ইংরেজ আমাদের অপেক্ষা কত বড়।

তারপর ইংরেজ গ্রাহকের সঙ্গে কি ব্যবহার করে, ইহা দেখিয়াও তাহাকে বড় বলিয়া মনে হয়। গ্রাহকের নিকট হইতে সে টাকা চায়, কিন্তু খামাকা তাকে হায়রাণ বা নষ্ট করিতে চাহে না। কারো কাছে ইংরেজ টাকা পাবে, সে ব্যক্তি টাকা দিতেছে না; ইংরেজ দেখে—তার দিবার শক্তি আছে কি না। যদি থাকে, আর সে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তবে নালিশ করিয়া করিয়া তাকে নাস্তানাবুদ করিতে চাহিবে; কিন্তু যদি বুঝে তার দিবারই শক্তি নাই, তখন অনর্থক নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া, তার উচ্ছেদ করিতে কখনই উদ্যত হইবে না। সে টাকা চায়। সে গ্রাহককে উৎপীড়িত করিতে চায় না। ইংরেজ প্রত্যেক লোককেই একদিন তার গ্রাহক হইতে পারে, এ ভাবে দেখে। একদিন যে গ্রাহক ছিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে আর গ্রাহক রহিল না, কিন্তু দিন ফিরিলে সে আবার গ্রাহক হইতে তো পারে, এজন্য তাকে উৎপীড়ন বা তার সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বিবাদ করে না। নিজের লাভই সে চায়, নিজের লাভ হউক বা না হউক, পরের ক্ষতি করিতে পারিলেই তার বাহাদুরী হইল, এ ভাবটা সে পোষণ করে না। আর আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ভাবটা কত না প্রবল! এ কি ক্ষুদ্রতার, হীনচিত্ততার লক্ষণ নয়?

বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি ও নীতি দেখিয়া এই জন্যই সত্য সত্য ইংরেজের প্রতি ভক্তি হয়।

ইংরেজ পরার্থে এ সকল করে না। স্বার্থই তার লক্ষ্য। আমাদেরও লক্ষ্য তাই। কিন্তু স্বার্থটা থাকে কিসে আর যায় কিসে ইংরেজ অন্ততঃ এটী বেশ বুঝে; আমরা তাও যে বুঝি না। বিলাতে কিছুদিন থাকিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী *

প্রায় দুইশত বৎসরের পূর্ব্বেকার ফ্রান্সদেশের ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল, সূর্য্যাস্তের তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসানে নাগরিকেরা আপনাপন গৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছিল,—এমন সময় অদ্ভুতবেশ এক পান্থকে তাহাদের ক্ষুদ্র ডি—নগরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কারণও ছিল; সেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন পান্থ কদাচিৎ দেখা যায়। লোকটি মধ্যমাকৃতি, মাংসল এবং বলিষ্ঠ; যৌবনের পূর্ণতেজ তাহার শরীরে দেদীপ্যমান। বয়স আনুমানিক ছ'চল্লিশ হইতে আটচল্লিশের মধ্যে। পরিধানে তাহার বিবর্ণ পীতরঙের একটা ছিটের মোটা কোর্ত্তা,—পৃষ্ঠে একটা নূতন ভারি থলি এবং হস্তে গাঁইটযুক্ত একটা মোটা লাঠি। ছোট রূপার আংটা দ্বারা গলায় আঁটা কোর্ত্তাটির ফাঁক দিয়া তাহার বক্ষের রোমরাজি দেখা যাইতেছিল। রজ্জুর ন্যায় পাকানো একটা গলাবন্ধ তাহার গলায় ঝুলিতেছিল এবং জীর্ণ নীলবর্ণ টিকিনের ছেঁড়া পা জামাটার ভিতর দিয়া তাহার হাঁটু বাহির হইয়া পড়িতেছিল। কর্ত্তিত ক্ষুদ্র কেশ, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, রৌদ্রদগ্ধ মুখনিসৃত স্বেদধারা এবং আজানুলম্বিত ধূলিরাশি—এ সকল মিলিয়া তাহার আকৃতিকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল।

কেহই তাহাকে চিনিত না। ডি—নগরের মধ্য দিয়া সে আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইতেছিল মাত্র। হয়ত সমস্তদিন তাহার পদব্রজেই কাটিয়াছে—তাহাকে এতই ধূলিধূসরিত ও ক্লান্ত দেখাইতেছিল। আহার্য্যও বোধ হয় তাহার সারাদিন জোটে নাই, তাহা না হইলে সহরে ঢুকিয়া 'গ্যালেণ্ডি বুলিভার্দ' ও বাজারের ফোয়ারা হইতে দুই দুইবার সে আকণ্ঠ জলপান করিবে কেন?

পয়টিভার্ট রাস্তার মোড়ে আসিয়া লোকটি নগরাধ্যক্ষের (Mayor) অফিসের দিকে ফিরিল। মিনিট পনের পরই সে অফিস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, দরজায় প্রহরীকে দেখিয়া টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল। প্রহরী প্রতিনমস্কার না করিয়া স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সে সময় ডি—তে জাকুইন ল্যাবারের ক্রুশচিহ্নিত বেশ ভাল একটা সরাই ছিল। গাইড সেনাদলের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং গ্রেনোবলের "তিন গডলফিন" নামক সরাইয়ের অধ্যক্ষ সম্রাটানুগৃহীত অপর এক ল্যাবরের আত্মীয় বলিয়া ডি—তে জাকুইনের বেশ সম্মান ছিল। কাজেই সরাইখানার মর্য্যাদা (good name) রক্ষার প্রতি তার একটু বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

আগন্তুক দরজা ঠেলিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল তখন জাকুইন—সরাইয়ের প্রধান পাচক—গাড়োয়ানদের জন্য কড়াইতে

* লে মিজারেবল অবলম্বনে।

মাংস সিদ্ধ করিতেছিল। সমস্ত উনানগুলি জ্বলিতেছিল এবং অগ্নিকুণ্ডে আগুন গম্‌গম্‌ করিতেছিল। পার্শ্বের কক্ষে গাড়োয়ানেরা মনের স্ফূর্ত্তিতে গান ধরিয়াছিল।

"কি চান মশায়?"—দরজা খোলার শব্দে জাকুইন নূতন যাত্রী আসিয়াছে বুঝিয়া মাথা না তুলিয়াই তাহার অভ্যস্ত প্রশ্ন করিল।

আগন্তুক উত্তর করিল—"রাত্রিতে খাবার আর থাকবার সুবিধা হবে কি?"

"তা হ'তে পারে"—বলিয়া গৃহস্বামী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। অতিথির সে দীন বেশ দেখিয়া পাওনা গণ্ডা আদায়ের সম্বন্ধে একটু সন্দিহান হইয়া সে শুধাইল—"খরচ পত্র আছে ত?"

আগন্তুক তাহার কোর্ত্তার জেব হইতে একটা ভারি থলি বাহির করিয়া বলিল "টাকা আমার আছে। আপনার সে চিন্তা নাই।" "আচ্ছা মশায় তবে বসুন" বলিয়া জাকুইন তাহাকে একখানা আসন দেখাইয়া দিল।

তখন লোকটি থলিটা জেবের মধ্যে পুরিয়া, পিঠ হইতে ভারি ব্যাগটা দরজার কাছে মাটির উপর নামাইয়া, রাখিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে একটা ছোট টুলের উপর বসিয়া পড়িয়া আগুণ পোহাইতে লাগিল। ডি—সহরটা পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত, অক্টোবর মাসে সন্ধ্যার সময় সেখানে বেশ একটু শীত পড়ে।

রান্নার কাজের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে জাকুইন আগন্তুকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিল।

"খাবার কি শীঘ্র পাব, মশায়?"

পথশ্রমে আগন্তুক খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই কিয়ৎক্ষণ পরেই সে জিজ্ঞাসা করিল—"খাবার কি শীঘ্র পাব মশায়?"

"এখনি পাবেন।" বলিয়া গৃহস্বামী পুরাতন একখণ্ড খবরের কাগজের টুকরা লইয়া তাহাতে কি লিখিয়া একটা চাকরের হাতে দিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। ছোঁড়াটা সেই কাগজের টুকরা লইয়া নগরাধ্যক্ষের বাটীর দিকে ছুটিয়া গেল। আগন্তুক এ সকলের কিছু লক্ষ্য করে নাই; সে পিছন ফিরিয়া আগুণ পোহাইতেছিল, আর কেবলি খাবারের তাগাদা দিতেছিল। খানিকক্ষণ পরেই ছোঁড়াটা জবাব লইয়া ফিরিল। তাহাতে একটু গোলের কথা ছিল। সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গৃহস্বামী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তার পর, মন স্থির করিয়া আগন্তুকের কাছে গিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"মশায়, এখানে আমি আপনাকে স্থান দিতে পারি না।"

লোকটা তখন কি যেন একটা সুখের ঘোরে মগ্ন ছিল; সহসা সন্ত্রস্ত হইয়া সে ফিরিয়া বসিল।—

"বলেন কি মশায়? আপনি কি ভাবেন আমি আপনাকে ফাঁকি দিব? খরচার টাকা যদি আগামই চান, না হয় দিচ্ছি। আমার কাছে টাকা আছে।"

"কথাটা ঠিক তা নয়।"

"তবে কি?"

"টাকা আপনার আছে, তা জানি।"

"তবে ?"

"খালি ঘর আমার এমন একটাও এখন নাই যেখানে আপনি শুতে পারেন।"

লোকটি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিল—"ঘোড়শাল ত আছে ?"

"সেখানে ত জায়গা নেই।"

"কেন ?"

"ঘোড়াতে ঘর ভর্ত্তি হয়ে গেছে।"

"মাচানের কোণে আমাকে না হয় একটু স্থান আর বিছানার বদলে ২।১ আঁটি খড় দেবেন। তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।—আচ্ছা, সে যা হয়, খাওয়ার পর দেখা যাবে।"

"কিন্তু খাবারও আপনাকে আমি কিছু ত দিতে পারব না।"—গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর এবার কিছু দৃঢ়তাব্যঞ্জক। আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইল।—

"কি পাগলের মত বলছেন ? ক্ষুধায় আমি মারা যাচ্ছি,—আর আপনি কি না বলেন যে খাবার দিতে পারব না! সূর্য্যোদয় থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ পথ হেঁটে আসছি, তা জানেন ?—দাম যখন আমি দিচ্ছি তখন খাবার আপনার দিতেই হবে।"

"খাবার আমার নেই।'

"সেই কি রকম? –ও সব গুলা কি ?"—বলিয়া সে পাত্রস্থ মাংস প্রভৃতির প্রতি চাহিল।

"ওসব ফরমাইসী।"

"কাদের ?"

"গাড়োয়ানদের।"

"তারা ক'জন আছে ?"

"বার জন।"

"বিলক্ষণ! যা রয়েছে ও ত অন্ততঃ কুড়ি জনের খোরাক।"

আগন্তুক পুনরায় চাপিয়া বসিল। স্থির স্বরে বলিল—"আমি সরাইখানায় এসেছি; আমি ক্ষুধার্ত্ত;—খাবার না পেলে এখান থেকে আমি এক পাও নড়ব না।"

গৃহস্বামী তখন মুখ নীচু করিয়া কঠোর স্বরে তাহার কাণে কাণে বলিল—"এখান থেকে চলে যাও।"

আগন্তুক ছড়ির অগ্রভাগ দিয়া আপন মনে অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে ইতস্ততঃ উল্টাইয়া দিতেছিল। সে গম্ভীর স্বরে চমকিত হইয়া সে কি বলিতে যাইতেছিল, গৃহস্বামী তাহাতে বাধা দিয়া পূর্ব্ববৎ মৃদু অথচ স্থির স্বরে বলিল—"আর ভাঁড়াভাড়িতে কাজ নেই। তুমি কে, তোমার কি বৃত্তান্ত সবই আমি জানি। তোমার নাম জীন ভ্যালজিন। তোমাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই পুলিস অফিসে লোক পাঠিয়েছিলাম। পড়তে পার কি?—এই দেখ তারা কি লিখেছে"—বলিয়া সে কাগজের টুকরাটি আগন্তুকের হাতে দিয়া বলিল—"আমি সবারই সঙ্গে ভদ্রব্যবহার করে থাকি, তাই ভদ্রভাবেই বলছি—তুমি অন্য আশ্রয় দেখ।"

লোকটি আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া ভূমি হইতে আপনার ব্যাগটি উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অপমানিত দীন জীন পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহের পার্শ্ব দিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতে লাগিল—একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল না;—চাহিলে, দেখিতে পাইত—

কলবাস ক্রুশের অধিস্বামী তাহার অতিথিবৃন্দ এবং রাস্তার লোকদের লইয়া সরাইখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আগ্রহসহকারে কি সব কথা বলিতেছে; এবং সমবেত জনমণ্ডলীর উৎকণ্ঠা-জড়িত ও ভীতিবিহ্বল মুখ দেখিয়া সহজেই সে অনুমান করিতে পারিত যে সমস্ত সহরে তাহার আগমনবার্ত্তা অচিরেই একটা আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিবে। তাহার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে সে ইহার কিছুই দেখিতেছিল না। নির্য্যাতিত মানব পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহে না, কারণ সে জানে দুর্ভাগ্য অনুক্ষণ তাহার অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে।

এই ভাবে অনেকক্ষণ অজানা পথে পথে সে ঘুরিল। দুঃখের সময় শ্রান্তির কথা তত মনে আসে না—তাহারও তাহাই হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ কতক্ষণ যুঝিতে পারে? সহসা সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল; তার উপর, রাত্রিও বেশী হইতেছিল—কাজেই সে একটা আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহরের বড় সরাইখানার দ্বার ত তাহার কাছে রুদ্ধ—একটা তাড়িখানা বা নিকৃষ্ট কোন স্থানেও একটু আশ্রয় পাইলে যে সে বাঁচে! রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা আলো দেখিয়া জীন সেইদিকে অগ্রসর হইল। সেটা একটা মদের দোকান—তাহার শিরোদেশস্থ লোহার শিক হইতে একটা দেবদারুর ডাল গোধূলির আলোকে যেন আকাশ গাত্রে দুলিতেছিল।—জানালার বাতায়ন উন্মুক্ত ছিল—পথ হইতে জীন দেখিল—এখানে একটা টেবিলকে ঘিরিয়া বসিয়া কতকগুলা লোক মদ খাইতেছে; ওখানে আগুণের উপর, লোহার শিক হইতে ঝোলান একটা কড়াইতে কি সিদ্ধ হইতেছে; একটু দূরে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া গৃহস্বামী আগুণ পোহাইতেছে। বুভুক্ষু জীন এ দৃশ্যে লুব্ধ হইল; তবু সদর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে তার সাহসে কুলাইল না; পার্শ্বে সারকুড়ের দিকে যে আর একটা দরজা ছিল সেখানে যাইয়া, কি ভাবিয়া একটু থামিল; তারপর, সন্তর্পণে খিল খুলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল।

"কে তুমি?"

"আমি পথিক। রাত্রিটার মত খাবার ও থাকবার স্থানের প্রার্থী।"

"বেশ, এস। এখানে তা দুইই পাবে।"

ভিতরে আসিয়া আগন্তুক (এখন হইতে আমরা তাহাকে জীন নামেই সম্বোধন করিব) পিঠের থলিটি নামাইয়া একটা কেদারায় বসিয়া পড়িল। মদ্যপায়ীরা ঔৎসুক্যের সহিত তাহার রকম সকম লক্ষ্য করিতেছিল। গৃহস্বামী বলিল—"ওই মাংস ফুটছে। এস ভাই আগুণের কাছে বসে শরীরটাকে একটু গরম করে নাও।"

সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া জীনের পা দু'টা ফুলিয়া উঠিয়াছিল—অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে পা দু'টাকে ছড়াইয়া দিয়া সে একটু আরাম অনুভব করিল। উনানের উপর কড়াই হইতে একটা মধুর গন্ধ আসিতেছিল। তাহার পাটল মুখের উপর কি যেন একটা আরামের আবেশ ধীরে ধীরে ছাইতেছিল; অবশ্য দুঃখে কষ্টে মানুষের মুখে স্বাভাবিক যে একটা করুণ ভাব আসে তাহাও তাহার

সহিত মিশ্রিত ছিল। সে মুখাবয়ব দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পব্যঞ্জক অথচ দীনতাপূর্ণ,—একটু অদ্ভুত রকমের;—আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহা করুণ কিন্তু ক্রমশঃই কঠোর ও পরুষ বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে; ভ্রূর নিম্নে তাহার প্রোজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় গোধূলিতে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিত। সমবেত লোকগুলির মধ্যে একটী ধীবর ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনই প্রাতে পথে কোন একস্থানে তাহার সহিত জীনের দেখা হয়। ধীবর ঘোটকারোহণে আসিতে-ছিল; ক্লান্ত জীন তাহাকে তাহার ঘোটকের উপর তুলিয়া লইতে বলায় ভীত হইয়া, সে বরং আরও জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহার কাছ হইতে পলাইয়া আসে। এই লোকটা আধঘন্টা পূর্ব্বে ল্যাবারের সরাইখানায় ঘোড়া রাখিতে যায় এবং সেখানে আগন্তুকের সম্বন্ধে নানা আলোচনার মধ্যে প্রাতঃকালের এ ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়া আসে। জীনকে এখানে দেখিয়া সে ইসারা করিয়া গৃহস্বামীকে ডাকিল; দুইজনে চুপিচুপি কি পরামর্শ হইল। জীন তখন আপন চিন্তায় তন্ময় হইয়া ছিল।

সহসা পৃষ্ঠদেশে কাহার কঠিন হস্তস্পর্শে জীন চকিত হইয়া উঠিল।

"—দেখ, এখান থেকে তোমার অন্যত্র যেতে হচ্ছে।"

মুখ ফিরাইয়া ধীর স্বরে সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি জান, দেখ্‌ছি!"

"হাঁ, জানি।"

"সে সরাইখানা থেকে আমি তাড়িত হয়েছি।"

"এখান থেকেও হবে।

"তবে কোথায় এখন যাই?"

"যেখানে ঠাঁই পাও।"

নিঃশব্দে আপন ব্যাগ ও লাঠি লইয়া জীন উঠিয়া পড়িল। কতকগুলা পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলে মেয়ে 'কলবাস ক্রশ' হইতে তাহার পিছু লইয়াছিল, এখন পথে বাহির হইতেই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভীষণ মুখ করিয়া জীন সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল, ছেলের দল অমনি বেগতিক দেখিয়া, পাখীর ঝাঁকের মত, নিমেষে চম্পট দিল।

জীন সম্মুখদিকেই চলিতে লাগিল। হায়, বুভুক্ষু আশ্রয়হীন সমাজ-বিচ্যুত দুর্ভাগা কোথায় সে যাইবে? কোথায় তার আশ্রয়?

(ক্রমশঃ)

রহস্য

দূরে সে মিলায় যত, ধাই তার পানে তত,
এমনি রহস্য-ঘেরা মানব-জীবন;
কাছে আসে যেই দিন—ব্যর্থ সে, বৈচিত্র্য হীন,
তবু, দূরে, তারি পানে পুনঃ ছোটে মন!

শ্রীসুধীর চন্দ্র মজুমদার।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

পঞ্চদশ অধ্যায়

নগর-কীর্ত্তন ও কাজীদমন

রাত্রিকালে রুদ্ধদ্বার গৃহে ভক্তগণ সহ গৌর সংকীর্ত্তন করিতেন—ইচ্ছা থাকিলেও সকলে তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু দিবাভাগে দলে দলে লোক নানাবিধ উপায়ন সহ গৌরের দর্শনার্থ উপস্থিত হইত। গৌর সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তির উপদেশ দিতেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"

এই মন্ত্র জপ করিতে সকলকেই উপদেশ দিয়া গৌর কহিতেন,—"তোমরা দশ পাঁচ জনে মিলিয়া স্বীয় দ্বারে বসিয়া হাততালি দিতে দিতে কীর্ত্তন করিবে

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'

স্বামিস্ত্রী পিতাপুত্র মিলিয়া ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর।" গৌরের উপদেশ-মত পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন আরব্ধ হইল। ঘরে ঘরে দুর্গোৎসবের সময় ব্যবহারার্থ যে সমস্ত মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ ছিল, কীর্ত্তনের সময় তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥

সমগ্র নবদ্বীপ কীর্ত্তনের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। একদিন নবদ্বীপের কাজী নগরভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মান্ধ কাজী কীর্ত্তনকারিগণকে ধরিয়া আনিবার জন্য অনুচরগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। নাগরিকগণ ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। তদবধি কাজী প্রত্যহ নগরে বহির্গত হইয়া যেখানে কীর্ত্তন শুনিতে পাইতেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং জোর করিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। বৈষ্ণবদ্বেষিগণ পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ পরিহাস করিতে লাগিলেন। একদিন বহুসংখ্যক লোক গৌরের নিকট গমন করতঃ কাজীর অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভক্তের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গৌরের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি নাগরিকগণকে কহিলেন,"যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়া মনের সুখে কীর্ত্তন আরম্ভ কর। আজি সমগ্র নবদ্বীপে আমি কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব, কাজীর

ক্ষমতা থাকে, তাহার প্রতীকার করুক। আজ সন্ধ্যাকালে যেন নবদ্বীপের যাবতীয় গৃহ আলোকমালায় বিভূষিত হয় এবং সকলেই যেন আমার সহিত কীর্ত্তনে বহির্গত হয়।" ভক্তগণ মহোল্লাসে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালে গৌর কীর্ত্তনকারিগণকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া অদ্বৈত ও শ্রীবাসকে দুই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দান করিলেন এবং নিত্যানন্দ সহ স্বয়ং তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক মশাল হস্তে রাস্তায় বাহির হইল। দীপালোক-সমুজ্জ্বল নবদ্বীপ তখন স্বর্গীয় শোভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। প্রকাশ্য রাজপথে গৌর ও তদীয় ভক্তগণের প্রেমপুলকোজ্জ্বল কান্তি ও নৃত্য দর্শন করিয়া সমগ্র নবদ্বীপ বিমোহিত হইল; কাজীর ভয় আর রহিল না। লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনি আকাশমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

"তুয়া মন লাগহুঁ রে, শারঙ্গধর,
তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥"

গায়িতে গায়িতে ভক্তগণ গৌরচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইলেন। গৌর বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল জনসঙ্ঘ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবদ্বেষিগণ সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

জনকোলাহল দূর হইতে কাজীর কর্ণে পৌঁছিল। কাজী ভৃত্যমুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। জনকোলাহল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সেই বিপুল জনশ্রেণী অবশেষে কাজীর দ্বারে সমাগত হইল। কাজী গৃহমধ্যে পলায়ন করিলেন। উন্মত্ত নাগরিকগণ কাজীর পুষ্পোদ্যান ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। গৌর কাজীর দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইয়া জনৈক ভক্ত লোক দ্বারা কাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী বাহিরে আসিয়া সসম্মানে গৌরকে নমস্কার করিলেন। গৌর তাঁহাকে সম্মানের সহিত নিজ পার্শ্বে বসাইয়া পরিহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অভ্যাগত আমাকে দেখিয়া তুমি পলায়ন করিলে, এ তোমার কিরূপ ধর্ম্ম বল দেখি?"

কাজী কহিলেন,—"তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ দেখিয়া তোমাকে শান্ত করিবার জন্য আমি লুকাইয়াছিলাম।"

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হইতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥"

তখন বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে নানা কথার আলোচনা হইল। গৌর কহিলেন—"দেখুন, গাভীর দুগ্ধ পান করি বলিয়া তাহাকে মাতা বলা যায়; বৃষ হইতে অন্নের উদ্ভব হয় বলিয়া বৃষ পিতার ন্যায় পূজ্য। আপনারা এতাদৃশ গাভী ও বৃষ সংহার করিয়া ভক্ষণ করেন কেন, বলুন দেখি?"

কাজী কহিলেন—"শাস্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ এই দ্বিবিধমার্গের উল্লেখ আছে। নিবৃত্তিমার্গাবলম্বিগণের পক্ষে জীব-বধ নিষিদ্ধ। প্রবৃত্তিমার্গে গোবধে নিষেধ নাই। কেন, তোমাদের বেদেও ত গোবধের বিধি আছে।"

গৌর কহিলেন—"বেদে গোবধ নিষিদ্ধ। তবে প্রাচীন ঋষিগণ যজ্ঞার্থে বৃদ্ধ গো বধ করিতেন বটে। কিন্তু যজ্ঞান্তে তাঁহারা নিহত স্থবির বৃষদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া নব যৌবন দান করিতেন। তাহাতে তাহাদের উপকারই হইত।"

তখন কাজী পরাস্ত হইয়া কহিলেন,—

"তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥"

তখন কাজীকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মামা', তোমার আদেশে নবদ্বীপে কত মৃদঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছে, তোমার অনুচরগণ কতদিন জোর করিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিয়াছে, আজি তুমি কীর্ত্তনে বাধা দিতেছ না, ইহার কারণ কি বল দেখি?"

তখন কাজী বলিতে লাগিলেন—"সে বড় নিগূঢ় কথা। যে দিন আমি হিন্দুর গৃহে গৃহে মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছিলাম, সেই দিন রাত্রিতে এক ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই নরসিংহ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া আমার দেহোপরি উপবিষ্ট হইয়া অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিল এবং আমার বক্ষঃস্থলে নখ প্রদান করিয়া বলিতে লাগিল,—'যেমন মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছ, আমিও তেমনি তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিব। তুমি আমার কীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছ—আমি তোমাকে নাশ করিব।' আমি ভয়ে চক্ষু মুদিত করিলাম। আমাকে ভীত দেখিয়া সিংহ কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন,—'তোমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই আমি আবির্ভূত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণের উপর তোমার উৎপাত মাত্রাধিক হয় নাই, তাই তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে পুনরায় ঐরূপ আচরণ কর, তবে সবংশে নিহত হইবে।' এই দেখ, সিংহের নখচিহ্ন এখনও আমার বুকে রহিয়াছে।" কাজী তখন বক্ষাবরণ উন্মোচিত করিয়া নখচিহ্ন দেখাইলেন; দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

কাজী পুনরায় কহিতে লাগিলেন "আমি এ কথা কাহাকেও বলি নাই। একদিন এক ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, সংকীর্ত্তন নিষেধ করিতে গিয়া হঠাৎ কোথা হইতে অগ্নির উল্কা মুখে লাগিয়া তাহার মুখ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি কীর্ত্তন নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যাহার করিলাম। তখন দলে দলে মুসলমান আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'হিন্দুগণ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে—তুমি যদি তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব না কর, তাহা হইলে পাতশা তোমার দণ্ডবিধান করিবেন।' আমি বলিয়া কহিয়া সকলকে ঘরে পাঠাইয়া দিলাম কিন্তু অচিরকাল পরেই কয়েক জন বৈষ্ণবদ্বেষী হিন্দু আসিয়া আমাকে বলিল, 'নিমাই পণ্ডিতের অত্যাচারে আমরা রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে পারি না। যত পাষণ্ড মিলিয়া হিন্দুধর্ম্ম নাশ করিতেছে। তুমি নিমাইকে ডাকাইয়া ইহার প্রতিবিধান কর।' আমি সকলকে মিষ্টবাক্যে বিদায় করিলাম। আমি বুঝিতে পারিয়াছি তুমি ঈশ্বর—নারায়ণ।" গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কাজী! তুমি পুণ্যবান্, তাই শ্রীকৃষ্ণে তোমার ভক্তি হইয়াছে।" গৌরের মধুর-বচনে কাজীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে

লাগিল। গৌরের চরণ ধারণ করিয়া তিনি নানারূপ স্তব করিতে লাগিলেন। গৌর তখন কাজীকে কহিলেন, "তোমার নিকট আমার এক অনুরোধ আছে। নদীয়ায় যেন সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধকতা না হয়।"

কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন বাধিতে॥

বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে "হরি" "হরি" করিয়া উঠিলেন। তখন কাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ সহ গৌর বহির্গত হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

লীলা

শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন হইত। গৌরের অনুমতি বিনা কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। শ্রীবাসের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর একদিন কীর্ত্তন শুনিবার ও ভক্তগণের নৃত্য দেখিবার সাধ হইল। নৃত্য ও কীর্ত্তন আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীবাস পরিবারবর্গকে গৃহান্তরে যাইবার আদেশ করিতেন। ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় শ্রীবাসের শাশুড়ী একদিন পূর্ব্বাহ্নে এক ডোলের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিলেন। যথাকালে নৃত্য ও কীর্ত্তন আরব্ধ হইল। কিন্তু নাচিতে নাচিতে গৌর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "আজি নৃত্যে আমার তাদৃশ আনন্দ হইতেছে না কেন? বোধ হয়, কে কোথায় লুকাইয়া আছে।" শ্রীবাস অঙ্গনোপরিস্থ সমস্ত ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কই, বাজে কেহই ত নাই।" গৌর তখন পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্ষণিক পরেই বিরত হইয়া বলিলেন,—"না, আজি নৃত্যে সুখ নাই; কৃষ্ণ আজি আমার প্রতি বিরূপ।" গৌরের সুখের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া শ্রীবাস পরম উদ্বিগ্নচিত্তে তন্ন তন্ন করিয়া ঘর খুঁজিতে লাগিলেন, পরিশেষে স্বীয় শাশুড়ীকে ডোলের পশ্চাতে লুক্কায়িত দেখিতে পাইয়া অন্য একজন দ্বারা সবলে তাঁহাকে বাহিরে আনয়ন করাইলেন। তখন উল্লসিত-চিত্তে গৌর নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় গৌর কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না। বরং ভক্ত দেখিলেই সসম্ভ্রমে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। ইহাতে ভক্তগণ মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইতেন। গৌর যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, তখন মনের সাধে তাঁহারা তাঁহার চরণ-সেবা করিতেন। একদিন নৃত্য করিতে করিতে গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, অদ্বৈত তাঁহার চরণধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। মূর্চ্ছান্তে গৌর পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন—কিন্তু অচিরেই নৃত্য হইতে বিরত হইয়া বলিলেন,—"কেন আজ কৃষ্ণ আমার চিত্তে প্রকাশিত হইতেছেন না? কাহার অপরাধে আমার মনে উল্লাস আসিতেছে না? কোন্ চোরে আমার কি চুরি করিয়াছে? কেহ কি আমার পদধূলি লইয়াছে? সত্য করিয়া বল।" গৌরের বচন শুনিয়া ভক্তগণ ভয়ে মৌন হইয়া রহিলেন। অবশেষে অদ্বৈতাচার্য্য যুক্তকরে কহিলেন,—"লোভের বস্তু প্রকাশ্যে না পাইলেই লোকে চুরি করে। আমি চুরি করিয়াছি—আমায় ক্ষমা কর। তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে আর তোমার পদধূলি লইব না।"

গৌর বিষম রুষ্ট হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন,—"সকল সংসার সংহার করিয়াও তোমার মনে শান্তি নাই ; আমিই কেবল অবশিষ্ট আছি, আমাকেও সংহার করিয়া তুমি সুখে থাক। যে তোমার নিকট কৃতার্থ হইতে আসে, তাহার চরণ ধরিয়া তুমি তাহার সর্ব্বনাশ কর। মথুরায় এক বৈষ্ণবের চরণধূলি লইয়া তাহার যাবতীয় শক্তি তুমি হরণ করিয়াছিলে। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভক্তির অধিকারী হইয়াও তুমি মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির ভক্তির প্রতি লোভ সংবরণ করিতে পার না। ক্ষুদ্রের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্রও করুণা নাই। তুমি মহাচোর, মহাদস্যু ; তুমি আমার প্রেম-সুখ হরণ করিয়াছ। আমি কিন্তু আজ চোরের উপর বাটপাড়ী করিব।" এই বলিয়া সবলে অদ্বৈতকে ধরিয়া গৌর আপনার মস্তকে তাঁহার চরণ স্থাপন করিলেন। তখন কীর্ত্তন ও নৃত্যে শ্রীবাস-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

একদিন গৌর নগরভ্রমণে বহির্গত হইলে পথিমধ্যে কয়েকজন পাষণ্ডীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পাষণ্ডিগণ কহিল, "নিমাই পণ্ডিত, নিশাভাগে তুমি লুকাইয়া কীর্ত্তন কর ; লোকে দেখিতে পায় না—কিন্তু অনুক্ষণ তোমায় অভিসম্পাত করে। তাহাদের শাপ ফলিয়াছে। তোমাকে ধরিয়া লইবার জন্য সত্বরই রাজার লোক আসিতেছে।" গৌর নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, "রাজদর্শন করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে আমার আছে। অল্পবয়সে সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বালক-বোধে কেহই আমাকে গ্রাহ্য করে না, কেহই আমার খোঁজ করে না। রাজা আমাকে খুঁজিতেছেন—এ সংবাদে আমি প্রীত হইলাম।"

পাষণ্ডিগণ কহিল,—"যবন রাজা পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না।"

গৌর অবজ্ঞাভরে আর প্রত্যুত্তর না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং সমাগত ভক্তগণকে কহিলেন,—"আজি পথে পাষণ্ড-সম্ভাষ হইয়াছে ; সংকীর্ত্তন আরম্ভ কর ; দুঃখ দূর হউক।"

নৃত্য আরম্ভ হইল, কিন্তু থামিয়া থামিয়া গৌর বলিতে লাগিলেন—"কই, আজি ত প্রেমানুভব হইতেছে না। পাষণ্ডিসম্ভাষ হইয়াছে বলিয়াই কি আজ প্রেমের প্রকাশ হইতেছে না? অথবা তোমাদের নিকট আমার কিছু অপরাধ হইয়াছে?" তখন অদ্বৈতাচার্য্য ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন,—"প্রেম আসিবে কোথা হইতে? নাড়া সব শুষিয়া লইয়াছে। আমি প্রেম পাই না, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেম পান না, কিন্তু তিলি মালীর সঙ্গে অনবরত প্রেম-বিলাস চলিতেছে। শ্রীবাস ও আমি কেহই তোমার প্রেমের অধিকারী হইলাম না, আর কোথা হইতে এক অবধূত আসিয়া তোমার প্রেমের ভাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইল। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতেছি, আমাকে প্রেমযোগ দান না করিলে আমি তোমার সকল প্রেম শুষিয়া লইব।"

গৌর কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না—কিন্তু ত্বরিতগমনে দ্বার উন্মোচন করিয়া গঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং "প্রেমহীন শরীর রাখিয়া কি কাজ" বলিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন। গৌর কহিলেন—"কেন আমাকে টানিয়া তুলিলে?"

নিতাই কহিলেন, "মরিতে চাহ কেন?"

গৌর—তুমি ত সব জান।

নিতাই—প্রভু ক্ষমা কর। যাহাকে স্বহস্তে শাস্তি দিতে পার, তাহার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে চাও? ভৃত্য যদি অভিমানবশতঃ কিছু বলিয়া থাকে, তজ্জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া কি ভৃত্যের প্রাণদণ্ড করিবে?

বলিয়া নিত্যানন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। তখন গৌর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিলেন,—"আমার কথা কাহাকেও বলিও না; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, আমার সহিত তোমাদের দেখা হয় নাই। আমার আজ্ঞায় এই কথা বলিও। আজি আমি কোথাও লুকাইয়া থাকিব।" তখন নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া গৌর লুকাইয়া রহিলেন। এ দিকে ভক্তগণ প্রভুর সন্ধান না পাইয়া শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈত মহা অপ্রতিভ হইয়া গৌর-বিরহে উপবাসী রহিলেন।

সমস্ত রাত্রি নন্দনাচার্য্যের গৃহে অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে গৌর শ্রীবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রীবাসের নিকট অদ্বৈতের মানসিক অবস্থার সংবাদ পাইয়া কৃপাপরবশ হইয়া গৌর অদ্বৈতের নিকট গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, অদ্বৈত মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত আছেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন "আচার্য্য! উঠিয়া দেখ, আমি আসিয়াছি।" আচার্য্য সংজ্ঞালাভ করিলেন। কিন্তু লজ্জায় তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। গৌর পুনরায় কহিলেন,—"আচার্য্য! কষ্ট করিও না উঠিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন কর।" তখন

অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বোল মোরে সব প্রভু বাহ্য॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি॥
সভাবে উত্তম দিয়া আছ দাস্য-ভাব।
মোরে দিয়াছ হে প্রভু, যত কিছু রাগ॥
লওয়াও আপনে দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বোল তুমি, কর আর মনে॥
প্রাণ, দেহ, ধন, মন, সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দেহ ঠাকুরালি তোর॥
হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া॥

তখন গৌর কহিলেন, "আচার্য্য! মহাপাত্র অপরাধ করিলে রাজা স্বহস্তে তাহার দণ্ডবিধান করেন। সকলের হর্ত্তা ও কর্ত্তা রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও শিবকে সৃষ্টি ও সংহার করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকিলেও, তাঁহারা অপরাধ করিলে তাঁহাদিগের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। অপরাধ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যাহার শাস্তিবিধান করেন, সে তাঁহার জন্ম জন্ম দাস। এই পরমতত্ত্ব আজি তোমাকে আমি কহিলাম। এখন গাত্রোত্থান করিয়া স্নান ও আরাধনাদি কর। তখন আচার্য্য হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া উঠিলেন এবং "সবই প্রভু তোমার ঠাকুরালি" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

একদিন গৌরের নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা ব্যক্ত হইবামাত্র পরম ভক্ত বুদ্ধিমন্ত খান নাট্যের সাজসজ্জার আয়োজনের ভার গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বিস্তৃত অঙ্গন রঙ্গভূমিস্বরূপে

নিরূপিত হইল। অভিনয়ের আয়োজন সমস্ত শেষ হইলে গৌর বৈষ্ণবদিগকে কহিলেন, 'আজি আমি প্রকৃতিরূপে নৃত্য করিব। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সে নৃত্য দেখিবার অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়ধারণে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারাই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবেন।" গৌরের লক্ষ্মীবেশে নৃত্য দর্শনাশায় ভক্তগণ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; কিন্তু গৌরের কথায় সকলেই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই আচার্য্য কহিলেন, "ইন্দ্রিয় ধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমি এখনও লাভ করিতে পারি নাই, আমি রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিব না।" শ্রীবাস পণ্ডিত কহিলেন, "আমারও সেই কথা।" একে একে সকলেই বলিয়া উঠিলেন, 'আমারও ঐ কথা।" তখন গৌর হাসিয়া কহিলেন, 'তোমরা না গেলে কাহাকে লইয়া নৃত্য হইবে? কিছু চিন্তা নাই; আজি সকলেই তোমরা মহাযোগেশ্বর হইবে; আমাকে দেখিয়া কেহই মুগ্ধ হইবে না।" অনন্তর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া গৌর চন্দ্রশেখর আচার্য্যের অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। শচীদেবী পুত্রবধূসহ পুত্রের নৃত্য দেখিতে আগমন করিলেন। বৈষ্ণবগণের গৃহলক্ষ্মীগণ সকলেই শচীমাতার সহিত তথায় গমন করিলেন।

প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্য বিদূষকবেশে নৃত্য করিলেন। অনন্তর বৈকুণ্ঠের কোটাল-বেশে হরিদাস রঙ্গক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং

আরে আরে ভাই সব হও সাবধান,
নাচিবে লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ।

বলিয়া যষ্টিহস্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন নারদবেশে শ্রীবাস পণ্ডিত রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" নারদবেশী শ্রীবাস উত্তর করিলেন, 'আমি নারদ; কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম, কৃষ্ণ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাই এখানে আসিয়াছি।"

অতঃপর রুক্মিণীবেশে গৌর সভাস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই রূপ দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হইলেন। করুণারসে শ্রোতৃবৃন্দকে প্লাবিত করিয়া গৌর কৃষ্ণোদ্দেশে লিখিত রুক্মিণীর পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন।—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥"

হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিতে করিতে সেই গুণরাশি কর্ণরন্ধ্রযোগে হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জনগণের অঙ্গতাপ হরণ করিতে থাকে। তোমার রূপ দেখিয়া যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় "আমাদিগের অখিলার্থ লাভ হইল" মনে করে। হে অচ্যুত! আমার চিত্তও তোমার রূপগুণের কাহিনী শ্রবণ করিয়া লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে। আমি তোমার শরণাগত হইলাম আমাকে তোমার দাসী করিয়া লও। তোমার দ্রব্য তুমি গ্রহণ কর, শৃগাল শিশুপাল যেন সিংহের ভাগ গ্রাস না করে।"

রুক্মিণীর আবেশে রুক্মিণীর মানসিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গৌর তাঁহার পাঠ অভিনয় করিয়া রঙ্গভূমি ত্যাগ করিলেন। অনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পাঠ অভিনীত

হইবার পরে আত্মশক্তিবেশে গৌর পুনরায় রঙ্গক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। বড়াইব বেশে নিত্যানন্দ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। জগজ্জননীভাবে আবিষ্ট হইয়া গৌর নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গগণ সময়োচিত গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। হঠাৎ নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। গৌর খট্টার উপর উপবেশন করিয়া তদুপরিস্থ গোপীনাথ-বিগ্রহ অঙ্কে ধারণ করিলেন। ভক্তগণ তখন মহালক্ষ্মীর স্তব পড়িতে লাগিলেন। অচিরে রজনী প্রভাত হইল।

গৌর যখন প্রকৃতিস্থ থাকিতেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্যকে বিশেষ সম্মান করিতেন। অদ্বৈত ইহাতে মনে মনে বড় অসুখী ছিলেন। একদিন আচার্য্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, “প্রভু আমাকে বড়ই বিড়ম্বিত করিতেছেন; স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া তিনি বলপূর্ব্বক আমার চরণ ধারণ করেন। শারীরিক বলে আমি তাঁহার সমকক্ষ নহি, কিন্তু ভক্তিবল আমার আছে। দেখি, ভক্তির জোরে তাঁহার মায়া আমি চূর্ণ করিতে পারি কি না।” এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য একদিন হরিদাস ঠাকুরের সহিত শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং তথায় স্বীয় আবাসে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ পাঠ ও ভক্তির উপর জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। হরিদাস দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া গৌর অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন, “নাড়া, বল ত, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কে বড়?” অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “জ্ঞান ত সর্ব্বকালেই গরীয়ান্। যাহার জ্ঞান নাই, ভক্তিতে তার কি করিবে?” অদ্বৈতের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই গৌর তাঁহাকে সবলে ধারণ করিয়া অঙ্গনে টানিয়া আনিলেন, এবং নির্ম্মম-ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গৌর রোষকম্পিতস্বরে কহিলেন, “এই জন্যই কি আমাকে প্রকাশিত করিয়াছ? আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে টানিয়া আনিয়া এখন জ্ঞান-ব্যাখ্যা হচ্ছে?” গৌরের প্রহারে কৃতার্থ হইয়া অদ্বৈত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন, ‘কেমন, বড় যে আমায় স্তুতি করিয়াছিলে, তাহা এখন কোথায় গেল? আমি দুর্ব্বাসা নহি যে, আমার অবশেষান্ন অঙ্গে মাখিবে; আমি ভৃগু নহি যে, আমার পদধূলি অঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীবৎসলাঞ্ছন হইবে।

‘মোর নাম অদ্বৈত, তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর গ্রাস।’

শাস্তিবিধানই যদি করিলে, তবে এখন পদছায়া দেও।” এই বলিয়া আচার্য্য গৌরের পদ মস্তকে ধারণ করিলেন। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গৌর রোদন করিতে লাগিলেন।

একদিন গৌর ও নিতাই বসিয়া আছেন, এমন সময় মুরারি গুপ্ত আসিয়া প্রথমে গৌরকে তৎপরে নিতাইকে প্রণাম করিলেন। তজ্জন্য গৌর মুকুন্দকে তিরস্কার করিলে মুকুন্দ কহিলেন, “তুমি যাহা করাও, আমি তাই করি, আমার দোষ কি?” তখন গৌর কহিলেন,

"কাল জানিতে পারিবে।" সেই রাত্রিতে মুরারি স্বপ্নে দেখিলেন, "মল্লবেশে নিত্যানন্দ ধাবমান, তাঁহার মস্তকে শেষ নাগ ফণা উত্তোলন করিয়া গর্জ্জন করিতেছেন, হস্তে হল ও মুষল শোভা পাইতেছে। শিখি-পুচ্ছশোভিত বিশ্বম্ভর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। মুরারিকে দর্শন করিয়া গৌর কহিলেন, 'মুরারি! নিতাই জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ।" স্বপ্নভঙ্গে মুরারি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যূষে গৌর-নিতাই সমীপে গমন করিয়া অগ্রে নিতাইকে প্রণাম করিলেন। প্রীত হইয়া গৌর মুরারিকে অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। আনন্দে বিহ্বল মুরারি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন ভোজনে বসিলেন তখন পত্নীপ্রদত্ত যাবতীয় অন্ন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কেবল "খাও খাও" বলিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গৌর মুরারির গৃহে গমন করিয়া কহিলেন, "মুরারি! কাল তোমার অন্ন খাইয়া আমার অজীর্ণ হইয়াছে। তোমার জল খাইয়া সেই অজীর্ণ দূর করিতে হইবে।" এই বলিয়া মুরারির জলপাত্র লইয়া গৌর জলপান করিলেন। মুরারি রোদন করিয়া উঠিলেন।

একদিন শ্রীবাসগৃহে গৌর "গরুড়, গরুড়" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। ঠিক সময়ে আবিষ্ট ভাবে মুরারিও তথায় প্রবেশ করিলেন এবং "আমিই তোমার গরুড়" বলিয়া যুক্তকরে গৌর-সমীপে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৌর মুরারির স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করিতে-ছিলেন। ভাগবতের অধ্যাপক বলিয়া দেবা-নন্দের যথেষ্ট খ্যাতি থাকিলেও, ভক্তির অভাবে ভাগবতের গূঢ়ার্থ তাঁহার বোধগম্য হইত না। গৌর নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া দেবানন্দকে ভাগবত পাঠ করিতে শুনিলেন। শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ও লোকটা কোনও জন্মেই ভাগবতের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, ভাগবতপাঠে উহার অধিকার নাই, আমি উহার পুঁথি ছিঁড়িয়া ফেলিব" বলিয়া ক্রোধবশে দেবানন্দের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সঙ্গিগণ বহু কষ্টে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

শ্রীবাসের সহিত গৌর নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। পথিপার্শ্বস্থ মদের দোকান হইতে গন্ধ আসিয়া তাঁহার নাসিকায় প্রবিষ্ট হইল। মদ্যগন্ধে বারুণী স্মরণ হওয়ায় গৌর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং হুঙ্কার করিতে করিতে দোকানের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীবাস চরণে ধরিয়া নিষেধ করিলেন—কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া গৌর কহিলেন,—"আমারও কি বিধি-নিষেধ আছে?" শ্রীবাস কহিলেন,—"জগতের পিতা হইয়া তুমি যদি ধর্ম্মনাশ কর, তবে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? তোমার লীলা কেহ বুঝিতে পারিবে না, অনেকে এই মদের দোকানে প্রবেশ জন্য তোমার নিন্দা করিয়া নাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যদি এই দোকানে প্রবেশ কর, আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।" গৌর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেবানন্দকে দেখিয়া শ্রীবাসের প্রতি তাহার ও তদীয় শিষ্যগণের ব্যবহার

গৌরের স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন,—"ওহে দেবানন্দ, তুমি না কি ভাগবত পড়াও, তবে কোন্ অপরাধে মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতকে শিষ্য দ্বারা টানিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছিলে?" দেবানন্দ লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন।

বিশ্বরূপ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া যান, তখন মর্ম্মান্তিক মনোদুঃখে শচীমাতা বলিয়াছিলেন,—"অদ্বৈতাচার্য্যই আমার পুত্রকে গৃহের বাহির করিয়াছিলেন।" গয়া হইতে প্রত্যাগমনান্তে গৌর যখন সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়িলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া নিরবধি অদ্বৈতাচার্য্যের সহবাসে কাল কাটাইতে লাগিলেন, তখন মাতা আবার বলিয়াছিলেন,—"চন্দ্রের মত আমার এক পুত্রকে আমার কোলছাড়া করিয়াও আচার্য্যের তৃপ্তি হয় নাই। বিশ্বম্ভরকেও ঘরের বাহির করিবার আয়োজন করিতেছেন। অনাথিনী আমার উপর কাহারও দয়া হয় না। জগতের সকলের কাছেই আচার্য্য "অদ্বৈত", কেবল আমারই নিকট দ্বৈত মায়া।'

একদিন আবিষ্টভাবে গৌর বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং সকলকেই অভিমত বর দান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীবাস কহিলেন, "প্রভু, আইকে ভক্তিদান কর।" গৌর কহিলেন,—"বৈষ্ণবের স্থানে যাঁহার অপরাধ আছে, তাঁহাকে আমি ভক্তি দান করিতে পারি না।" শ্রীবাস কহিলেন,—"যাঁহার পুণ্যগর্ভে তুমি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার ভক্তিযোগে অধিকার নাই, এমন কথা উচ্চারণ করিও না প্রভু! যদিই মাতার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহার খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ কর।" গৌর কহিলেন,—"বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি শুধু খণ্ডনের উপায় বলিতে পারি। অদ্বৈতের নিকট তাঁহার অপরাধ। অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার ক্ষমালাভ করিতে পারিলেই, তিনি প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন।" শুনিয়া অদ্বৈত ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন; বিশ্বম্ভরের জননী—যাবতীয় বৈষ্ণবের জননীস্বরূপিণী—শচী দেবীকে পদধূলি দানের কথায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। শচী দেবীর মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে আচার্য্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া শচী দেবী অপরাধমুক্ত হইলেন।

নবদ্বীপে এক পরমসাধু তপস্বী বাস করিতেন। কেবল মাত্র পয়ঃপান করিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন। গৌরের নৃত্য দেখিতে অভিলাষী হইয়া তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে ধরিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্রীবাস একদিন তাঁহাকে লইয়া গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। যথাসময়ে বিশ্বম্ভর নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বিরত হইয়া কহিলেন,—"আজি কেন আমার প্রেমোদয় হইতেছে না? অনধিকারী কেহ কি লুকাইয়া আমার নৃত্য দেখিতেছে?" ভীত শ্রীবাস তখন সমস্ত ব্যক্ত করত ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া কহিলেন,—"এহেন নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীর কি তোমার নৃত্য দেখিবার অধিকার নাই প্রভু?"

শুনি ক্রোধাবেশে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ঝাট্ ঝাট্ বাড়ীর বাহির নিঞা কর॥

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি॥
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালে হেয় মোহোর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর মুক্তি তার জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে সত্য বলিলুঁ বচন॥

তখন ভীত হইয়া ব্রহ্মচারী বাটীর বাহির হইয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"যাহা কিছু দেখিতে পাইলাম, সেই আমার ভাগ্য; যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার অনুরূপ শাস্তি পাইলাম। অদ্ভুত নৃত্য, অদ্ভুত ক্রন্দনও যেমন দেখিলাম, স্বীয় অপরাধানুরূপ তর্জ্জন গর্জ্জনও তেমনি দেখিয়াছি। আমি তাঁহার সেবক। যে দণ্ড তিনি বিধান করিবেন, তাহা নতশিরে আমি গ্রহণ করিব।" করুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র তাঁহার তদানীন্তন মানসিক ভাব জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার মস্তকে চরণার্পণ করিয়া কহিলেন,—"তপস্যা করিয়া অহঙ্কার করিও না। বিষ্ণুভক্তি সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ।" ব্রহ্মচারী সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জলপান

জল জীবদেহের একটি প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ্ দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, নানা পুষ্টিকর খাদ্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে এবং ইহাই উদ্ভিদ্দিগকে সজীব রাখিতেছে। প্রাণিদেহের ভিতরের খবর লইলেও ইহাই দেখা যায়; এখানেও এক জলের প্রবাহই অবিরাম সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া প্রাণীদিগকে জীবিত রাখিতেছে। জলের প্রবাহ রোধ কর, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কার্য্যও রোধ হইয়া যাইবে। শুষ্ক বীজে জলের প্রবাহ থাকে না বলিয়া তাহাতে জীবনের লক্ষণও প্রকাশ পায় না। বীজ জলসিক্ত কর, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া জীবনের কার্য্য দেখাইতে থাকিবে। জীবাণুকে (microbes) প্রাণীর কোঠায় ফেলিব, কি উদ্ভিদের মধ্যে গণ্য করিব, জানি না; কিন্তু এই আণুবীক্ষণিক জীবগুলিকে জলই সজীব রাখে। জলবর্জ্জিত শীতল স্থানে রাখিলে জীবাণুর জীবনের ক্রিয়া লোপ পাইয়া যায়। এই অবস্থায় ইহারা বংশ বিস্তার করে না এবং চলাফেরাও করে না; কিন্তু পরে আর্দ্র-স্থানে লইয়া গেলেই জীবনের লক্ষণ দেখাইতে থাকে। শীত-প্রধান দেশের মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীর জীবনেও এই প্রকার দেখা যায়। শীতকালে যখন সমগ্র জল বরফ হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়, মৎস্যগুলির দেহস্থ জলও

জমিয়া যায়। কাজেই এই অবস্থায় মৎস্যদেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা যায় না। তার পরে বরফ গলিতে আরম্ভ করিলেই মৎস্যগণও জীবন্ত হইয়া পড়ে।

উদ্ভিদ্‌গণ শিকড় দিয়া জল শোষণ করে এবং তাহাই উর্দ্ধে উঠাইয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিচালন করে; কিন্তু প্রাণিগণ সাধারণতঃ মুখ দিয়া জল গ্রহণ করে এবং তাহাই নিম্নগামী হইয়া উদরস্থ হইলে নানা প্রক্রিয়ায় সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। অনেকের বিশ্বাস আছে, স্নানের সময় রোমকূপ দিয়া জল দেহপ্রবিষ্ট হয়, কিন্তু শারীরবিদ্‌গণ এই কথার অনুমোদন করেন না। শরীরে জল প্রবেশ করাইবার একমাত্র পথ আমাদের মুখ। নানাপ্রকার রোগে যখন আমাদের জলপান করিবার শক্তি লয় প্রাপ্ত হয়, তখন চিকিৎসকেরা চিন্তিত হইয়া পড়েন; এই অবস্থায় নানা কৃত্রিম উপায়ে দেহের চর্ম্ম ভেদ করিয়া জল প্রবেশ করাইতে হয়। আমরা নিশ্বাসের সহিত কিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্প দেহস্থ করি সত্য, কিন্তু প্রাণীর নাসিকা কখনই জলপানের যন্ত্র নয়, কারণ প্রত্যেক প্রশ্বাসের সহিত প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়তই আমাদের দেহচ্যুত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ করিলে নাসিকাকে জলনির্গমনের পথই বলিতে হয়।

চিকিৎসাকালে ডাক্তারগণ প্রাণিশরীরে যে জল প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ লবণাক্ত করিয়া দেওয়া হয়। লবণ-জলই দেহ-রক্ষার উপযোগী। জীবন্ত ভেকের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিলে, ইহা কিছুক্ষণ বেশ তালে তালে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং জলে সিক্ত রাখিলে এই স্পন্দন দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। কিন্তু জল বিশুদ্ধ হইলে স্পন্দন কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; এই জন্য ভেকের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য পরীক্ষা করার সময় তাহাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লবণ-জলে সিক্ত রাখা হয়। প্রাণীমাত্রেরই হৃৎপিণ্ড কোন এক প্রকার তরল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এই তরল পদার্থের অভাব হইলেই অনেক সময়ে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য লোপ পায় এবং প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, অকস্মাৎ রক্তপাতে প্রাণীর যে মৃত্যু হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের শূন্যতাই তাহার মূল কারণ। কাহারও হঠাৎ রক্ত ক্ষয় হইলে প্রাচীন চিকিৎসকেরা ইতর প্রাণীর দেহ হইতে তাজা রক্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা রোগীর শিরা উপশিরায় প্রবেশ করাইয়া দিতেন। আজকাল এই চিকিৎসা-পদ্ধতির আর প্রচলন নাই। দেহ হইতে অধিক রক্ত ক্ষয় হইলেই এখন চিকিৎসকেরা কেবল লবণ-জল পিচ্‌কারির সাহায্যে শিরায় প্রবেশ করাইয়া দেন; ইহা শূন্য হৃদ্‌যন্ত্রকে পূর্ণ করিয়া রোগীকে বহুক্ষণ জীবিত রাখে।

জ্বরের সময়ে রোগী প্রায়ই ভয়ানক পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে। দেহ-রক্ষার জন্য জলের প্রয়োজনের ব্যাপার ইহা হইতেও বুঝিয়া লওয়া যায়। রোগীর পিপাসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শারীরবিদ্‌গণ বলেন, রোগ দেখা দিলেই নানাপ্রকার বিষ-পদার্থ দেহে জন্মিতে আরম্ভ করে। এই বিষ দীর্ঘকাল দেহে থাকিলে প্রাণীর মৃত্যু অনিবার্য্য; এই কারণে দেহের সকল ইন্দ্রিয়ই ইহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ হইতে জল সংগ্রহ করিতে

আরম্ভ করে এবং সেই জলে বিষ ধৌত করিয়া দেহচ্যুত করিবার চেষ্টা করে। বিষ নষ্ট করিবার জন্য এই প্রকারে দেহের জলীয় অংশের যে ব্যয় হয়, তাহার পূরণ আবশ্যক। এই জন্যই রোগীর পিপাসার উদ্রেক হয়। মদ্য-পায়ীদের পিপাসারও ইহাই কারণ। মদ খাইলেই কয়েক জাতীয় ভয়ানক বিষ শরীরে উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে বিকল করিতে উদ্যত হয়। এই বিষের অনিষ্টকারিতা লোপ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলি হইতে স্বতঃই জল নির্গত হয়, কাজেই এই জলক্ষয়ের নিবারণের জন্য পিপাসার উদ্রেক হইয়া পড়ে। মূত্রা-শয়ের বিকার উপস্থিত হইলে বা ত্বকের কার্য্য ভাল করিয়া না চলিলে, চিকিৎসকগণ পূর্ব্বে নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতেন, আজকাল ইঁহারা বুঝিয়াছেন, জলই এই প্রকার ব্যাধির মহৌষধ। জল প্রয়োগ করিলে দেহের অনেক পীড়ার বিষ ধৌত হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়, আমরা যখন জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে পিপাসাতুর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকি, তখন এই লক্ষণটা জ্বরের লক্ষণ নয়। রোগের আক্রমণে শরীরে যে বিষ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতে নির্মুক্ত হইবার জন্যই আমাদের পিপাসার উদ্রেক হয়। প্রাচীন চিকিৎ-সকেরা জলের এই কার্য্যের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাঁহারা পিপাসা দেখিলেই ভয় পাইতেন এবং জলপান অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু এখন চিকিৎসকগণ পিপাসাকে দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করেন না, এবং অধিক জ্বর আছে, কিন্তু পিপাসা নাই, এই প্রকার অবস্থাকেই তাঁহারা ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রোগীর ক্ষুধা নাই, তথাপি জোর করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইবে; পিপাসা আছে, অতএব জলপান বন্ধ করিতে হইবে, এ প্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতির এখন আর প্রচলন নাই। প্রকৃতিই পরম চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রকৃতিই আমাদের দেহে যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন। আধুনিক চিকিৎসকগণ ধীরে ধীরে এই সকল সত্যকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু রোগীর আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ আজও ইহা বুঝিতে-ছেন না। জ্বরের রোগীর গায়ে লেপ বা কম্বল জড়াইয়া আবদ্ধ ঘরে রাখিবার রীতি আজও দেখা যায়। ইহাতে রোগীর ব্যাধি প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা বাড়িয়াই চলিতে থাকে। বাহির হইতে গৃহে ভাল বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না, প্রবেশ করিলেও রোগীর দেহ স্পর্শ করিতে পারে না, কাজেই রোগীর দেহ হইতে ঘর্ম্মের আকারে বা জলীয় বাষ্পের আকারে যে বিষ নির্গত হইতে আরম্ভ করে, তাহা দেহচ্যুত হইতে পারে না। আজকাল জ্বররোগীর চিকিৎসার জন্য যে সকল হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহাতে রোগীদিগকে ইচ্ছানুরূপ জলপান করিতে দেওয়া হয় এবং সেখানে গায়ে কম্বল চাপানো বা ঘরের দরজা-জানালা রুদ্ধ করা হয় না। পাতলা কাপড়ে রোগীর দেহ আবৃত করা হয়; বাহির হইতে শুষ্ক বাতাস আসিয়া দেহের তাপ ও জলীয় অংশ শোষণ করিয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় জ্বররোগে মৃত্যুর পরিমাণ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আধুনিক চিকিৎ-

সকগণ প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন, ঠাণ্ডা লাগার জন্য পূর্ব্বে আমাদের যে একটা আশঙ্কা ছিল, তাহা একটা ঘোর কুসংস্কার মাত্র। নিউ-মোনিয়া, ব্রন্‌কাইটিস্ প্রভৃতি পীড়ার মূলে চিকিৎসকগণ এখন আর ঠাণ্ডা লাগা দেখিতে পাইতেছেন না। এই সকল ব্যাধি এক এক প্রকার জীবাণু (microbe) হইতে উৎপন্ন হয়, জ্বরও জীবাণুর কার্য্য। সুতরাং ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত না করিয়া, যদি লোকে ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখিয়া, জীবাণুদিগের বাসা ভাঙ্গিতে পারেন, তাহা হইলে ব্যাধির আক্রমণের আর ভয় থাকে না। কেবল এইটুকু দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সুস্থ মানুষের গায়ে সর্ব্বদাই যে তাপ থাকে, শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আমাদের দেহের সেই তাপটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। দেহের উষ্ণতা সেই সাড়ে আটা-নব্বুই ডিগ্রির কম হইলে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় নানা ব্যাধির জীবাণু দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বংশবিস্তারের সুবিধা পাইয়া যায়, কাজেই তখন লোকে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে নানা পদার্থের কোন্‌টি খাদ্য এবং কোন্‌টিই বা অখাদ্য, তাহা মানুষ স্থির করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা খাদ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া আমরা প্রতিদিন গলাধঃকরণ করি, তাহার মধ্যে যে, কোন অখাদ্য ও অস্বাস্থ্যকর জিনিষ থাকে না, এ কথা কোনক্রমে বলা যায় না। অখাদ্য বস্তু নিয়তই খাদ্যের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া আমাদের পাকাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই বিষগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য মানুষকে বিশেষ কিছুই করিতে হয় না; আমাদের পাকাশয় এবং যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্র তাহাদের অনিষ্টকারিতা নষ্ট করিয়া বিষকে অমৃতে পরিণত করে। তবে খাদ্যের সহিত মিশ্রিত বিষ যদি অতি উগ্র হয়, তাহা হইলে অবশ্যই মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। জীবনের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং পেশী প্রভৃতির কোষ হইতে যে বিষ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহাই আমাদের সকল প্রকার ব্যাধির মূল কারণ। মানুষের অকালবৃদ্ধত্ব ও জরার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই দেহজ বিষগুলিকেই অনিষ্টের মূল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শরীরের ক্রিয়ার সহিত স্বভাবতই যেমন বিষ উৎপন্ন হয়, তেমনি নানা শারীরযন্ত্র এই বিষগুলিকে নষ্ট করিয়া বা দেহচ্যুত করিয়া দেয়। শরীরে এই কার্য্যটির একটু হ্রাস হইলেই মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং দিনে দিনে, মাসে মাসে সেই সকল বিষ দেহে সঞ্চিত হইয়া মানুষকে জরা-গ্রস্ত করে। মনে করা যাউক, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত নিয়তই যে জলীয় বাষ্প ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হইতেছে, তাহা বন্ধ হইয়া গেল বা রক্ত হইতে যে জলীয় অংশ মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়, তাহা কোনপ্রকারে বন্ধ হইল। এই অবস্থায় মানুষ কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না; দেহের বিষ বাহির হইবার পথ পায় না, কাজেই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং শেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। যাহা হউক, দেহজ বিষের বহিষ্করণ ব্যাপারে জলের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। ঘর্ম্মের

সহিত, মলমূত্রাদির সহিত নিয়তই আমাদের দেহের নানা আবর্জ্জনা ধৌত হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এবং আমরা জলপান করিয়া এই জলক্ষয়ের নিবারণ করিতেছি।

আমাদের চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশিতে যখন অধিক জলীয় বাষ্প থাকে, তখন আমাদের শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হইয়া পড়ে। মেঘলা দিনে মন কি প্রকার অপ্রফুল্ল হয় এবং শরীরে কি প্রকার জড়তা আসে, তাহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে ইহার একটা ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। চারিদিকের বাতাস জল-ভারাক্রান্ত, কাজেই তখন শরীর হইতে আর ঘর্ম্ম নির্গত হয় না এবং শরীরে আর নূতন জল প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন হয় না। ইহার ফলে শারীরিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন বিষগুলি দেহে উৎপন্ন হইয়া দেহেই থাকিয়া যায় এবং শরীরকে অসুস্থ করিয়া তোলে।

তৃষ্ণাতুর হইলেই পরিমিত জলপান করা যেমন স্বাস্থ্যকর, পিপাসাহীন অবস্থায় অপরি-মিত জলপান সেই প্রকার বিশেষ স্বাস্থ্য-হানিকর। কয়েকজাতীয় ইতর প্রাণীর দেহে জলথালী সংযোজিত থাকে। তাহারা অপরি-মিত জলপান করিয়া তাহা জলথালীতে সঞ্চিত রাখে এবং প্রয়োজন-মত তাহা পাকাশয়াদিতে প্রবেশ করায়। মানুষের দেহে এই ব্যবস্থা নাই, কাজেই অধিক জল পান করিলে তাহা পাকাশয়েই আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পাকাশয়ের উপরিস্থিত হৃদ্‌যন্ত্রে চাপ দিতে থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হইলে বিশেষ আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাজি রাখিয়া অনেকে আকণ্ঠ জল বা সরবৎ পান করে, ইহাতে কাহাকেও কাহাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, জলে স্ফীত পাকা-শয়ের চাপে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ালোপই এই সকল অপমৃত্যুর কারণ।

রোগী পিপাসায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, এই অবস্থায় সুচিকিৎসক জলপান নিষেধ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনই একসঙ্গে এক গ্লাস জল পান করিতে বলেন না। অল্প পরিমাণে বহুবার জল পান করাই সুচিকিৎসকের পরামর্শ।

আমাদের অধিকাংশ খাদ্যেই প্রচুর জল থাকে। অনেক খাদ্যের শতকরা সত্তর হইতে নব্বুই ভাগ কেবল জল। সুতরাং খাদ্যের সঙ্গে অনেকটা জল আমাদের দেহস্থ হয়, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুপক্ক ফলের অধিকাংশই জলময়। এজন্য ফলভক্ষণ অনেক সময়েই জলপানের কার্য্য করে। ফলের জলীয় অংশ নিছক্ জল নয়, ইহাতে অনেক অম্ল ও লবণপদার্থ মিশ্রিত থাকে। আমরা দেহের বহির্ভাগ পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যেমন ক্ষারময় সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করি, ফলমূলের লবণ ও অম্লমিশ্রিত জল পাকাশয়ে গিয়া সেই প্রকার সাবানের কার্য্য করে। পাকাশয়াদির যত অনিষ্টকর আবর্জ্জনা ঐ জলে ধৌত হইয়া দেহ হইতে নির্গত হয়। এই কারণেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ফল-ভক্ষণ বিশেষ আবশ্যক।

জলপানের সহিত স্বাস্থ্যের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও, শারীরবিদ্‌গণ আহারের সময় অধিক জলপান করিতে নিষেধ করেন। এই নিষেধ-বিধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন,

আমাদের পাকাশয়স্থ খাদ্য যদি অধিক জলে মিশ্রিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পাকাশয়ের পাকরসগুলি নির্গত হয় না, কাজেই অজীর্ণ রোগ দেখা যায়। অজীর্ণরোগীর পক্ষে আহারের সহিত জলপান বিশেষ অনিষ্টকর; শুষ্ক খাদ্য মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে এই রোগীদের উপকার হয়। অত্যন্ত শীতল জলপানও চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন। সুস্থ লোকের শরীরে যে উত্তাপ দেখা যায়, তাহাই পরিপাক-ক্রিয়ার বিশেষ উপযোগী। বাহিরের শীতল জল পাকাশয়ে সঞ্চিত হইলে, এই তাপের ক্ষয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-কার্য্যও মন্দীভূত হইয়া আসে।

জলপান সম্বন্ধে আধুনিক শারীরবিদ্‌গণের এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, স্রোতস্বতী নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম ও নগরাদির স্বাস্থ্য যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই প্রকার প্রাণি-শরীরের ভিতর দিয়া নিয়ত জলের প্রবাহ চলিলেই দেহ রক্ষা হয়। প্রবাহবর্জ্জিত নদী বা খালের জল দেশে নানা ব্যাধিই উৎপন্ন করে। যে দেহে জল কেবল সঞ্চিতই হইতে পায়, তাহাও স্থিরসলিলা জলাশয়ের ন্যায় নানাপ্রকার ব্যাধির আকর হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

হিন্দীভাষা

গত বড়দিনের ছুটির সময়ে কলিকাতায় হিন্দী সাহিত্যসম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মির্জ্জাপুরবাসী প্রাচীন সাহিত্যসেবী এবং সুকবি বাবু বদরী-নারায়ণ চৌধুরী এই সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী অতি সুন্দর ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি এই অভিভাষণে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-কথার আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই গোটা কয়েক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া হিন্দী সাহিত্যের পরিচয় দিতেছি।

বহু পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে মোটের উপর আঠার রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল। যথা —(১) সংস্কৃত, (২) প্রাকৃত (৩) উদীচী (৪) মহারাষ্ট্রী, (৫) মাগধী, (৬) সিদ্ধার্দ্ধ—মাগধী, (৭) শকাভীরা, (৮) শ্রবন্তী, (৯) দ্রাবিড়ী, (১০) ওড়িয়া, (১১) পাশ্চাত্যা, (১২) প্রাচ্যা, (১৩) বাহ্লিকা, (১৪) রন্তিকা, (১৫) দাক্ষিণাত্যা, (১৬) পৈশাচী, (১৭) আবন্তী, (১৮) শৌরসেনী। ইহা ছাড়া যে অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। বৌদ্ধযুগে পালিভাষার আদর একটু অতিমাত্রায় বাড়িয়াছিল। হিন্দী ভাষার

আদিরূপ শৌরসেনী বা অর্দ্ধ মাগধী ; উহার দ্বিতীয় রূপ নাগর বা এক অপভ্রংশ ভাষা ; তৃতীয় রূপ পুরাতন ভাষা বা ভাষা। ভাষাব এই তৃতীয়রূপ চন্দবর্‌দাইয়েব 'পৃথ্বীরাজ রাসো'' মহাকাব্যে প্রকট হইয়াছে। ইহাই হিন্দীর আদি গ্রন্থ। হিন্দুস্থানে এই মহাকাব্যের ব্যাখ্যাতা সুপণ্ডিত খুব অল্প থাকিলেও উহাই যে পরবর্ত্তী হিন্দী কবিগণের আদর্শ গ্রন্থ হইয়াছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। চন্দবর্‌দাইয়ের ভাষা হইতেই ব্রজভাষার উৎপত্তি। ব্রজভাষাও মিশ্রিত ভাষা, নানাবিধ বিদেশী শব্দে পরিপূর্ণ। এই ব্রজভাষার প্রধান কবি ছিলেন—দর্শন, কবীর, সুরদাস, কেশব, খুস্‌রো, জায়সী, তুলসীদাস, বিহারী, দ্বিজদেব প্রভৃতি। মোগলপ্রাধান্যকালে এই ব্রজভাষার আদর ভারতব্যাপী হইয়াছিল। বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইতে হইলে রাজভাষা ফারসী ত জানিতেই হইত, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজভাষা জানা থাকিলে বিদ্বজ্জন-সমাজে সমাদর লাভ অনায়াসেই হইত। আকবর বাদশাহ এই ব্রজভাষার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

রাজা ও রাজধানীর প্রভাবে ভাষা এক একটা আকার ধারণ করিয়া থাকে। যখন মথুরা কুষাণবংশের সম্রাট্‌গণের রাজধানী ছিল, তখন শৌরসেনী ভাষার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। পাটলীপুত্র নগরে সম্রাট্ অশোকের রাজধানী ছিল, তাই মাগধী ও পালী ভাষার আদর বাড়িয়াছিল ; যখন অবন্তী বা উজ্জয়িনী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল, তখন আবন্তী ভাষার প্রচলন হইয়াছিল। দিল্লীর পাঠান-রাজগণ এ দেশের লোকের সহিত মেলামেশা করিতেন না। তাঁহারা বাহুবলে দেশ জয় করিয়াছিলেন, বাহুবলে বিজিত রাজ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন বাহুবলে হিন্দুদিগের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতেন ; মন্দির, মঠ, বিহার, চৈত্যসকল ধূলিসাৎ করিতেন। আকবর বাদশাহ এ নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বাহুবলে দেশ জয় করা যায় বটে, পরন্তু উহা দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না। দেশজয় অপেক্ষাকৃত সহজ, বিজিত দেশকে দীর্ঘকাল করামলকবৎ রক্ষা করা সহজ নহে—দুশ্চর তপস্যাসাধ্য, কঠোর পুরুষকারসাপেক্ষ। তাই তিনি হিন্দুদিগের সহিত মিলিতে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজপুতগণ ভারতের রণবীর এবং রণধীর জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজপুতগণ ব্রজভাষার সমাদর করিতেন, ব্রজভাষার কবিসকলকে রক্ষা করিতেন। আকবর মোগলেরাজপুতে সদ্ভাব-স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেমন রাজপুতের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, যেমন রাজপুতের দরবারী বা রাজসভার রীতিপদ্ধতি, বসন-ভূষণ, সভ্যতা ভব্যতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তেমনি ব্রজভাষার কবিগণের সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্-সমাদরে এই ব্রজভাষার যথেষ্ট পুষ্টি হইয়া ছল, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফার্‌সী শব্দও ব্রজভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তবে বল্লভকুলের বৈষ্ণব কবিগণ এই ব্রজভাষায় বিষ্ণুপদ বা হরিকীর্ত্তন রচনা করিয়া গান করিতেন। এই কীর্ত্তনের অতিপ্রচার হইয়াছিল, তাই ব্রজভাষার মূল সংস্কৃতই

ছিল, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আকবর-প্রভাবেও কমে নাই। আকবর স্বয়ং ব্রজভাষায় এক-জন সুকবি ছিলেন ; রাজা বীরবল, আবদুর রহিম, খান্‌খানান প্রভৃতি সম্রাট্-পারিষদ্‌গণের মধ্যে অনেকে সুকবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

একা আকবর নহেন, জাহাঙ্গীর ও শাজাহান বাদশাহ-যুগলও ব্রজভাষায় সুকবি ছিলেন। এমন কি, আলমগীর বাদশাহ গোড়া মুসলমান হইলেও ব্রজভাষার অনুরাগ ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। কাজেই বলিতে হয় যে, মোগল-প্রাধান্যকালে ব্রজ-ভাষার অতি উন্নতি ঘটিয়াছিল। এই ব্রজ-ভাষা এখনও হিন্দী কবিতার ভাষা হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজের আমলে দেবস্বামী, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, বাবু প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, বাবু বদরিনারায়ণ চৌধুরী, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, শ্রীনিবাস দাস এবং শ্রীধর পাঠক প্রভৃতি অধুনা ব্রজভাষাতেই কবিতা রচনা করিয়া কবি-পদবী লাভ করিয়া-ছেন। ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে কোন প্রাদেশিক ভাষার উন্নত সাহিত্যে গদ্য আসন পান নাই। ইংরেজের প্রভাবেই ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষায় গদ্য-রচনা আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলে অনেক বাঙ্গালী পাঠক নিশ্চয় বিস্মিত হইবেন যে, এই কলিকাতা সহরেই সর্ব্ব প্রথমে হিন্দীর শ্রেষ্ঠ গদ্য পুস্তকের রচনা হয়। প্রেমসাগর হিন্দীর প্রধান গদ্য-পুস্তক ; নল্লুজী লাল কলিকাতা সহরে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ বাঙ্গলা গদ্যের পদ্ধতি নির্ণয় করিয়া বঙ্গভাষায় গদ্য পুস্তক সকল রচনা করিয়াছিলেন, যখন বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলা গদ্য বালারুণের ন্যায় বঙ্গের সাহিত্যা-কাশে উদিত হইতেছিল, তখনই বাঙ্গলা গদ্যের লিখন ভঙ্গী অনুসরণ করিয়া নল্লুজী-লাল প্রেমসাগর রচনা করেন। রাজা শিবপ্রসাদ হিন্দী গদ্যের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় লেখক। তিনি প্রেম-সাগরের ভাষাকে মার্জ্জিত, উন্নত ও শ্রুতিমধুর করিয়া গিয়াছেন। প্রেমসাগরের গদ্যের উপর উর্দ্দু গদ্যের উপযোগিতা মিশাইয়া রাজা শিব-প্রসাদ হিন্দী গদ্যকে একটা নূতন আকার দিয়া গিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে বাঙ্গলা গদ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, অনেকটা সেই ভাবে কবি হরিশ্চন্দ্র ও রাজা শিবপ্রসাদ হিন্দী গদ্যের প্রসাধন করিয়াছেন। এখন হিন্দু-স্থানে বাঙ্গলা গদ্যের অনুকারী এক মিশ্রগদ্য সাময়িক পত্রাদিতে প্রচলিত হইয়াছে। যে ব্যঞ্জনা অনুসারে বাঙ্গালী লেখকগণ সংস্কৃত শব্দসকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, হিন্দুস্থানের অনেক নবীন লেখক সেই ব্যঞ্জনা অনুসারে হিন্দী গদ্যে সংস্কৃত বহু শব্দের ব্যবহার করিতে-ছেন। রাজা শিবপ্রসাদ এবং কবি হরিশ্চন্দ্রের আদর্শ হইতে হিন্দী গদ্যলেখকগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইংরেজি ধাঁজ, ইংরেজি ভাঁজ, অনেক হিন্দী-লেখকের গদ্য-সন্দর্ভে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজধানীর প্রভাব এড়ান যায় না। কলিকাতা যখন রাজধানী ছিল, তখন জ্ঞান, বিদ্যা, ভাব, রস কলিকাতা হইতে প্রসারিত হইয়া হিন্দুস্থানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। মোগল আমলে দিল্লী ও

আগ্রা যখন রাজধানী ছিল, তখন বাঙ্গলার কবি ব্রজভাষার ভাব ও ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া নিজেদের কাব্যগাথা স্থপুষ্ট করিতেন। কবিকঙ্কণ হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সকল বড় কবি ব্রজভাষা হইতে অনেক সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এমন কি, বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে নরোত্তম দাস, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি মহাজন ব্রজভাষার কবি সুরদাস, শ্যামদাস, কেবলদাস প্রভৃতির রচিত অনেক পুরাতন গীত হু-ব-হু বাঙ্গলায় আমদানী করিয়াছিলেন। বল্লভ-সম্প্রদায়ের অনেক কীর্ত্তন, অনেক বিষ্ণুপদ বাঙ্গলায় কিঞ্চিৎ আকারান্তরিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা রাজধানীর প্রভাব। তেমনি কলিকাতা যখন ইংরেজের রাজধানী ছিল, তখন কবি হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গলার হেমচন্দ্রের ও মধুসূদনের অনেক কবিতা হিন্দীতে ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস বিহারী চক্রবর্ত্তীর ও রবীন্দ্রনাথের অনেক খণ্ড কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বাঙ্গলার কবি ও লেখকগণ দিল্লীর পুরাতন ঋণ অনেকটা পরিশোধ করিয়াছেন।

চন্দবরদইয়ের পৃথ্বীরাজ রাসোর হিন্দী আর এখনকার হিন্দীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখনও প্রাকৃত ও সংস্কৃতের ছায়া ভাষার উপর হইতে অপসারিত হয় নাই, তখনকার হিন্দী সংস্কৃতপ্রধান প্রাকৃতের নিগড়ে সংবদ্ধ। কবি চন্দ তাঁহার মহাকাব্যে দশাবতারের প্রণাম কেমন ভাষায় করিয়াছেন, শুনুন—

মচ্ছ কচ্ছ বারাহ প্রণম্মিয়
নারসিংহ বামন ফরসম্মিয়।
সুয় দশরথ হলধর নম্মিয়
বুদ্ধ কল্‌ক্ নমো দহ নম্মিয়॥

আবার স্থানে স্থানে চন্দ কবির ভাষা আধুনিক ব্রজভাষার মতন সরল এবং সহজবোধ্য।

অনঙ্গপালের দিল্লীপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে কবি বলিতেছেন,—

"অনঙ্গপাল তুম্বর তঁহা দিল্লী বসাই আনি।
রাজ-প্রজা নরনারী সব, বসে সকল মনমানি॥"

আবার ঐ কবি লিখিতেছেন—

মধুরিপু মধুরিত মধুব সুপ
মধু-সম্মত মধু গোপ।
মধুরিত মধুপুর মহিল-সুখ
মধুরিত নয়ন স ওপ্।

চৌহান-বীরদিগের যুদ্ধের বর্ণনায় কবি সংস্কৃত ছন্দের ও বিভক্তির লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। যথা—

বঢ়ে বান চহুয়ান চালুক্য যেতম্।
মহামন্ত্র বিদ্যা গুরুং শুক্রজেতম্॥
ঘন ঘোর নীসান গজ্জে সহারম্।
উঠে যানি প্রাসাদ বর্ষা প্রহারম্॥
বজী ভেরি ভঙ্কার নফেফ্‌রি নাদম্।
তড়ঙ্কত বিজ্জু করণ্মাল সাদম্॥

চন্দ কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কবীর, কমাল, বিদ্যাপতি, নান্নক, দাদূ, নাভাজী প্রভৃতি কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা চন্দের ভাষার উপর নিজেদের জন্মস্থানের প্রাদেশিক ভাষার রীতি-পদ্ধতি এবং শব্দসকল সাজাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি ; তাঁহার অভ্যুদয়কালে মিথিলায় প্রাচ্য-

ভাষার ছায়া বিদ্যমান ছিল। তাই বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রাদেশিকতার ভঙ্গী পরিস্ফুট রহিয়াছে। তথাপি কবি বিদ্যাপতির শব্দ-যোজনা ও বচনবিন্যাস দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি চন্দ কবির পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আবার অন্য পক্ষে মীরা বাই, সুরদাস, আদি অষ্টসখা, নাগরী দাস, তানসেন প্রভৃতি বিষ্ণু পদ ও কীর্ত্তন-রচয়িতৃগণ চন্দ কবির সংস্কৃত ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া কবিতা ও পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের ভাষায় প্রাদেশিক শব্দবাহুল্য নাই, দেশীয় ছন্দাদির বিন্যাসও নাই। এইখানে বলা উচিত যে, বিষ্ণু-পদকর্ত্তা-দিগের আদর্শ পুরুষ ছিলেন গীতগোবিন্দের জয়দেব। বাঙ্গলার কোন কবিরই এমন ভারতব্যাপী প্রভাব হয় নাই। ভারতের যেখানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আছে, যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় সেইখানেই জয়দেবের গীত শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সুরসাগর পড়িয়াছেন, যাহারা সুরদাসের রচিত গান গীত হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহারাই একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিবেন, সুরদাসাদি অষ্টসখার বিষ্ণু-কীর্ত্তনে একদিকে যেমন চন্দবরদইয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, অন্য দিকে তেমনি জয়দেবের প্রভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। আবার চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস আদি বাঙ্গলার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তা সকল সুরদাস নাগরীদাস আদির পদ ও কীর্ত্তন-গাথা বাঙ্গলায় আমদানী করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস লেখা হইয়াছে বটে,পরন্তু বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি-কথা এখনও কেহ লিখিতে পারেন নাই। পুরাতন ব্রজভাষার সহিত পুরাতন বাঙ্গলাভাষার যে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা এখনও কোন বাঙ্গালী লেখকই উভয় ভাষার তুলনায় সমালোচনা করিয়া ফুটাইয়া দেখান নাই। পুরাতন বাঙ্গালীকে চিনিতে হইলে, পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তকে চিনিতে হইবে। যুগে যুগে বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত-ধর্ম্মপ্রচারের প্লাবন-তরঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের তথা বঙ্গদেশের যে ভাষা ও ভাবের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইবে, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী ও প্রাচ্যভাষা মথুরা হইতে রাঢ ও পঞ্চকোট পর্য্যন্ত কি ভাবে ও কতটুকু পর্য্যন্ত আধুনিক নানাবিধ প্রাদেশিক ভাষাসৃষ্টির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে, তবে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও বিস্তৃতির ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইবে। যিনি ব্রজভাষার কবিগণের সহিত সুপরিচিত নহেন, যিনি শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর বল্লভকুলের ও শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্ত ও কবিগণের প্রভাবের সমাচার রাখেন না, তিনি বঙ্গভাষার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন না। বাঙ্গলা দেশের সহিত আর্য্যাবর্ত্তের সহস্রাধিক বৎসরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সহস্রাধিক বৎসরকাল বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা বুঝিত, আর্য্যাবর্ত্তের নিকট হইতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিত। বাঙ্গলার গৌড়-ব্রাহ্মণ আর্য্যাবর্ত্তময় ছড়াইয়া পড়িল, রাজপুতানায় প্রাধান্য লাভ করিল, পক্ষান্তরে মিথিলার ও কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ আসিয়া বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠা করিল। বাঙ্গলার সহিত আর্য্যাবর্ত্তের এই আদান-প্রদানের সমাচার যিনি রাখেন না, তিনি বাঙ্গলাভাষার আংশিক ইতিহাস বলিতে পারেন, পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন না। আজ বাঙ্গলা আর্য্যাবর্ত্ত বা হিন্দুস্থান হইতে অনেকটা

স্বতন্ত্র হইয়াছে বটে, পরন্তু মুসলমানের আমলের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ও মহাকবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের—আর্য্যাবর্ত্তের অঙ্গীভূত ছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই হিন্দী, উর্দ্দু বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। ইংরেজের আমল হইতে, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার অতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে চ্যুত হইয়াছে। বাঙ্গালী বাবু এখন আর তুলসীকৃত রামায়ণ বুঝিতে পারেন না, ব্রজভাষার দোঁহা চৌপাই আবৃত্তি করেন না, সুরদাসের সঙ্গীতে আর মুগ্ধ হন না। এখন আর আমাদের ধারণাই নাই যে, বঙ্গভাষার সহিত ব্রজভাষার ও সাধারণ হিন্দী ভাষার কতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই আমরা বঙ্গভাষাকে হিন্দীভাষা হইতে এবং হিন্দুস্থান হইতে পৃথক্ করিয়া বিচার করি। ইহা ঠিক নহে।

আমাদের বঙ্গদেশে, বাঙ্গালাভাষায় কবিতা রচনা করিয়া যেমন জন কয়েক মুসলমান কবি ও ভক্ত-আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানেও তেমনি অনেকগুলি মুসলমান লেখক ব্রজভাষায় সুকবি এবং ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জনকয়েকের নাম করিব, যথা, জায়সী, মোবারক, রহিম, নবী রসখান্, এবং নেবাজ। রসখান্ সাহেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন; লোকে বলিত রসখান্ হরিভক্তিতে কোটি হিন্দু হরিভক্তকে পরাজয় করিতে পারিতেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা অবলম্বন করিয়াই এই সকল মুসলমান-কবি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তির হিসাবে ইঁহারা কোন অংশে হিন্দু কবিগণ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। শাহজাঁহা বাদশাহ ব্রজভাষায় সুকবি ছিলেন। যখন আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন শাহজাঁহা ব্যথিতচিত্তে ব্রজভাষায় এই কবিতা রচনা করিয়া পুত্রের নিকট দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—

"জন্মতহী লখ্ দান দিয়ো
হক্ক নাম ধরেয়া নবরঙ্গবিহারা।
বালহি সোঁ প্রতিপাল কিয়ো,
অরু দেশ মুলুক্ দিয়ো দল ভারী॥
সো সুত বৈর বুঝ্যা মন্ সে ধরি,
হায় দিয়ো বন্ধ সারি মেম ভারী।
শাহজাঁহা বিনবায় হরি সোঁ বলি,
রাজীব নয়ন বজায় তিহারী॥

অর্থাৎ যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে আমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলাম, আদর করিয়া যাহার নাম রাখিয়াছিলাম নবরঙ্গবিহারী, যাহাকে বালককাল হইতে প্রতিপালন করিয়া তুলিয়া, রাজ্য, ধন, সম্পদ ও সেনা দিয়া মানুষ করিয়াছিলাম—সেই পুত্র আমার সহিত শত্রুতা করিয়া আমায় মর্ম্মাহত করিয়াছে, আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাই শাহজাঁহা শ্রীহরির নিকট বিনয়বচনে প্রার্থনা করিতেছে যেন তাঁহার রাজীবনয়ন এই হতভাগ্যের উপর স্থির থাকে! মোগলদিগের প্রাধান্য কালে ব্রজভাষার কবিদিগের প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টি কম ছিল না। রাজা বীরবল কেশবদাসকে একটা শ্লোকের জন্য লক্ষমুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। কেশবদাস তেমনি তেজস্বী কবি, সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অম্বরপতি মহারাজ মানসিংহ একটা কবিতা তিনবার শুনিয়া কবিকে তিনলক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। মহারাজ জয়সিংহ কবি বিহারী দাসকে প্রত্যেক

দোঁহার জন্য দুই সহস্র মুদ্রা দিয়াছিলেন। মহারাজ শিবাজী ভূষণ কবির একটা শ্লোক চৌষট্টিবার শুনিয়া চৌষট্টিটা হাতী এবং চৌষট্টি তোড়া টাকা দিয়াছিলেন। কেবলই ভক্তির ভাব লইয়া হিন্দী কবিগণ কাব্য রচনা করিতেন না। বীররসের—দেশহিতৈষণার কথায় পূর্ণ কবিতার অসদ্ভাব ছিল না। মহারাণা প্রতাপ ও মহারাজ শিবাজীর দরবারে বীররস প্রধান কবিগণ প্রতিপালিত হইতেন। বাদশাহদরবারে যে সকল কবি প্রতিপালিত হইতেন, তাঁহাদের তেজও বড় অল্প ছিল না। আওরঙ্গজেব যখন হিন্দুদের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেছিলেন তখন তাঁহার দরবারের হিন্দ কবি বাদশাহকে শত ধিক্কার দিয়া বাদশাহের প্রতি নিষ্ঠীবন বর্জ্জন করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মতন বাদশাহের সাহসে কুলায় নাই যে এমন দুরন্ত কবির শিরশ্ছেদের হুকুম দেন। তখন কবিদিগের ও সুপণ্ডিতের প্রতাপ ও প্রভাব এতই ছিল। বড় বড় রাজামহারাজা এবং নবাববাদশাহ, কবি ও শায়েরগণকে প্রতিপালন করিবার অধিকার পাইলে নিজেদের জীবন সার্থক হইল মনে করিতেন। ধনীদিগের এতটা পোষকতা ছিল বলিয়াই ব্রজভাষার এমন অত্যুন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল।

মুসলমান কবিগণের এবং মোগল বাদশাহদিগের প্রাধান্য ব্রজভাষায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ফল এই হইয়াছিল যে, ব্রজভাষায় ও হিন্দী ভাষায় অসংখ্য আরবী ও পারসী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। চন্দ বরদইয়ের মহাকাব্যে অনেকগুলি আরবী ও পেন্দুবী ফারসীয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে জায়সী, নাগরী দাস, কবীর, খোস্‌রো, রহিম, খান্‌খান'ন্‌ প্রভৃতি কবিগণ অবাধে ফারসী ও আরবী শব্দ সকল ব্রজভাষায় চালাইয়াছিলেন আমরা যেমন আজকাল চলিত বাঙ্গলাভাষায় শতকরা নব্বইটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তখনও তেমনি মুসলমানশিক্ষা প্রভাবে সুশিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রেই বহু ফারসী ও আরবী শব্দ কথায় কথায় ব্যবহার করিতেন। নাগরীদাস প্রেমের ব্যাখ্যান কেমন ভাষায় করিয়াছেন একবার শ্রবণ করুন—

"প্রেম উসীকো ঝলক্ হ্যায়,
জ্যোঁ সুরজ কী ধুপ।
যাহা প্রেম তাঁহা আপ হ্যায় ;
কাদির-নাদির রূপ ॥
ইস্ক চমন্ মহবুব কা
উহাঁ ন জায়ে কোয়।
যায় সো জায়ে নহিঁ,
জীয়ে তো বোরা হোয় ॥"

অর্থাৎ সূর্য্যের যেমন রৌদ্রই তেজোব্যঞ্জক, প্রেম তেমনই ভগবানের প্রকাশক। যেমন যেখানে রৌদ্র দেখিবে সেইখানেই অনুমান করিবে যে উপরে সূর্য্যের প্রকাশ আছে, তেমনি যাহাতে প্রেমের বিকাশ দেখিবে, তাহার মাথার উপর শ্রীভগবানের অবস্থিতির অনুমান করিতে হইবে। যে দেশে ভগবৎপ্রেমের দামিনীদীপ্তি নিত্য স্থির থাকে সে দেশে কেহ যাইতে পারে না, যে যায় সে মরে, যদি না মরে—বাঁচিয়া থাকে, তবে সে পাগল হয়। উহাই ভগবানের রূপসাগর। সিদ্ধান্ত কথাটা ষোল আনা ভক্তি শাস্ত্রের অনুকূল, অথচ বলা হইল এক বিষম জারজ ভাষায়। আমাদের কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র,

রামপ্রসাদও এই ফারসীর প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাদের রচিত আধা ফার্সী এবং আধা বাঙ্গলা শ্লোকের এখন তেমন প্রচলন নাই; কেনন' আমরা যে একেবারেই ফারসীটা মুছিয়া ফেলিয়াছি।

মুসলমান প্রভাবের এই বর্জ্জন বাঙ্গালী এক পুরুষেই সাধন করিয়াছিলেন। ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফার্সীদাঁ বাঙ্গালী ছিলেন; আর বঙ্কিমচন্দ্র উর্দ্দু ফারসীর বড় ধার ধারিতেন না। তাঁহার রচিত কপালকুণ্ডলায়, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসে তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় বাঙ্গালীর মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ মুন্সী ছিলেন; আর তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটা ফারসী বা উর্দ্দু বাক্য শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সুন্দর ফারসী বলিতে পারিতেন; তাঁহার আবৃত্তি নির্দ্দোষ ছিল; আর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একজনও তাঁহার মতন হিন্দী ফারসীতে ব্যুৎপন্ন হইলেন না। এই কথাটা এমন করিয়া বার বার বলিবার হেতু এই যে, ব্রজভাষা এবং হিন্দী ও উর্দ্দুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে, ঈশ্বরগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত যে বাঙ্গলাভাষা বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, আমাদের পক্ষে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। আধুনিক বাঙ্গলাভাষার দুইটি বেদী;—এক বেদীর দেবতা কবিকঙ্কণ, জয়ানন্দ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, অন্য বেদীর দেবতা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি। এই দুই বেদীর সম্যক্ পরিচয় রাখিতে হইলে হিন্দী, উর্দ্দু, ব্রজভাষা জানিয়া রাখা অত্যাবশ্যক। হিন্দুস্থানের কবি ও লেখকগণের মধ্যে এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র খুব ভাল ফারসী জানিতেন; রাজা শিবপ্রসাদ ভারত গবর্ণমেণ্টের পর-রাষ্ট্রবিভাগের মীর মুন্সী ছিলেন। ফারসী ভাষায় কবিতা লিখিতে তাঁহার তুল্য সে সময়ে ভারতবর্ষে খুব কম হিন্দু বা মুসলমান ছিল। হিন্দুস্থানের আধুনিক হিন্দী লেখক ও কবিগণ প্রায় সবাই প্রাচীন হিন্দী, ব্রজভাষা, ফারসী ও উর্দ্দু জানেন। সুতরাং তাঁহারা যেভাবে ভাষার ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া কাজ করিতে পারিবেন, বাঙ্গলার আধুনিক লেখকগণ তাহা পারেন না—জানেন না। ফলে, এক হিসাবে আধুনিক হিন্দী ভাষার বনীয়াদ মজবুত হইয়াছে; ভাষার পারম্পর্য্য সুরক্ষিত হইতেছে। বুঝি বা অচিরে আধুনিক হিন্দী গদ্য পদ্য বাঙ্গলা অপেক্ষা প্রশস্ততর ও প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিবে। হিন্দী ভাষায় হিন্দু ধাতু রক্ষা করিবার জন্য কাশীর পণ্ডিতগণ সদৈব চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত ছোট্টুলাল, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, পণ্ডিত রামমিত্র শাস্ত্রী প্রভৃতি লেখকগণ কাশীর প্রাধান্য হিন্দী ভাষার উপর বজায় রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রভাব আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। মদনমোহন, রামগতি, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত লেখকগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার উপর যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বড় সাধ করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ইংরেজের প্রচলনা-

ধিক্য ঘটাইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজের ইংরেজিনবীশ ছাত্রগণ প'রে বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন; কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত হরপসাদ শাস্ত্রী ছাড়া আর কেহই বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিতে পারেন নাই। হিন্দুস্থানের বড় বড় হিন্দী লেখক ও কবিগণ আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষার গদ্য ও পদ্য যতদিন হিন্দী, গুজরাটী, মারহাটী প্রভৃতি আধুনিক উন্নত প্রাদেশিক ভাষার সহিত সমসূত্রে সংবদ্ধ থাকিবে, ততদিন উহার প্রভাব আমরা অনুভব করিতে পারিব, উহা দ্বারায় যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারিব; পরন্তু বাঙ্গলা যদি ভারতবর্ষের সংস্রব ছাড়িয়া ইউরোপের আদর্শে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমরা সত্ত্ব সত্ত্ব উহার দ্বারা লাভবান্ হইতে পারিব না। এ কথাটা আমাদের ভাবিবার বিষয়। সে ভাবনাটা যাহাতে প্রগাঢ় হয়, সেই আশায় বাবু বদরীনারায়ণের অভিভাষণ অবলম্বনে আপাততঃ গোটাকয়েক কথা বলিয়া রাখিলাম।

আধুনিক হিন্দী গদ্যের যে গতি হইয়াছে আধুনিক বাঙ্গলা গদ্যেরও প্রায় সেই গতি হইয়াছে। আধুনিক হিন্দী গদ্য রাজদ্বারের, রাজসভার, বিচারালয়ের, এবং ভদ্রসমাজের সুপ্রচলিত ভাষা নহে। উর্দ্দূ এখনও সে সকল স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। জন কয়েক সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত, জন কয়েক ধর্ম্মপ্রচারক বক্তা, জন কয়েক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাময়িকপত্রের লেখক, জন কয়েক গ্রন্থকার এই আধুনিক হিন্দী ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে হিন্দী ভাগলপুর হইতে লাহোর পর্য্যন্ত প্রচলিত সে হিন্দী একটা ভাষা নহে; অগণ্য প্রাদেশিক ভাষার সমষ্টি মাত্র। এক এক জেলার এক একটা স্বতন্ত্র ভাষা। এই প্রাদেশিক ভাষা লোকসমাজে প্রচলিত, ঘরে বাহিরে ব্যবহৃত। সজ্জনসমাজে, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী মধ্যে উর্দ্দূর প্রচলন অধিক; এখন আবার ইংরেজির চলন ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের সাধু ভাষারও ঐ একই গতি হইয়াছে। খবরের কাগজে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, হেমনবীনের কাব্যে যে বাঙ্গলা পড়িতে পাও, বক্তার মুখে, ধর্ম্ম প্রচারকের মুখে যে বাঙ্গলা শুনিতে পাও, তাহা বাঙ্গলার লোক সাধারণের ভাষা নহে, তাহাদের বোধগম্য ভাষাও নহে। হিন্দীর মত বাঙ্গলার অগণ্য প্রাদেশিক ভাষা না থাকিলেও উচ্চারণবৈষম্যে ময়মনসিংহের বাঙ্গালী বাঁকুড়ার বাঙ্গালীর কথা এক বর্ণও বুঝিতে পারে না। অথচ বাঙ্গলার যাহা সাধু ভাষা তাহা এখনও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগে এই সাধুভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক সকলের পঠন পাঠন ব্যবস্থা এতদিন স্থির থাকাতে বাঙ্গলার সর্ব্বজেলাতেই ভাষার একটা সমতা ঘটিয়াছে বটে; পরন্তু ইংরেজিনবিশ প্রতিভাশালী লেখক যদি খোস্ মেজাজে একটা স্বতন্ত্র গদ্যের সৃষ্টি করেন, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ যদি মুসলমানদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র বাঙ্গলা ভাষার উদ্ভাবনে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট বাঙ্গলা গদ্যের পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য হেতুই আধুনিক বাঙ্গলা গদ্যের

এতটা প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে, সে আনুকূল্যে বঞ্চিত হইলে প্রমাদ ঘটিতে পারে। হিন্দীও কতকটা সরকারী অনুগ্রহে পরিপুষ্ট সে অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলে হিন্দীর দশাও বিষম হইতে পারে। মুসলমানযুগের হিন্দী ও বাঙ্গলা রাজ-আদরে সুরক্ষিত ছিল ইংরেজের আমলের নবীন হিন্দী ও বাঙ্গলা রাজ-আদরে উৎপন্ন হয়। পরন্তু মুসলমানের আমলের হিন্দী ও বাঙ্গলা ধর্ম্মের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই এখনও টীকিয়া আছে। তুলসীকৃত রামায়ণ, বেদ-বাইবেল কোরাণের মত এখনও হিন্দুস্থানের গ্রামে গ্রামে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয় এখনও বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে প্রতি মুদীখানার দোকানে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পঠিত হয়—ধর্ম্মপুস্তকের হিসাবে পঠিত এবং অর্চ্চিত হয়। মুসলমানের আমলের হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষা ধর্ম্মপ্রচার কল্পে ধর্ম্মব্যাখ্যা কল্পে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই সে ভাষা অনায়াসে লোকসাধারণের গ্রাহ্য ও মান্য হইয়াছিল; কেন না সে যে লোকসাধারণের নিজস্ব ভাষা ছিল। আর এখনকার নবীন হিন্দী ও বাঙ্গলা সাহিত্য ও ভাষা কতকটা টবের ফুলের মতন যাহার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে উহার কেয়ারী করিতেছে, কাট-ছাঁট করিতেছে। দেশের লোকসাধারণ কেবল উহা দূর হইতে দেখিতেছে, ভয়ে উহাকে অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। লোকসাধারণের এই সঙ্কোচ এবং ইংরেজি-নবীশ বাঙ্গলা লেখকদিগের খোস্ মেজাজ, আর পরোক্ষে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য এই তিন বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আধুনিক নানাবিধ প্রাদেশিক সাহিত্য যে কোন্ পথে পুষ্ট হইবে, তাহা বলা কঠিন। বলা কঠিন জানিয়াই, হিন্দীর পরিচয় একটু দিলাম। ভবিষ্যৎ ভাবিবার সময় আসিয়াছে জানিয়াও হিন্দীর কথা তুলিয়াছি।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌন্দর্য্য-বোধ

সৌন্দর্য্যবোধকে মানবের বিশেষত্ব বলা হইয়া থাকে। কোন কোন বর্ণে, মূর্ত্তিতে ও শব্দে সুখবোধ হয়, ইহাকেই সৌন্দর্য্য বোধ বলিতেছি। শিক্ষিত ব্যক্তির এই বোধের সহিত নানা জটিল ভাব এবং চিন্তাপরম্পরা ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত থাকে। যখন দেখি যে, পুংজাতীয় পক্ষী স্ত্রীজাতীয়গণের সমক্ষে স্বীয় সুন্দর পক্ষ অথবা উজ্জ্বল বর্ণ প্রদর্শন করিতেছে এবং যাহাদিগের ঐ সকল শোভা নাই, তাহারা বিস্তার করে না, তখন বিবেচনা করিতেই হয় যে, পুংগণের সৌন্দর্য্য স্ত্রীগণ ভাল বলিয়া মনে করে; ইহাতে সন্দেহ করা যায় না। নারীগণ এই সকল পক্ষ দ্বারা বেশ-বিন্যাস করে, সুতরাং এ সকল যে শোভন পদার্থ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরে দেখাইব, হামিং*

* আমেরিকার ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

পক্ষীর বাসা এবং বাওয়ার পক্ষীব খেলা করিবার পক্ষ নানারূপ রঙ্গিন পদার্থে রুচিপূর্ব্বক অলঙ্কৃত, ইহাতে বোধ হয়, ঐ সমস্ত পদার্থ দেখিয়া উহাদিগের চক্ষের সুখ হয়। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে অধিকাংশ জন্তুরই সৌন্দর্য্য-বোধ স্ত্রী-পুরুষের সৌন্দর্য্য এবং দাম্পত্য আকর্ষণেই সীমাবদ্ধ। পুংজাতীয় পক্ষিগণ কাম-কালে যে সকল সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি করে, তাহা স্ত্রীজাতীয়গণ নিশ্চয়ই ভাল বাসে, ইহা আমরা পরে প্রমাণ করিব। স্ত্রীগণ যদি পুংপক্ষিগণের সুন্দর বর্ণ, অলঙ্কার ও স্বরলহরী না ভালবাসিত, তাহা হইলে পুংগণের আগ্রহ ও ক্লেশ স্বীকার করত ঐ সকল স্ত্রী-গণের সমক্ষে প্রদর্শন করা বৃথাই হইত, কিন্তু উহা যে বৃথা, এ কথা স্বীকার করা অসম্ভব। কোন কোন উজ্জ্বল বর্ণ দেখিয়া সুখ হয় কেন তাহা বলা যায় না; তেমনই কোন কোন গন্ধ এবং আস্বাদ ভাল লাগে কেন তাহাও বলা যায় না। কিন্তু ইহার সহিত অভ্যাসের কিছু-না-কিছু যোগ আছে; কারণ, যে গন্ধ, স্বাদ কিংবা দৃশ্য প্রথমে অপ্রিয় বোধ হয়, তাহাও অব-শেষে ভাল লাগিতে পারে; অভ্যাস বংশগত *। কোন কোন স্বরসংযোগ মিষ্ট লাগে কেন, তাহা শারীরতত্ত্বের বিধান অনুসারেই হেল্‌ম্‌-হোল্টস্‌ বুঝাইয়া দিয়াছেন। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও অসম কালব্যবধানে † পুনঃ পুনঃ ধ্বনি করিলে বড়ই অপ্রীতিকর হয়; জাহাজের দড়ি অসমকাল পর পর [বায়ুভরে] যেরূপ শব্দ করে, তাহা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই এ কথা স্বীকার করিবেন। দৃষ্টি সম্বন্ধেও এই-রূপই হয়, কারণ, সমকাল পরে পরে যে দৃশ্য চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হয়, অথবা যে দৃশ্যের আকৃতি সর্ব্বত্র সম-অনুপাতে মিল আছে, তাহাই চক্ষু সুখজনক বোধ করে। এইপ্রকার চিত্র নিতান্ত অনুন্নত অসভ্যগণও অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহার করে; পুংজাতীয় জন্তুগণের শোভা-বর্দ্ধনার্থ দাম্পত্য নির্ব্বাচন-বিধান অনুসারে ইহা পুষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দৃশ্য দর্শনে ও ধ্বনি শ্রবণে সুখ হয় কেন, তাহার কারণ বলিতে পারি অথবা না পারি, কিন্তু একই প্রকার ধ্বনি, একই প্রকার বর্ণ আলো ও ছায়াপাত, একই প্রকার মূর্ত্তি মানুষ এবং অনেকানেক জন্তুতে ভালবাসে, [ইহা সত্য]।

সৌন্দর্য্যবোধ বিশেষতঃ স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্যা-নুভূতি, মানব-মনের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকারের বৃত্তি নহে; কারণ বিভিন্নজাতীয় মানবের সৌন্দর্য্য-বোধ বিভিন্ন, এবং একজাতীয় মানব মধ্যেও বিভিন্ন শাখার সৌন্দর্য্য-বোধ সমান নহে। অধিকাংশ অসভ্য মানব যে প্রকার জঘন্য অলঙ্কার ব্যবহার এবং বীভৎস সঙ্গীত করিয়া থাকে তদ্দৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, পক্ষী প্রভৃতি কতিপয় ইতর প্রাণীর অপেক্ষাও উহাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধ নিম্নশ্রেণীর। রাত্রি-কালের আকাশের শোভা, অথবা ধরাপৃষ্ঠের কোন সুন্দর চিত্র কিংবা পরিমার্জ্জিত সঙ্গীত কোন ইতর জন্তুই উপভোগ করিতে সমর্থ নহে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এ সকল উচ্চ-শ্রেণীর রুচি অনুশীলনলব্ধ এবং নানাবিধ জটিল ভাব-সমবায়ের উপর নির্ভর করে; উহা অসভ্যগণ অথবা অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও উপ-ভোগ করিতে পারে না।

কল্পনা-শক্তি বিস্ময়, কৌতুহল, সাধারণ

* ইহা এক্ষণে স্বীকৃত হইতেছে না।

† অর্থাৎ মাত্রা ঠিক রাখিয়া।

সৌন্দর্য্য-বোধ, অনুকরণেচ্ছা, উত্তেজনা, নূতনত্বাসক্তি ইত্যাদি যে সকল বৃত্তি মানবের উত্তরোত্তর উন্নতির অশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহারা আচার-ব্যবহার এবং রীতি বিষয়েও খামখেয়ালি অব্যবস্থিত পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া পারে নাই। একজন সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, যদৃচ্ছা অথবা খাম্-খেয়ালী পশুর সহিত অসভ্য মানবের অতিশয় উল্লেখ-যোগ্য সাধারণ প্রভেদ, এই নিমিত্তই এ কথা উল্লেখ করিলাম। কেবল যে মানুষই নানা কারণে অব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে, পরে দেখাইব যে, ইতর জন্তুগণও স্নেহ বিদ্বেষ অথবা সৌন্দর্য্য-বোধ সম্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ত ;—ইহার কারণ আমরা অংশতঃ বুঝিতে পারি। নূতনকে নূতনত্ববশতই উহারাও ভালবাসে, এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মবোধ। মানুষ যে প্রথম হইতেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এ বিশ্বাস মানবকে উন্নত করে। পক্ষান্তরে যাঁহারা তাড়াতাড়ি একটা দেশ ভ্রমণ করিয়া ফেলেন, শুধু তাঁহারা নহে, যাহারা দীর্ঘকাল অসভ্য মানবের সহিত বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বলেন যে, অনেক অসভ্য জাতি পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, যাহাদিগের এক অথবা একাধিক ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই, এবং তাহাদিগের ভাষায় ঐ ধারণা প্রকাশ করিবার কোন শব্দও নাই। ঐ ধারণা এবং জগৎস্রষ্টা বিশ্বশাসনকারী কেহ আছেন কি না এ কথা সম্পূর্ণ পৃথক্। কতিপয় উচ্চতম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্রষ্টা ও শাস্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু যদি "ধর্ম্মবোধ" বলিতে অতীন্দ্রিয় প্রেতাত্মায় বিশ্বাস বুঝিয়া লই, তবে কথাটা ভিন্নরূপ হইয়া উঠে কারণ, ঐ সকলে বিশ্বাস অনুন্নত জাতিগণের সর্ব্বত্রই আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিরূপে তাহাদিগের ঐ সকল বিশ্বাস জাত হইল তাহা বুঝা কঠিন নহে। যে মুহূর্ত্তে কল্পনা, বিস্ময়, কৌতূহল এবং কিয়ৎপরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তি মানব-মনে আংশিক-রূপেও বিকশিত হইয়াছিল, তখন হইতে মানবের স্বভাবতঃ চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলী বুঝিতে ইচ্ছুক হওয়া এবং নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অস্পষ্টভাবে চিন্তা করা সম্ভব। মিঃ ম্যাক্লেনান্ বলিয়াছেন "জীবন পদার্থটা কি, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত একটা কিছু সে কল্পনা করিয়া ফেলিবে ; এবং সর্ব্বত্রই যেরূপ দেখা যায় তাহা হইতে বোধ হয় যে, উদ্ভিদ জন্তু এবং যাবতীয় পদার্থে ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহে নিজের ন্যায় আত্মা আরোপ করাই মানব-মনের প্রথম কল্পনা।' মিঃ টাইলার বলেন স্বপ্নদর্শন হইতেই আত্মার ধারণা প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল ; ইহাই সম্ভব, কারণ অসভ্যগণ নিজের আত্ম-বোধ হইতে বহির্জ্জগতের বোধকে পৃথক্ মনে করে না। অসভ্য যখন স্বপ্ন দেখে তখন সে বিশ্বাস করে যে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি-গুলি কোন দূরদেশ হইতে আসিয়া তাহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে ; অথবা স্বপ্নদর্শকের আত্মা দেহ হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্র গিয়া যাহা দেখিয়াছে তাহার স্মৃতি সহ দেহ মধ্যে পুনরাগত হইয়াছে। * কিন্তু যে

* এই বিশ্বাস অসভ্যতার লক্ষণ নহে। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঘটনা; এবং অতি উন্নত আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিণাম অনুবাদক।

পর্য্যন্ত মানবমনে কল্পনা, কৌতূহল বুদ্ধি ইত্যাদি একটু ভালমত বিকশিত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত মানব স্বপ্নদর্শন হইতে আত্মবিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় নাই। কুকুরগণ স্বপ্নদর্শন হইতে ঐরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না।

আমি একবার এক সামান্য ঘটনা দেখিয়াছিলাম তাহা হইতে বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে অসভ্য মানবের মনেও প্রাকৃতিক বস্তু এবং প্রাকৃতিক কারণসমূহে আত্মা অথবা চেতনা আরোপ করিবার প্রবৃত্তি আছে আমার এক প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান্ কুকুর একদিন বিস্তৃত ঘাসের প্রাঙ্গণে শুইয়াছিল; সে দিনটী গরম ও নিস্তব্ধ ছিল। কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বায়ুতে একটী খোলা ছাতা নড়িতেছিল, যদি কোন মানুষ ঐ ছাতার নিকট থাকিত তবে কুকুর ঐ ছাতা নড়া গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু প্রত্যেকবার ছাতাটী একটু নড়িলেই কুকুর ভয়ঙ্কর স্বরে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে ও ডাকিতে লাগিল। আমার বিবেচনা হয়, কুকুর তাড়াতাড়ি নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল যে, 'ছাতা নড়ে অথচ কোন কারণ দেখা যায় না, সুতরাং কোন অপরিচিত চেতনাযুক্ত কর্ত্তা ঐ কম্ম করিতেছে, এবং তাহার দখলী সীমার মধ্যে কোন অপরিচিতের আসিবার অধিকার নাই।'

অদৃশ্য চৈতন্যময় কর্ত্তাতে বিশ্বাস হইলে এক অথবা একাধিক ঈশ্বর বিশ্বাস করা সহজ হয়। ঐ বিশ্বাস সহজেই এই বিশ্বাসে পরিণত হয়। অসভ্যগণ নিজে যে সকল ভাবে উত্তেজিত হয়, যেরূপ বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা করে, অথবা বিচারপদ্ধতির যে প্রকার সরল ধারণা করিয়া থাকে, অদৃশ্য চৈতন্যময় কারণেও তাহাই আরোপ করে। ফিউজিয়ানগণ এ বিষয়ে যেন মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় আছে, কারণ বিগল্ নামক জাহাজের উপর ডাক্তার সাহেব নমুনা রাখিবার জন্য কতিপয় ছোট হংসশাবককে গুলি করিয়া মারিলে ইয়র্ক মিনষ্টার* অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "ও। মিষ্টার বিনো, খুব বৃষ্টি খুব বরফ, খুব হাওয়া †।" সে স্পষ্টই ভাবিয়াছিল, মানবের আহার নষ্ট করায় দণ্ড স্বরূপ ঐ সকল হইবে। আর একবার সে বলিয়াছিল যখন তাহার ভ্রাতা একজন জঙ্গলী লোককে হত্যা করিয়াছিল তখন দীর্ঘকাল ঝড় হইয়াছিল, অনেক বৃষ্টি ও বরফ পড়িয়াছিল। এরূপ কথা বলা সত্ত্বেও, ফিউজিয়ানগণের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকার, অথবা কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করার কিছুমাত্র চিহ্ন আমরা পাই নাই। জেমি বাটন্ দৃঢ়ভাবে দর্প করিয়া বলিত, (দর্প সত্যই), তাহার দেশে শয়তান (Devil) নাই। এই কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ অসভ্যগণ সদ্ভাববিশিষ্ট আত্মা অপেক্ষা অসৎ প্রেতাত্মাতে অধিক স্থলেই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

ধর্ম্মপ্রাণতা অতিশয় জটিল মিশ্রভাব। ভালবাসা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য কোন গুরুতর পুরুষে আত্ম-সমর্পণ, অতিমাত্র অধীনতা, ভয়, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, ভবিষ্যৎ ফল-কামনা এবং সম্ভবতঃ আরও অনেক ভাব মিশ্রিত হইয়া ঐ ভাব গঠিত হইয়াছে। বুদ্ধি ও নীতি বোধ কতক পরিমাণে উন্নত না হইলে কোন জীবই

* জাহাজের একজন ফিউজিয়ান অসভ্য।

† অর্থাৎ এ সকল হইবে।

এরূপ জটিল ভাবের অধিকারী হইতে পারে না। তথাপি, প্রভুর উপর কুকুরের গভীর ভালবাসা, সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, ও কিয়ৎপরিমাণ ভয় এবং অন্যান্য ভাব দেখিয়া উপরোক্ত ভাবের সুদূর আভাস পাওয়া যায়। কিছুদিন অনুপস্থিত থাকিবার পর কুকুর যখন তাহার প্রভুর নিকট প্রথম উপস্থিত হয়, অথবা যখন বানর ঐরূপ অনুপস্থিতির পর তাহার প্রীতি-ভাজন রক্ষকের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করে, তখন উহাদিগের ব্যবহার একরূপ হয়; আবার উহাদিগের স্বজাতীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ব্যবহার অন্যরূপ দেখা যায়। উহাদিগের স্বজাতীয় মিলনে আনন্দোচ্ছ্বাস কিছু কম হওয়া বোধ হয়, এবং তখন পরস্পরের সহিত ব্যবহারে, প্রত্যেক কর্ম্মেই এরূপ দেখায় যেন সকলেই সমান।

যে সকল উন্নত মনোবৃত্তি মানবকে প্রথমে অদৃশ্য প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী করিয়াছিল, পরে জড়পূজায়, বহু দেববাদে এবং অবশেষে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী করিয়াছে, তাহা হইতেই (যতদিন বুদ্ধির বিকাশ অল্প থাকে ততদিন নানাবিধ অদ্ভুত কুসংস্কার ও আচারব্যবহার উৎপন্ন হয়, সে সকলের অনেকগুলি চিন্তা করিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে রক্তপিপাসু দেবতার নিকট নরবলি; বিষ-প্রয়োগ অথবা অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির বিচার; ভূত প্রেত লইয়া যাদুগিরি ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সকল কুসংস্কারের কথা সময় সময় স্মরণ করা ভাল, কারণ তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, বুদ্ধির উন্নতির নিকট, বিজ্ঞানের নিকট এবং বংশপরম্পরায় জ্ঞানবৃদ্ধির নিকট আমরা কতদূর অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। সার জন লবক্ ভালই বলিয়াছেন, "অজ্ঞাত বিপদ্‌পাত হইবার ভয়ানক আতঙ্ক অসভ্যের জীবনকে যেন গভীর মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখে; তাহার সমস্ত আনন্দই তিক্ত হইয়া যায়। এ সকল আমাদিগের উচ্চতম বৃত্তি সকলের শোচনীয় গৌণ ফল; তেমনই ইতর জীবগণেরও সংজ্ঞাতবৃত্তিসকল সময় সময় আকস্মিক ভ্রমে পতিত হয়, উভয়ই তুল্য। *

শ্রীশশধর রায়।

---

* মানবের জন্মাধার প্রকাশ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃগয়া-বাহিনী

প্রভাতে নগর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কুমুদ-নিবাসের নিকট দিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ, নগরের লোকজন সেই পথের দিকে ছুটিয়াছে। বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক পুরুষ, ধনী দরিদ্র সকলের মুখেই কৌতূহলের চিহ্ন। এত লোকের সমাগম যে, সে রাজপথের পাশে দাঁড়াইবার স্থান নাই। উদ্যান, পুকুর-পার, নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখা পর্য্যন্ত—যে কোন স্থান হইতে পথ দৃষ্ট হইতে পাবে, সেখানেই লোক। গৃহের ছাদে, অলিন্দে, দ্বারে, গবাক্ষপাশে অসংখ্য স্ত্রীলোক উৎগ্রীব হইয়া পথের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতেছে।

রাজাধিরাজ অশোকদেব মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সেই পথ দিয়া সজ্জিত মৃগয়া-বাহিনী নগর অতিক্রম করিয়া যাইবে। প্রথমতঃ বাদ্যকরের দল দেখা দিল। তূরি, ভেরী, সিঙ্গা, দামামা, জয়ঢাক, খরতাল বাজাইতে বাজাইতে বাদকদল অগ্রসর হইল। তাহার পর শকটশ্রেণী—কোনটি দ্বিচক্র, কোনটির চারিচক্র, কোনটিতে দুই, কোনটীতে চারি অশ্ব সজ্জিত। প্রতিশকটে অস্ত্রধারী যোদ্ধা। তাহার পরে গজবাহিনী। প্রতিগজে চালক এবং দুই কি তিনজন ধনুর্ব্বাণ ভল্ল-ধারী যোদ্ধা। তাহার পর অশ্বারোহীর দল, তাহার পর পদাতিকের দল, তাহার পর আবার হস্তীশ্রেণী অশ্বের দল। এই সকল হস্তী এবং অশ্বারোহণে দৃঢ়গঠিত বলিষ্ঠকায় আরক্তনেত্র যুবতী যোদ্ধা। ইহাদের পরেই পথের উভয় পার্শ্ব দিয়া দুই দল প্রহরী দীর্ঘ স্থূল রজ্জু আবক্ষ উচ্চ করিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দর্শকবৃন্দকে এই রজ্জু-সীমার দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল সেই রজ্জু সীমার ভিতরে প্রবেশ দূরে থাকুক, কেহ তাহা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত। এই সীমার ভিতর দিয়া তখন বহু-সংখ্যক যুবতী প্রহরিণী পদব্রজে আগমন করিতে লাগিল। রাজাধিরাজ অশোক দেবের শরীররক্ষক এই সকল স্ত্রীপ্রহরীদিগের অপূর্ব্ব বেশ। কাহারও বদ্ধকুন্তলে দীর্ঘ কঙ্কতি, কাহারও বা পুষ্পগুচ্ছ; কাহারও দীর্ঘ কেশ পাশ স্থূল একবেণীবদ্ধ, বেণীমূল বিচিত্র কৌশেয় বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ; কর্ণে কুণ্ডল অথবা বলয়, আরক্ত নয়নে কজ্জল-লেখা; বক্ষ স্কন্ধ পৃষ্ঠদেশ চর্ম্মে আচ্ছাদিত, হস্তে শাণিত বর্শা, ভল্ল; কটিতে অসি। কাহারও হস্তে ধনু, পৃষ্ঠে তূণপূর্ণ শর, কটিতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা।

এই রমণীদলের মধ্যভাগে হস্তী-আরোহণে রাজাধিরাজ অশোকদেব। তাঁহার রাজবেশ, মৃগয়াস্থলে উপস্থিত হইলে এ বেশের পরিবর্ত্তন হইবে। মস্তকে মণিমাণিক্য মুকুট, গাত্রে

স্বর্ণখচিত বহুমূল্য অঙ্গরক্ষিণী, কর্ণে মুক্তাময় বলয়, ললাটে চন্দনলেখ, গলে মুক্তাহার, পদে শুভ্র পাদুকা। হস্তীরও অপূর্ব্ববেশ। তাহার বিশাল দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ স্বর্ণ-কোষে আবৃত, মধ্যভাগে স্বর্ণবলয়, পদচতুষ্টয়ে রৌপ্য নির্ম্মিত স্থূল "খাড়ুয়া," ললাট হইতে শুণ্ডের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এবং দুই কর্ণে গোরোচনা চর্চ্চা পৃষ্ঠ হইতে উভয় পার্শ্বে জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত মণিমুক্তার ঝালরযুক্ত বিচিত্র পুরু আস্তরণ। তদুপরি আসীন রাজাধিরাজের শিরে পার্শ্বস্থ পরিচারকধৃত বৃহৎ রাজছত্র, রবিরশ্মিপাতে ছত্রসংসক্ত মণিমুক্তাজাল দীপ্তি পাইতেছিল।

সেই বিরাট বাহিনীর পদভরে এবং দর্শকবৃন্দের উচ্চ জয়ধ্বনিতে ভূমিতল কম্পিত হইতেছিল। বাহিনী কুমুদ-নিবাসে প্রমীত সেনের গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রমীতসেন সবন্ধুবান্ধবে পথপার্শ্বে অবনত মস্তকে রাজাধিরাজের অভিবন্দনা করিলেন। অশোকদেব স্মিতমুখে সকলের প্রতি সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত করিলেন। বাহিনী পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল।

এমন সময় আজানুলম্বিত পীতবাসপরিহিত মুণ্ডিতমস্তক স্থিরনেত্র শীর্ণদেহ এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রহরীধৃত সেই সূত্রসীমায় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া যুক্ত করে উচ্চ গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল ;—

"মহারাজ, নগরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ প্রজা তোমার রাজ্যে নিরাপদে পরমসুখে বাস করিতেছে ; বনের পশুও তোমার প্রজা —"

তাহার বক্তব্য আর শেষ হইল না। অখণ্ড-প্রতাপশালী রাজাধিরাজ অশোকদেবকে কে এমন ভাবে সম্বোধন করিল, দেখিবার জন্য পার্শ্বস্থ লোক সমুৎসুক হইয়া অগ্রসর হইল। লোকের ঠেলাঠেলিতে বক্তার শরীরই রজ্জুর উপর হেলিয়া পড়িল। অমনি ভল্ল-ধারিণী এক ভীমাঙ্গী যুবতী প্রহরিণী ছুটিয়া আসিল, ভল্লদ্বারা বক্তাকে বিদ্ধ করিবার জন্য আঘাত করিল। আঘাত তাহার শরীরে লাগিল না, কিন্তু তাহার পরিহিত পীতবাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বোধ হয়, অতিরিক্ত মৈরেয় পানে প্রমত্তা প্রহরিণী লক্ষ্য স্থির করিতে পারে নাই ; সে পুনরায় ভল্ল উত্তোলন করিল। প্রমীতসেন ঘটনা দেখিয়া ক্ষিপ্র-গতিতে অগ্রসর হইলেন এবং বক্তাকে বাহু-বলে পশ্চাতে সরাইয়া নিজে প্রহরণীর লক্ষ্য হইলেন।

অসম্ভব অতর্কিত সম্বোধনে রাজাধিরাজের দৃষ্টি সেই ভিক্ষুবেশধারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্রহরিণীকে বিরত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, বলিলেন ;—

"নগরে ফিরিয়া বিচার করিব।"

তখন সেই বিপুল জনবাহিনী পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রহরিণী রমণীদলের পশ্চাতে আবার পদাতিকের দল, অশ্বারোহীর দল, ভারবাহী অশ্ব শকট এবং গোযান এবং তাহার রক্ষীদল। পরিশেষে দর্শকের দল সেই বাহিনীর অনুসরণ করিয়া চলিল।

এদিকে নগরপালের লোক আসিয়া ভিক্ষু-বেশধারীর হাত ধরিল। চারিদিগের লোক শিহরিয়া উঠিল। ভিক্ষু বন্দী হইলেন, তাঁহাকে ধর্ম্মপালের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। প্রমীতসেন প্রহরিণীর কার্য্যে বাধা দিয়া

ছিলেন, তাঁহাকেও যাইতে হইবে। তখন সেখানে বড় জনতা হইল।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রমীতের প্রতিভূ হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নগরপালের লোক স্বীকার হইল না। ধর্ম্মপালের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

দ্বিতলের গবাক্ষ হইতে উৎপলা এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া অতর্কিতে কাতর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপস্থিত আত্মীয়া, বয়স্যা, পরিচারিকা, দাসীবর্গ, কোলাহল করিয়া উঠিল। সে চীৎকারধ্বনি প্রমীতের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া গবাক্ষের দিকে চাহিলেন না, কিন্তু হাত উঁচু করিয়া নিষেধ সঙ্কেত করিলেন। ভিতর বাড়ী হইতে দাসদাসী অনুচর পরিজন ব্যাকুল-চিত্তে সেখানে ছুটিয়া আসিল।

প্রমীতসেন বলিলেন ;—

"অসঙ্গ উৎপলার কাছে যাও। উৎপলাকে বুঝাইয়া বল, চিন্তার কোন কারণ নাই। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে, তাঁহাকে বলিয়া আমি এখনি গৃহে ফিরিব।"

অসঙ্গ বলিলেন ;—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব, মৈত্রেয় ভিতরে যাইয়া দেবীকে শান্ত করুন।"

মৈত্রেয় উৎপলার নিকট গেলেন। এ দিকে অসঙ্গ প্রমীতকে বলিলেন ;—

"এই ভিক্ষু কে, চিনিতে পার ?"

"না ইঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

"আমার সন্দেহ হইতেছে ; না, ইনিই তিনি।"

"কে ?"

"ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ শাসক উপগুপ্ত দেব।"

ভিক্ষু উপগুপ্তের নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত। প্রমীত, অসঙ্গ এবং আরও অনেকে তাঁহাকে অভিবন্দনা করিলেন। কিন্তু নগরপালের লোক আর বিলম্ব করিল না। তখন উপগুপ্ত, প্রমীত, অসঙ্গ এবং প্রমীতের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে নগরপালের লোকের সঙ্গে ধর্ম্মপালের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরও অনেক লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই নগরে প্রচারিত হইল, ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং কুমুদনিবাসের প্রমীত সেন ধৃত হইয়া ধর্ম্মপালের নিকট নীত হইয়াছেন। উপগুপ্ত যে বিষম অপরাধের কার্য্য করিয়াছেন, সন্থ প্রাণদণ্ডই তাহার নির্দ্দিষ্ট শাস্তি। প্রমীতসেন উপগুপ্তকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজেও অপরাধী হইয়াছেন।

রাজাধিরাজ অশোকদেবের নির্ম্মম শাসন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নগরের লোক ভীত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঋণী না মুগ্ধা ?

পরদিন অপরাহ্ণে রাজপুরার অন্তঃপুর দ্বারে দুইটী যুবতীর সঙ্গে দ্বাররক্ষিণী প্রহরিণী-গণের কথা হইতেছিল। যুবতীদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা তাঁহার বয়স বিংশ বর্ষের অধিক হইবে না। দ্বিতীয়াও যুবতী, সম্ভবতঃ প্রথমার পরিচারিকা।

অন্তঃপুরের দ্বার খোলা, কিন্তু সেখানে

তিন চারিটী ভীমাঙ্গী যুবতী প্রহরিণীর কার্য্য করিতেছিল। তাহাদের মদবিহ্বল আরক্ত চক্ষে কজ্জল, কর্ণে কুণ্ডল, বদ্ধ কুন্তলে পুষ্প গুচ্ছ, বক্ষ পৃষ্ঠ বাহুমূল পর্য্যন্ত অশিথিল আংরাখায় আচ্ছাদিত। পরিধানের সাড়ী জানুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত, সাড়ীর অপর অংশ কটি হইতে অতি শিথিল বস্ত্রাকারে বক্ষ বাম অংশ এবং পৃষ্ঠদেশ ঘিরিয়া পুনর্ব্বার কটিতটে দৃঢ় বেষ্টিত। কটিবন্ধে কোষবদ্ধ অসি। নিকটে প্রাচীরগাত্রে লগ্ন শাণিত ভল্ল এবং বর্শা।

প্রহরিণীদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কি প্রয়োজন কাহার সঙ্গে দেখা করিবে ?"

বয়ঃকনিষ্ঠা বলিলেন ,—

"মহাদেবী কারুবকীর চরণদর্শন জন্য আসিয়াছি।"

"তাঁহার সঙ্গে এখন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, তিনি প্রমোদ-কক্ষে আছেন।"

"দেবী সংবাদ পাইলে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে পারেন, তোমরা কেহ অনুগ্রহ করিয়া সংবাদ দাও।"

"আমাদের কাহারও অবসর নাই।"

পরিচারিকা কহিল ,—"রাজ্ঞীর কৃপায় সময় সময় আমরা তাঁহার চরণদর্শন লাভ করিয়া থাকি। তোমরা কেহ দয়া করিলেই আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়।"

"তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে, আমাদের কি লাভ ?"

বয়ঃকনিষ্ঠা সুন্দরী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে তখন প্রহরিণীকে কি যেন বলিলেন। প্রহরিণী কিছু মৃদুভাব ধারণ করিল এবং রমণীদ্বয়কে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রহরিণী ফিরিয়া আসিয়া রমণীদ্বয়কে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

রাজাধিরাজ অশোকের বহু স্ত্রী, বহু পুত্র কন্যা। অন্তঃপুর মধ্যে রাজ্ঞীদিগের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, পরিচারিকা, দাসী ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রহরিণী রাজ্ঞী কারুবকীর গৃহাভিমুখে যুবতীদ্বয়কে লইয়া চলিল, পথেই দেবীর প্রিয় পরিচারিকা লীলার সঙ্গে দেখা হইল। তখন প্রহরিণী রমণীদ্বয়কে তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। পরিচারিকা যুবতীদিগকে চিনিত, বয়ঃকনিষ্ঠাকে বলিল ,—

"অনেক দিন পরে যে !"

"অনেকদিন পরেই এসেছি। দ্বারে কয়েকটী অপরিচিত প্রহরিণী, ভিতরে প্রবেশে বিলম্ব হইল। দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ?"

"উজ্জয়িনী হইতে এক বীণাবাদিনী গায়িকা আসিয়াছে, দেবী প্রমোদকক্ষে তাহার গীত শুনিতেছেন। চল, তুমি আসিয়াছ, সোনায় সোহাগা।"

"গীত কখন আরম্ভ হইয়াছে ?"

"অনেকক্ষণ, এখন শেষ হইয়া আসিল।"

"শেষ হইলেই ভাল।"

"কেন ? তুমি আসিয়াছ, দেবী কি তোমাকে ছাড়িবেন ?"

"আজ চিত্তে সুখ নাই, গাহিতে না হইলেই বাঁচি।"

"কি হইয়াছে ?—চল, তোমার প্রতি দেবীর অসীম দয়া।"

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সম্মুখের কক্ষ

হইতে বীণার স্বরলয়যুক্ত মধুর গীতধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। পরিচারিকা যুবতীদ্বয়কে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সুসজ্জিত বৃহৎ কক্ষ। তলদেশ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত। প্রাচীরে নানা বর্ণের প্রস্তর-বিন্যাসে গ্রথিত বিচিত্র ফল-ফুল পত্র পল্লবের চিত্র, মধুরমধুরী হংস কারণ্ডবের চিত্র, সশাবক মৃগমিথুনের চিত্র। স্থানে স্থানে প্রাচীরগাত্রে খোদিত ছোট ছোট ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ গহ্বরে ছোট ছোট হস্তী, অশ্ব, সবৎসা গাভীর প্রস্তরময় সুদৃশ্য প্রতিমূর্ত্তি। আর কীলকে কীলকে বিলম্বিত সুরভি ফুলের মালা। মেঝের একপার্শ্বে একখানি আসনে বসিয়া একটী যুবতী বীণার স্বর-লয়ে গান করিতেছিল। নিকটে পৃথক্ আসনে আরও কয়েকটী রমণী। কক্ষের প্রায় মধ্যস্থলে একখানি পালঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় বসিয়া রাজাধিরাজ অশোকদেবের প্রিয়তমা রাজ্ঞী দেবী কারুবকী গান শুনিতেছিলেন। রাজ্ঞীসুলভ অলঙ্কার সজ্জা তাঁহার কিছুই ছিল না। একমাত্র শিথিল বদ্ধবেণী তাঁহার নিবিড় বিপুল কেশরাশি পার্শ্বস্থ উপাধানের উপর দিয়া শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। শিরোদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কপোলে চন্দন-লেপ, আর গলদেশে মুক্তাহার। যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিবয়স্কা রাজ্ঞী কারুবকীর স্থির সৌম্যমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব কোমলতা প্রতিভাত হইতেছিল। দেবীর উজ্জ্বল, কোমল নয়নদ্বয় আনত, আর্দ্রপক্ষ্ম— গায়িকা অবশ্যই কোন করুণ গাথা গাহিতেছিল।

গীত শেষ হইল। এমন সময় রমণীদ্বয় পরিচারিকা লীলার সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেবী তাহাদিগকে দেখিয়াই বয়ঃকনিষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"মঞ্জুলা!"

মঞ্জুলা সসম্ভ্রমে মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া দেবীর চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল এবং কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া নতমস্তকে বলিল;—

"দাসী শ্রীচরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছে।"

"মঞ্জুলা, এবার অনেক দিন পরে তোমাকে দেখিলাম, ভাল আছ ত?"

"দেবীর আশীর্ব্বাদে ভালই আছি—"

বলিয়া মঞ্জুলা থামিয়া গেল।

"কি বলিতেছিলে, থামিলে কেন?"

দেবী চাহিয়া দেখিলেন মঞ্জুলার পরিচিত প্রফুল্ল মুখ আজ যেন কেমন উদ্বেগময়, তাহার নিত্য হাসিময় চঞ্চল চক্ষু আজ যেন কেমন স্থির, কেমন যেন বিষণ্ণ। দেবী বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কি হইয়াছে? আজ তোমার এ ভাব কেন?"

মঞ্জুলা মস্তক নত করিয়া রহিল। পরিচারিকার ইঙ্গিতে গায়িকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল; অন্য রমণীরাও ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দেবী বলিলেন;—

"কি বলিতে আসিয়াছ? কাছে এস, বল।"

মঞ্জুলা দেবীর নিকটে আসিল। দেবী তাহাকে বসিতে বলিলেন। মঞ্জুলা আসন ছাড়িয়া দেবীর পদমূলে ভূমিতে বসিল।

"কি বলিতেছিলে, বল।"

"শ্রীচরণে এক প্রার্থনা আছে।"

"কি প্রার্থনা ?"

"রাজাধিরাজ কাল গয়ায় গিয়াছেন—"

"তা ত জানি। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তোমার কোন অশুভ ঘটিয়াছে ?"

"না।"

"তবে কি ?"

"মহাত্মা ভিক্ষু উপগুপ্ত দেব বন্দী হইয়াছেন।"

"তা ও জানি।"

"যদি জান, মা, তবে এখন তাঁহার রক্ষার উপায় কর।"

"ভিক্ষু অপরাধ করিয়াছেন, রাজাধিরাজ তাহার বিচার করিবেন। আমার কাছে কেন ?"

মঞ্জুলা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। বড় আশা করিয়া মঞ্জুলা আসিয়াছে দেবী অবশ্যই একটা উপায় করিবেন। কিন্তু সকল আশা মিছা হইতে চলিল!

মঞ্জুলা বলিল,—

"আমি শুনিয়াছি, ভিক্ষুদেবকে আপনি ভক্তি করেন।"

"তুমি তাঁহাকে চেন ?"

"তাঁহাকে কে না চেনে ? আমিও দু-একবার তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

দেবীর আয়ত চক্ষু স্থির নিস্পন্দ হইল। মঞ্জুলা বলিতে লাগিল;—

"অভাগিনীর আমন্ত্রণে একদিন ভিক্ষুদেব আমার পাপগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।"

দেবী গদগদকণ্ঠে বলিলেন;—

"তোমার গৃহ পাপগৃহ নহে, মঞ্জুলা।"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া রহিল।

দেবী বলিলেন—"দেবতার আশীর্বাদে তোমার গৃহে পুণ্যাত্মার সমাগম হইয়াছিল।"

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাতে দেবীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া তাহাতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। দেবী তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—

"ভিক্ষুদেবের অপরাধ অতি গুরুতর, বিশেষতঃ বৌদ্ধ অপরাধীরা কেহই সহজে রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তথাপি আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা আমি করিব। কাজ বড় কঠিন, কিন্তু তুমি নিরাশ হইও না।"

মঞ্জুলা তখন দেবীর পাদমূলে ভূমিতলে পূর্ববৎ উপবেশন করিল।

"মঞ্জুলা, ভিক্ষুদেবকে কি নগরে অনেকেই চিনে ?"

"গৃহে গৃহে তাঁহার নাম, তাঁহার প্রসঙ্গ। সংসারত্যাগী মোহমুক্ত দয়ামায়ার মূর্তি ভিক্ষু-দেবকে ত সকলেই পূজা করে।"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেবী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।

সন্ধ্যা হইল। গন্ধ-তৈলপূর্ণ স্বর্ণ প্রদীপের আলোকে কক্ষ আলোকিত হইল গুগ্গুলের সুগন্ধে সমস্ত অন্তঃপুর সুরভিত হইল, পূজাগৃহে সান্ধ্যবন্দনা-সূচক শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। দেবী বলিলেন;—

"মঞ্জুলা একাকিনী আসিয়াছ ? কেমন করিয়া যাইবে ?"

"আমার সঙ্গে চঞ্চলা আসিয়াছে, বহির্দ্বারে শিবিকা সহ ভৃত্য বাহক অপেক্ষা করিতেছে।"

"উত্তম। ভিক্ষুদেবকে রক্ষার উপায় আমি করিব সন্ধ্যা হইয়াছে, তুমি আর বিলম্ব করিও না।"

মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আরও যেন কি বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না। দেবী বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন—

"আর কি ?"

মঞ্জুলা ইতস্ততঃ করিল, মুখ নত করিল শেষে বলিল—

"আরও এক জনকে নগরপালের লোক বন্দী করিয়াছে।"

"তাহাও জানি। প্রমীতসেনকে আবদ্ধ করিয়াছে।"

"তাঁহার কি উপায় হইবে ?"

দেবী বিস্মিত হইলেন, প্রমীতের সঙ্গে মঞ্জুলার কি সম্বন্ধ ? তিনি বলিলেন,—

"প্রমীতসেনের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ? তিনি তোমার কে ?"

মঞ্জুলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, দেবী এ কিরূপ প্রশ্ন করিতেছেন !

"তিনি আমার—আমার কেহ নহেন। একদিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

'অপরিচিত এক জনকে একদিন মাত্র দেখিয়াছ, তাহার জন্য এত ব্যস্ততা কেন ?"

মঞ্জুলা অতি মৃদুস্বরে বলিল ;—

"তাঁহাকে একদিন মাত্র দেখিয়াছি, কিন্তু সেই একদিন তিনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি চিরজীবন তাঁহার নিকট ঋণী।"

"কি হইয়াছিল ?"

মঞ্জুলা তখন ধীরে ধীরে সেই ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগের সন্ধ্যাকালে নগরোপকণ্ঠে দস্যুকর্তৃক আক্রমণ এবং প্রমীতসেন কর্তৃক নিজের উদ্ধার বিবরণ দেবীর নিকট বিবৃত করিল।

নগর জুড়িয়া প্রমীতসেনের প্রশংসা। রাজাধিরাজের মুখে প্রমীতসেনের কথা দেবী ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। প্রমীতসেন মৃত অমাত্য সুরসেনের পুত্র, অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী, রূপগুণে মান-মর্য্যাদায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে নগরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ যুবক, রাজাধিরাজের প্রিয় সভাসদ।

দেবীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা, না—তরুণ হৃদয়ে অচিরজাত প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি কোন নবীন ভাবের মোহকর প্রভাব ? চির ঋণী না প্রেম মুগ্ধা ? হঠাৎ একদিনে, এক নিমেষে ত কত অজেয় দুর্গ বিজিত হইয়া থাকে। এ যদি তাহাই হয়! দেবীর অনুসন্ধায়ী দৃষ্টিতে মঞ্জুলা আরক্ত মুখ অবনত করিল।

"তাহার পর আর কোন দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই ?"

"না।"

"তিনিও সে রাত্রির পর আর তোমার কোন তত্ত্ব করেন নাই।"

"না ; আমি যে কে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। আমি নিজ পরিচয় তাঁহাকে দিই নাই।"

"তাঁহার পরিচয় কেমন করিয়া পাইলে ?'

"আমি—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

দেবী কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—

"মঞ্জুলা, শুনিয়াছি, তোমার গৃহে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পণ্ডিত লোকের সমাগম হইয়া থাকে, প্রমীত সেন কোন দিন সেখানে যান নাই ?"

"না।"

"যিনি তোমার এত উপকার করিয়াছেন, একটি দিন তুমি তাঁহাকে আমন্ত্রণ কর নাই!"

"সাহস পাই নাই; তিনি কি আসিবেন?"

"কেন সন্দেহ কর?"

মঞ্জুলা নীরব হইয়া রহিল। মহারাজ্ঞী বলিলেন;—"দেখ, রূপে গুণে ধনসম্পদে তুমি যে দুর্লভা, তাহা তুমি জান না।—রাজাধিরাজ বলিয়াছেন, তোমার বিবাহে স্বয়ং তিনি উপস্থিত থাকিবেন।"

মঞ্জুলার মুখ আকর্ণ, রক্তাভ; শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার বক্ষ বিকম্পিত হইল। দেবী ত কোন দিন তাহার সঙ্গে এভাবের আলাপ করেন নাই!

রাজ্ঞী পুনরায় বলিলেন;—

"মঞ্জুলা, আজ অনেক কথা বলিলাম। তুমি এখন আর বালিকা নও, তুমি ভিক্ষুণীও নও; সংসারে আছ, সংসারী হও। রাজাধিরাজেরও তাহাই ইচ্ছা। প্রমীত সেন কোন অপরাধের কার্য্য করেন নাই, তাঁহার জন্য কোন আশঙ্কা করিও না; রাত্রি প্রভাতে তিনি মুক্ত হইয়া গৃহে যাইবেন। রাত্রি হইল, তুমি এখন গৃহে যাও।"

রাজ্ঞী মঞ্জুলাকে কাছে আনিয়া স্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিলেন। অবনমিত মস্তকে, থরকম্পিত হৃদয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া মঞ্জুলা বিদায় হইল। রাজ-পরিচারিকা লীলা অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বহির্দ্বারে তাহাকে শিবিকায় উঠাইয়া দিবার জন্য প্রহরিণীকে আদেশ জানাইয়া ফিরিয়া গেল।

(ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

বিষ্ণুপুরাণ।

এই পুরাণে শান্তনু হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, তাহার সহিত মহাভারতের কোন অনৈক্য নাই। ঐ পুরাণের ৪র্থ অংশ ২০ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়া পরীক্ষিতের উল্লেখকালে পরাশর বলিয়াছেন—

"যোঽয়ং সাম্প্রতং এতদ্ ভূমণ্ডলং ধর্ম্মেণ পালয়তি"

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত বংশাবলী বিষ্ণুপুরাণে পরীক্ষিতের সময়েই লেখা হয়। বিষ্ণুপুরাণের বক্তা ব্যাসের পিতা পরাশর, সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের বংশাবলীর প্রথম সংস্করণ পরীক্ষিতের সময় হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাগুক্ত ৪র্থ অংশের ২১ হইতে ২৩ পর্য্যন্ত অধ্যায়ে ভবিষ্য বংশাবলী দেওয়া আছে। ২১ অধ্যায় যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইতে

বেশ বুঝা যায় যে ভবিষ্যবংশ পরে ভিন্ন সময়ে পুরাণে প্রবিষ্ট। পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত বংশাবলী শুনিয়া মৈত্রেয়ের কৌতূহল মিটিল না, তিনি ভবিষ্যবংশ বলিতে লাগিলেন। ২১ অধ্যায়ের প্রারম্ভেও বলা হইয়াছে যে সম্প্রতি পরীক্ষিৎ রাজা এবং জনমেজয় প্রভৃতি তাঁহার চারি পুত্র ভাবিকালে হইবে। মগধের ভবিষ্যবংশও যে ক্রমশঃ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন ঐ পুরাণে পাওয়া যায়। আধুনিক সময়ে যেমন পুস্তকাদির সংস্করণ হইয়া থাকে ও পর-পরবর্ত্তী সংস্করণে পুস্তকের আকার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ পুরাকালে পুরাণাদিরও ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ হইয়াছিল এবং সেই সেই সংস্করণে ভবিষ্যবংশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিক ও প্রাচীন সংস্করণে প্রভেদ এই যে, আধুনিক সংস্কর্ত্তা যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থকার অপেক্ষা আপনাকে অধিক প্রকটিত করেন; আর প্রাচীন সংস্কর্ত্তা নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া গ্রন্থকারকেই ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া ফেলেন। সেই জন্যই প্রাচীন পুস্তকের বয়স নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। পুরাণের ভবিষ্যবংশে যবন তুখার প্রভৃতি নাম দেখিয়া পণ্ডিত H. H. Wilson পুরাণগুলিকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়াছিলেন। কিন্তু Alberuni প্রভৃতি মহম্মদীয়গণ পুরাণের উল্লেখ করায় বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণও পুরাণগুলিকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পুরাণ শব্দের উল্লেখ ভর্তৃহরি, মহাভাষ্য, পাণিনি প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিরোধের সমন্বয় এই রূপে করা যাইতে পারে যে, পুরাণগুলির পঞ্চম সংস্করণ বহু প্রাচীন এবং ক্রমশঃ অজ্ঞাতনামা সংস্কর্ত্তা কর্ত্তৃক তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ খৃষ্টের জন্মের পরও হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের চন্দ্রবংশের আদি সংস্করণ পরীক্ষিতের সময় হয় ও পরপরবর্ত্তী সংস্করণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত হইয়াছিল বলিলে ঐ পুরাণের উক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের বিরোধী হয় না। সুতরাং তাহা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত। একারণ আমরা বলিতে পারি যে মহাভারতের ইতিবৃত্ত, পরীক্ষিতের সময় হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত মূল গ্রন্থকার ও পরপরবর্ত্তী অজ্ঞাতনামা প্রচ্ছন্ন সংস্কর্ত্তৃগণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন।

(খ) ব্রহ্মাণ্ড।

এই পুরাণেও পাণ্ডবগণের ইতিবৃত্ত আছে। ইহার প্রথম সংস্করণ যে পরীক্ষিতের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র অধিসীম কৃষ্ণের সময় হয় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে। অনুষঙ্গপাদে অভিমন্যুর পর পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জনমেজয় ও পৌত্র শতানীক ও প্রপৌত্র অশ্বমেধ দত্ত ও বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পরপুরঞ্জয় বা অধিসীম কৃষ্ণ পর্য্যন্তের উল্লেখ করিয়া সূত বলিতেছেন—

অধিসীমঃ কৃষ্ণো ধর্ম্মাত্মা সাম্প্রতোহয়ং মহাযশাঃ।
যস্মিন্ প্রশাসতি মহীং যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্॥
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রীণি বর্ষাণি দুশ্চরম্।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ॥

হে দ্বিজোত্তমগণ এক্ষণে ধর্ম্মাত্মা মহাযশা অধিসীম কৃষ্ণই রাজা। তাঁহার রাজ্যকালে আপনারা এই দুর্ল্লভ দুশ্চর দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ ৫ বৎসর কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বতীতীরে করিতেছেন।

সূত এইরূপ অধিসীম কৃষ্ণ পর্য্যন্ত পরিচয় দিবার পর ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন--

শ্রোতুং ভবিষ্যমিচ্ছামঃ প্রজানং বৈ মহামতে।
সূতসার্দ্ধং নৃপৈর্ভাবং ব্যতীতং কীর্ত্তিতং ত্বয়া ॥

হে মহামতে সূত! আপনি যে সকল অতীত নৃপতিগণের কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহাদের সহিত ভবিষ্য নৃপগণের কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ গৌরচন্দ্রিকার পর সূত ভবিষ্যবংশ আরম্ভ করিলেন এবং নিচক্ষুঃ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত নাম করিলেন। মগধের ভবিষ্যর শও এইরূপ গৌরচন্দ্রিকার পর আরব্ধ। জরাসন্ধ-সুত সহদেব ভারতসংগ্রামে নিহত হন উল্লেখ করিয়া ক্ষোমাধি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বার্হদ্রথ নৃপগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ প্রণালী হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভবিষ্যবংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কর্ত্তা প্রচ্ছন্নভাবে পুরাণে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। তাহারা স্বীয় অস্তিত্ব ডুবাইতে চেষ্টা করিলেও অস্তিত্বের কিছু কিছু নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। এই জন্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের আদি সংস্করণ অধিসীম কৃষ্ণের সময় হইয়াছে ও ভবিষ্যবংশ ক্রমশঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত সত্য। সুতরাং অধিসীম কৃষ্ণের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য এবং তাঁহার সময় হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্ব বিশ্বস্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বায়ু পুরাণ

বায়ু পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুযায়ী বংশাবলী দেওয়া আছে। উহারও প্রথম সংস্করণ যে অধিসীম কৃষ্ণের সময়ে হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখান যাইতে পারে। ঐ পুরাণের শেষ সংস্করণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হইয়া থাকিলে উহা হইতেও প্রকাশ পায় যে অধিসীম কৃষ্ণের সময় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রন্থকার ও সংকর্ত্তা সকলেই যুধিষ্ঠিরাদিকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মৎস্য পুরাণ

মৎস্য পুরাণের চন্দ্রবংশ যে অধিসীম কৃষ্ণের সময় প্রথম লিখিত এবং ভবিষ্য-বংশাবলী তৎপরে ক্রমশঃ অন্তর্নিবিষ্ট হয় তাহা পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে প্রকাশ। ৬৫,৬৬ ও ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে সূত বলিতেছেন—

জনমেজয়াচ্ছতানীক স্তস্মাজ্জজ্ঞে সবীর্য্যবান্।
জনমেজয়ঃ শতানীকং পুত্রং রাজ্যেঽভিষিক্তবান্ ॥
অশ্বমেধত্রয়েণ শতানীকাৎ সবীর্য্যবান্।
জজ্ঞেঽশ্বমেধদত্তাখ্যঃ সুতস্তস্মাৎ সবীর্য্যবান্ ॥
জজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।
তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রন্তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্ ॥
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রীণি বর্ষাণি দুশ্চরম্।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥

জনমেজয় হইতে বীর্য্যবান্ শতানীক জন্মে। জনমেজয় পুত্র শতানীককে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করায় শতানীকের প্রবল পরাক্রান্ত অশ্বমেধ দত্ত নামক পুত্র হয়। শতানীক-নন্দন অশ্বমেধ দত্তের অধিসীম কৃষ্ণ নামক পুত্র জন্মে, সেই মহাযশাই সম্প্রতি রাজা। তাঁহার রাজ্যকালেই হে দ্বিজোত্তমগণ আপনারা এই দুরাপ, দুশ্চর, দীর্ঘসত্র যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বতীতীরে পঞ্চ বর্ষ ধরিয়া করিতেছেন। সূত এইরূপে অধিসীম কৃষ্ণ পর্য্যন্ত বংশ উল্লেখ করিবার পর মুনিগণ তাঁহাকে

ভবিষ্যবংশ বলিতে অনুরোধ করিলেন। শৌতি তদনুসারে নিচক্ষু হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত পাণ্ডুবংশ বর্ণনা করিলেন। মগধের ভবিষ্যবংশও ঐরূপ গৌরচন্দ্রিকার পর ২৭১ অধ্যায়ে বিবৃত। সুতরাং মৎস্য পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিসীম কৃষ্ণ হইতে অন্ধ্রবংশ পর্য্যন্ত যত সংস্কর্ত্তা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া বংশাবলীর সংস্করণ করিয়াছেন সকলেই যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত

ভাগবতের প্রথম সংস্করণ যে পরীক্ষিতের সময় হয় তাহা ভাগবতেই প্রকাশ। ব্যাসসুত শুকদেব ভাগবতের বক্তা ও পরীক্ষিৎ শ্রোতা। শুকদেব যে কল্পিত পুরুষ নহেন তাহা পতঞ্জলি, শাকটায়ন প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণ মহাশয়দের কৃপায় জানা যায়। সুতরাং ভাগবতের সারাংশ যে পরীক্ষিতের নিকট কথিত হয় তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভাগবতের বর্ত্তমান আকার যে সংস্কর্ত্তারই কৃত হউক না কেন, উপরোক্ত যুক্তিবলে ইহাদ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে পরীক্ষিতের কাল হইতে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাদির ঐতিহাসিকতা স্বীকৃত।

ব্যাকরণ

শকটায়ন

মহাভারতের ঐতিহাসিকতার দ্বিতীয় প্রমাণ ব্যাকরণ। পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন শকটায়নও যে স্বীয় ব্যাকরণে ব্যাস, বাসুদেব, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাভারতের চরিত্রগুলি, যে প্রকৃত জীব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তাহা মহাভারতের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখান হইবে।

পাণিনি

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এবং গণসূত্রে আমরা মহাভারতের যাবতীয় চরিত্রেরই নাম পাই। ইহা মহাভারতের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখান গিয়াছে।

কাত্যায়ন

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ব্যাসদেবের ও তৎপুত্রের ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ও প্রশিষ্য কঠ এবং চরকগণের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রও যে কাত্যায়নের বিদিত ছিল, তাহা পরে দেখান হইবে।

পতঞ্জলি

মহাভাষ্যে ভীম, নকুল, সহদেব প্রভৃতি কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের, শুকের, বৈশম্পায়নের এবং তচ্ছিষ্য কঠের ও কঠশিষ্য খাড়ায়নের নামও আছে।

ভর্ত্তৃহরি

ভর্ত্তৃহরিও স্বীয় কারিকায় কংসাদির উল্লেখ করিয়াছেন।

(ক্রমশ)

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন পুরাতন মোগল রাজধানী আগ্রানগরী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়, সেই সময় স্বর্গীয় নীলাম্বর সেন মহাশয় চাকরী উপলক্ষে আগ্রায় আগমন করেন; ইঁহার মাতামহ, মাতুল প্রভৃতি তখন আগ্রায় কমিসেরিয়েট এজেন্টের কার্য্য করিতেন।

স্বর্গীয় নীলাম্বর সেনের জন্মভূমি ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী নাটাগড় গ্রাম। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন—নাটাগড় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ইঁহাদের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। নীলাম্বর বাবুর পিতামহ রামকান্ত সেন তদানীন্তন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবিরাজ ছিলেন—আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'লক্ষণ' চিকিৎসায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তদীয় পুত্রগণও পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দের টোল ছিল—তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন এবং স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। মধ্যম গঙ্গানারায়ণ মুর্শিদাবাদে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন। নীলাম্বর বাবুর পিতা রাজনারায়ণও পাণ্ডিত্যে পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন।

সেকালে বাংলাদেশ হইতে যাহারা আগ্রায় আসিতে পারিত—তাহারা অর্থ উপার্জ্জনেও কৃতকার্য্য হইত। পুঁথিগত বিদ্যা সামান্য থাকিলেও নীলাম্বর বাবু, কর্ম্মনিষ্ঠা পরিশ্রম ও সততার গুণে ক্রমে ক্রমে আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হয়েন এবং বহুকাল ধরিয়া প্রশংসা ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬১ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নীলাম্বর বাবু যে প্রকার সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন—তাহা তখনকার কালেও দুর্লভ ছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের জজ প্রভৃতি উচ্চ ইংরাজরাজকর্ম্মচারী হইতে আগ্রার জনসাধারণ সকলেই ইঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। চরিত্রবলে এবং অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলের প্রীতি ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার জীবনের এক সময়ের ঘটনা হইতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝা যাইবে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন সর্দ্দার হরিসিং তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ জাঠসৈন্য লইয়া আগ্রা আক্রমণ করিলেন—তখন সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীকেই সপরিবারে আগ্রাদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বাঙ্গালীরা ইংরাজভক্ত বলিয়া তাহাদের উপর বিদ্রোহীদিগের বিশেষ আক্রোশ—তাই জজ সাহেব প্রভৃতি নীলাম্বর বাবুকেও সপরিবারে দুর্গে থাকিবার জন্য বলিলেন, কিন্তু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নীলাম্বর বাবু তাহাতে রাজী হইলেন না—সাহেবেরা তাঁহার এ প্রকার নির্ভীকতায় বিস্মিত হইলেন। নীলাম্বর বাবু আদালতের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজাদি বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ গৃহে আনাইয়া রাখিলেন। জজ সাহেব,

আদালত-ট্রেজারির দশহাজার টাকা দিয়া বলিলেন—ইহার মধ্যে যাহা দরকার হইবে খরচ করিয়া যেন তিনি আদালতের কাগজাত প্রভৃতি রক্ষা করেন। বিদ্রোহ শান্ত হইলে নীলাম্বর বাবু এই টাকা ও কাগজাদি আদালতে জমা করিয়া দিলেন। বিদ্রোহ দমন হইয়া যখন পুনরায় ইংরাজরাজ্য স্থাপিত হইল, তখন যে কেহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে বা লুটপাটে যোগদান করিয়াছিল সন্দেহ মাত্রেই তাহাদের ফাঁসী কিম্বা কারাবাসের হুকুম হইতে লাগিল—অপরাধী নিরপরাধী বিচারে তখন সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না। সে সময় নীলাম্বর বাবু অনেকের ধন, মান এবং প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত এবং প্রতিবেশী সকলকেই তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন—তিনি যাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়াছেন, তাহার গায়ে আঁচও লাগে নাই; তাঁহার উপর জজদিগের এমনি একান্ত বিশ্বাস ছিল।

নীলাম্বর বাবুর অতিথিসেবা তখনকার দিনে সুপরিচিত ছিল। আগ্রায় যে কেহ বাঙ্গালী আসিতেন—সকলেই তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন—একবারে অধিকসংখ্যক হইলে অন্যান্য বাঙ্গালীর বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিতেন। নিজের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না, অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হইয়াও তিনি অতিথিসেবা করিতেন। পুত্রদিগকে সর্ব্বদা বলিতেন যে যতদিন নিজে খাইতে পাইবে ততদিন যেন গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ না করা হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারচন্দ্র এবং তৃতীয় পুত্র দিল্লীর সুবিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গগত হেমচন্দ্র কেমন করিয়া পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান-কালের বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন।

নীলাম্বর বাবুর পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা। পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সংসারচন্দ্র, দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র, তৃতীয় স্বনামধন্য স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্র, চতুর্থ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র,—ইনি জয়পুর মিউনিসিপালিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন; পঞ্চম কলিকাতার বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার শরৎচন্দ্র (S. C. Sen)।

সংসারচন্দ্র ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১২ এপ্রেল আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। সেইখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া একাদশ বৎসর বয়সে তথাকার গভর্ণমেণ্ট কলিজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে আগ্রা সেণ্টজন কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। পাঠাবস্থায় সংসারচন্দ্র তাঁহার ধীরবুদ্ধি, প্রখর-স্মরণশক্তি, পাঠে অভিনিবেশ এবং অমায়িক ব্যবহারে শিক্ষক এবং সহাধ্যায়িগণের প্রীতি আকর্ষণ করেন। প্রবীণ বয়সে তাঁহার সতীর্থ-গণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বা তাহাদের কথা আলোচনা করিবার সময়, সংসারচন্দ্র যেন আবার বালক হইতেন—কৈশোরের ভাল-বাসায় তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া যাইত।

প্রবেশিকা পাশের পর ফার্ষ্ট আর্টস পড়িবার জন্য সংসারচন্দ্র কলিকাতায় প্রেরিত হ'ন এবং তথায় কেথিড্রেল মিশন কলেজে ভর্ত্তি হ'ন—কিন্তু কলিকাতায় গিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাকে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া পুনরায় আগ্রায় আসিতে হয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্ব-

প্রথম পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট, সাহিত্যানুরাগী, সুপণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা হেরম্বজননীর সহিত শুভ বিবাহ হইল। বিবাহের পর তিনি আগ্রার তদানীন্তন প্রধান উকীল ৺প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আইন শিক্ষা করিয়া ওকালতি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্যারীমোহন বাবু পূর্ব্বে মুন্সেফ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিজে এক সেনাদল গঠন করিয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের হস্ত হইতে অনেকের প্রাণ ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করেন—এজন্য তিনি (Fighting Munsiff) বা যোদ্ধা মুন্সেফ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। পেন্‌সন্ লইয়া তিনি আগ্রায় ওকালতি করিতেন।

ভারতে তখন সর্ব্বত্র রেল হয় নাই—বাংলা দেশ হইতে যাঁহারা মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থে আসিতেন, তাঁহাদের আগ্রার পথে যাইতে হইত। জয়পুর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় স্বনামধন্য স্বর্গীয় হরিমোহন সেন মহাশয়কে প্রায়ই জয়পুর আসিতে হইত, পথে তিনি আগ্রায় নীলাম্বর বাবুর অতিথি হইতেন। সংসারচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়া তিনি নীলাম্বর বাবুকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন সংসারচন্দ্রকে জয়পুরে পাঠান, সেখানে তিনি তাঁহার চাকরী করিয়া দিবেন।

স্বর্গীয় হরিমোহন সেন পূর্ব্বে বেঙ্গলব্যাঙ্কে মিণ্ট ও কারেন্সি বিভাগের দেওয়ান ছিলেন—বিদ্যা, বুদ্ধি এবং তেজস্বিতায় তিনি তৎকালের গভর্ণর জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হরিমোহন বাবু তীর্থপর্য্যটনকালে জয়পুর আসিয়া নগরের সাঙ্গানের দরওয়াজায় কোন এক ধর্ম্মশালায় অবস্থান করেন। সেখানে তাঁহার দ্রব্যাদি চুরি যায়। থানেদার সে বিষয়ে মনোযোগ না করায় তিনি মহারাজ রামসিংহের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করিতে মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ করেন। গুণগ্রাহী মহারাজ রামসিংহ তাঁহার সহিত আলাপে তাঁর জ্ঞান, বহুদর্শিতা এবং যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জয়পুরে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। নানা কারণে হরিমোহন বাবু তখন মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত সিউদীনের মৃত্যুর পর মহারাজ পুনরায় হরিমোহন বাবুকে জয়পুরে আনিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে জয়পুরে অবস্থান করিয়া রাজকার্য্যে পরামর্শাদি দেওয়া ব্যতীত হরিমোহন বাবু সে সময়েও স্থায়ী ভাবে কার্য্যগ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার তিন বৎসর পরে মহারাজ, হরিমোহন বাবুকে নবপ্রতিষ্ঠিত "জয়পুর রয়েল কৌন্সিলের" সেক্রেটারী ও অন্যতম সদস্যের পদে নিযুক্ত করেন।

হরিমোহন বাবু অসাধারণ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ এবং কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে মহারাজ রামসিংহ জয়পুর রাজ্যের শাসনপ্রণালীর নানাবিধ সংস্কার এবং বিবিধ নূতন বিধিব্যবস্থার প্রচলন করেন। জয়পুরের মন্ত্রীসভা (Royal Council) সংস্থাপনের মূলে হরিমোহন বাবু। সেকালের দেশীয় রাজ্যের কুসংস্কার এবং কুচক্র ভেদ করিয়া

তিনি জয়পুর রাজ্যে যে সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন এবং উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহাই তাঁর দক্ষতা এবং দূর-দর্শিতার পরিচায়ক হরিমোহন বাবু ইংরাজী, সংস্কৃত, ফার্সি এবং উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভাষায় তার এমন দখল ছিল এবং স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে, তিনি একই কালে ৪।৫ জনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাষায় ৪।৫ খানি পৃথক্ পত্র লেখাইতেন—লেখার সময় কখনও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন না যে, কোন্ পর্য্যন্ত তাহাকে বলিয়াছেন। জয়পুরের স্বর্গীয় মন্ত্রীবর কান্তিচন্দ্র, সংসারচন্দ্র, এবং নিজপুত্রগণের মধ্যে যদুনাথ এবং মহেন্দ্রনাথ (ইঁহারা পরে জয়পুর কৌন্সিলের মেম্বর হন) — ইঁহারা হরিমোহন বাবুর সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন। ইঁহাদের সকলেরই রাজকার্য্যের প্রথম শিক্ষা হরিমোহন বাবুর নিকট।

প্রধানতঃ হরিমোহন বাবুর পরামর্শেই মহারাজ রামসিংহ গভর্ণমেন্টের আমন্ত্রণে কলিকাতায় গমন করেন। কলিকাতায় গিয়া হরিমোহন বাবু মহারাজকে তথাকার কৌন্সিল-হল, কলেজ, হাঁসপাতাল মিউজিয়াম, পশুশালা, জলের ও গ্যাসের কল, সাধারণ পুস্তকালয়, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সকল বিশেষ করিয়া দেখান। তাহার ফলে বর্ত্তমান জয়পুরের গৌরবস্থল রাজ কৌন্সিল, আলবার্ট হল, মিউজিয়াম, মেয়ো হাঁসপাতাল, কলেজ, সাধারণ পুস্তকালয়, গ্যাস এবং জলের কল স্থাপিত হইয়াছিল। এবং তাহারই ফলে দেশীয় রাজ্যের রাজধানীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম জয়পুরে মিউনিসিপ্যালিটির প্রবর্ত্তন। হরিমোহন বাবুই এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহারাজের সহিত গভর্ণমেন্টের এবং বহির্জগতের পরিচয়ের মূল। জয়পুরের কি রাজা, কি সর্দ্দার, কি সাধারণ প্রজা সকলেই পুরাতনের পক্ষপাতী;—সংস্কারকে তাহারা অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী হরিমোহন হইতেই জয়পুররাজ্যে পুরাতনের সহিত নূতনের এই শুভ সংমিলন সংঘটিত হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সার জন লরেন্সের দরবার উপলক্ষে যখন মহারাজ রামসিংহ আগ্রায় ছিলেন, সেই সময় পিতার আজ্ঞানুসারে সংসারচন্দ্র মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজের সহিত সেই তাঁর প্রথম আলাপ। মহারাজ সংসারচন্দ্রের কথাবার্ত্তায় বিশেষ বাঙ্গালী যুবকের মুখে বিশুদ্ধ উর্দ্দু শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহার পরিচয়াদি গ্রহণ করেন।

সংসারচন্দ্র যখন (১৮৬৬) আগ্রায় আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় হরিমোহন বাবু তাঁহাকে জয়পুর রাজ-স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া নীলাম্বর বাবুকে পত্র দেন। তখন গরুর গাড়ীতে দুর্গম পথে জয়পুরে যাইতে হইত। পিতার মত হইলেও স্নেহময়ী জননীর অনুমতি পাওয়া সংসারচন্দ্রের নিতান্ত সহজ হয় নাই; অবশেষে একজন পুরাতন চাকরকে তাঁর সঙ্গে পাঠান হইল। আগ্রা হইতে জয়পুর প্রায় দশদিনের পথ। সংসারচন্দ্রের জননী প্রতিদিনের প্রতিবেলার চাউল আটা আলু প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ পুটলীতে বাঁধিয়া দিলেন—পথে সংসারচন্দ্র স্বহস্তে রন্ধন করিবেন। এমনি করিয়া বহুকষ্টে যে দিন তিনি জয়পুর পৌঁছলেন—সে দিন 'তীজের' পর্ব্ব।

সমগ্র রাজপুতানায় "তীজ" বা শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়ায় গৌরী পূজার বিশেষ সমারোহ। রাজশুদ্ধান্তঃপুরে জয়পুরের মহারাণীগণ গৌরী পূজা করেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহাসমারোহে দেবী প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়। প্রাসাদের জেনানা দেউড়ী হইতে শোভাযাত্রা আরম্ভ হইল, সঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার আস্তরণ শোভিত হস্তী, অশ্ব, জয়পুর রাজের 'পাঁচরঙ্গা' পতাকা-শ্রেণী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল। জয়পুরের সুবিস্তৃত রাজপথ লোকারণ্য, হস্তীর বৃংহিতি, অশ্বের হ্রেষারব, জনসংঘের মহান্ কলধ্বনি সর্ব্বোপরি সেনাদলের দুন্দুভি নিনাদ। তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে বীরবেশধারী রাজপুতগণ, নানাবর্ণ-রঞ্জিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদধারী নাগরিকগণ, কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বযানে, কেহ রথে, কেহ বা পদব্রজে রাজপথের শোভা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। যুবক সংসারচন্দ্রের চক্ষে সে দৃশ্য সুদূর অতীতের স্বপ্নের মত প্রতিভাত হইল। এমনি করিয়া সে মিছিল রাজ-পথ বাহিয়া প্রাসাদের উত্তরদিকে 'তাল কটরা' নামক এক সুবিস্তৃত হ্রদের ধারে উপস্থিত হইল। পথে একস্থানে প্রাসাদপ্রাকারে মঞ্চের উপর অমাত্যগণ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দার পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ গৌরী প্রতিমা দর্শন করেন। তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সুশিক্ষিত হস্তী ও অশ্বসমূহের নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল দেখান হয় এবং সৈন্যদিগের কাওয়াজ করা হয়। তারপর এই গৌরী প্রতিমা তাল কটরা হইতে প্রত্যানীত হইয়া মন্দিরে রক্ষিত হইয়া থাকে।

এই শুভ শুক্লা তৃতীয়ার সায়াহ্নে সংসার-চন্দ্র জয়পুরে প্রবেশ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর কাল জয়পুরে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু প্রথম দিনের এই আনন্দোৎসবের স্মৃতি চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে নবীন ছিল, প্রতি বৎসর 'তীজ' আসিলে তিনি জয়পুরে অবস্থিতির হিসাব করিয়া সে দিনের উল্লেখ করিতেন।

শ্রীঃ——

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ ধর্ম্মসাধনের এক মহা-তপোবন। এই পবিত্র ভূমি অসংখ্য সাধু ভক্তের জন্মভূমি বলিয়া বিদিত। মর্ত্ত্য জগতের এই ধর্ম্মক্ষেত্রের ধূলিকণা সকল ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের বিচরণে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। তাই পৃথিবীর নানাস্থানের বিশ্বাসী ও ভক্তসন্তানগণের সাগ্রহ দৃষ্টিপাতে, আজ আমরা নিত্য নূতন শক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতেছি। সুতরাং আমাদের বাসভূমি এই ভারতবর্ষ ধর্ম্মধনে কিরূপ গৌরবান্বিত, তাহার নিত্য আলোচনা জাতীয় কল্যাণের পক্ষে ও জগতের মূলধন বৃদ্ধির পক্ষে যে এক বিশাল শক্তিকেন্দ্র, সে বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন—অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় তপস্যা ও সাধনার সংবাদ লইবার জন্য ভিন্ন দেশীয় সাধু-

সজ্জনগণ ভারতে পদার্পণ করিতেন। ইংরাজ ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী সাত শত বৎসর ধরিয়া ভারতের অবনতির অবস্থায় বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের প্রায় সর্ব্ববিধ আদান প্রদান লোপ পাইতে বসিয়াছিল। শুভক্ষণে ইংরাজের পদার্পণে ও রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সভ্য জগতে আমাদের জন্মভূমি একটা বিষয়ে সমগ্র জগদ্ব্যাপী প্রাধান্য লাভের সুযোগ অর্জ্জন করিয়াছে। রাজার বিলাত যাত্রা যে সেই শুভক্ষণের জনয়িত্রী সে বিষয় কাহারও সন্দেহ নাই। রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত নবযুগের নূতন সাধনাক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাধক আমাদের পরম পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

এই জ্যৈষ্ঠ মাস দেবেন্দ্রনাথের জন্মমাস, তিনি আজ মর্ত্তালোকে থাকিলে তাঁহার বয়ঃক্রম পঁচানব্বই বৎসর হইত। নবযুগের সাধনার দিক্‌ দিয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জ্যৈষ্ঠ মাস অতি পবিত্র মাস; কারণ, এই বর্ত্তমান সময়ের তীব্র বিষয়-বাসনার কোলাহলের মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করিয়া যে মহাত্মা ব্রহ্ম সাধন করিয়া অমরধামের যাত্রী হইয়াছেন, তাঁহার সেই জীবনব্যাপী মহা আদর্শের স্মৃতিকাগার এই পুণ্যমাস, তাই আজ আমরা দেবেন্দ্রনাথের জীবনীগত বিশেষত্বের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যসম্পদ্‌ অর্জ্জন ও ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে, তাঁহাদের অধিকাংশই, অধিকাংশই বা কেন বলি, প্রায় পনের আনা পনের গণ্ডা মানুষই সেই অর্জ্জন ও ভোগের ভিতরে ডুবিয়া আত্মহারা হন। বিষয়-বাসনা-বারিধির উপরিভাগে তৈলকণার ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে ভাসিয়া আছেন এরূপ ব্যক্তি বিরল, নাই বলিলেও দোষ হয় না। এই বিষয়-বাসনার তাড়না হইতে উদ্ধার লাভের জন্য অনেকানেক সাধু ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্যমার্গ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, মানবের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। নবম অবতার বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলী এই বৈরাগ্যপথের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বর্ত্তমান।

'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর; সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয় না; ত্বরায় পুত্র-কলত্র, ধন সম্পদ্‌ সম্বলিত এই সংসারবাস ত্যাগ কর, কৌপীন সম্বল লইয়া ত্বরায় "কামিনী কাঞ্চনে" দাবানল জ্বালিয়া দিয়া অরণ্যযাত্রা কর, নতুবা তোমার উদ্ধার নাই, মুক্তি নাই। সংসারকে রাখিয়া সংসারে বাস করিয়া, সংসারের সেবা করিয়া তুমি যে কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেছ, উহা ধর্ম্ম নহে, ভারতের ধর্ম্ম ত্যাগ—পুনঃ-পুনঃ এই কথা বলিয়া তাঁহারা অরণ্যকে ধর্ম্মময় ও সংসারকে ধর্ম্মশূন্য করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন।

এই দেশব্যাপী ত্যাগধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে মানব-সংসারের কত যে অমূল্য রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সে সকলের সংখ্যা কে করিবে? সুদূর অতীতকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কর, রাজর্ষি জনকের আদর্শ কই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস ত' দেখিতে পাওয়া যায় না। জনক রাজা হইয়া ঋষির ন্যায় জীবনধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-বিবরণে শুকদেবের শিক্ষালাভের উপাখ্যানভাগে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়

যে, অত্যুচ্চ সাধন ও অত্যুত্তম ধর্ম্ম রাজা জনকের জীবনশোভা বৰ্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সে উচ্চ আদর্শ-পথের পথিক কই? শুনিয়াছি রাজা বিক্রমাদিত্যে সে আদর্শ কিছু পরিমাণে ফুটিয়াছিল। কিন্তু সে মহাজনোচিত পন্থার উত্তরসাধক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে, এই সংসারই কি স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত না! মানব-সন্তান মনুষ্যের মত না হইয়া ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় দর্শনেন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া সংসারবহ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, মানব-সন্তানের পতঙ্গত্ব-প্রাপ্তি অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? ধর্ম্মরাজ প্রশ্নের উত্তরে তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই বিষম বিষয়-বাসনার চরিতার্থতার যুগে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার ঠাকুর পরিবারে সে সময়ের বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে দেবেন্দ্রনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে, কলিকাতার ঠাকুর পরিবার, বাঙ্গালা দেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে; কেন ধন্য হইয়াছে, তাহাই এখন বলিতেছি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে সুখ-সম্পদ্ মান সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য-বিভব ও তজ্জাত সমাজ-সম্মান বলিলে যাহা বুঝা যায়, সংসার-জীবনের সেই মহামূল্য বস্তুগুলি প্রিন্স দ্বারকানাথকে আশ্রয় করিবার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইত। সে সম্ভ্রম ও সম্মান-সম্ভোগ সে সময়ে এ দেশে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। কেবল দ্বারকানাথেই ঘটিয়াছিল, এমন রাজজনোচিত মান সম্ভ্রম, সুখ-সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য বিভব-বেষ্টিত সংসারে শুভক্ষণে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সে আজ প্রায় শতবর্ষের কথা।

বালক দেবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা অপর দশজনের ন্যায় সূচিত ও পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। প্রিন্সের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বড় ঘরের বাবু ছেলে হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার বাবুগিরি করিবার সখ, সুসিদ্ধ করিবার উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা সাঙ্গোপাঙ্গ কিছুরই অভাব ছিল না। ক্রমে ক্রমে সকল আয়োজন ও অনুষ্ঠান তাঁহার নিকটতর হইবার জন্য পা বাড়াইতেছে, এবং তিনিও সে গুলিকে সাদরে বরণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, ঠিক এমন সময়ে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে বন্ধুবর দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া বালক দেবেন্দ্রনাথকেও একবার দেখিতে চাহিলেন। তদনুসারে দ্বারকানাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। রাজা বালক দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন—"আমি তোমার জন্য আমার আসন রাখিয়া গেলাম, তুমিই আমার উত্তরসাধক হইবে।" *

তখনও দেবেন্দ্রনাথ নিষ্ঠাবান্ ও দেবদেবী-পরায়ণ বালক। তিনি প্রতিদিন বিদ্যালয় যাইবার সময় ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। আশৈশব দেবেন্দ্রনাথ

* I leave my guddy to you.

পিতামহী দেবীর অত্যধিক স্নেহসূত্রে তাঁহারই ধর্ম্মভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এই সরল-স্বভাব ও সুপ্রকৃতিসম্পন্ন বালকের চিত্তপটে একদিন অসংখ্য কোটী নক্ষত্র-খচিত সুবিমল সান্ধ্য-গগনের অনন্ত প্রশান্ত প্রসারণ প্রতিবিম্বিত হইল। সেই সীমাহীন স্নিগ্ধ স্থির আকাশতল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া তাঁহার সমগ্র হৃদয়মন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তিনি সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে আত্ম-হারা হইয়া ডুবিয়া গেলেন। এই শুভক্ষণে তাহার "শান্তম্ শিবং দ্বৈতম্ সুন্দরম্' এর সহিত ক্ষণিক পরিচয় হইল। এই ক্ষণিক পরিচয়ে তাঁহার হৃদয়ে অনন্তকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, দ্বারকানাথের অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ ত্বরায় সে আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিল. দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় এক বিশাল সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইল। একদিকে বিশ্ববিভূতি ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে অগ্রসর, অপর দিকে সুখৈশ্বর্য্য পূর্ণ সংসার-বাসনা শত প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে হতচেতন সুরা সেবীর ন্যায় সংসার-সংগ্রামক্ষেত্রে শয়ন করাইতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু ভগবানের স্পর্শ কখন ব্যর্থ হয় না। এই মানবশিশু সিংহবিক্রমে সে উচ্চ আদর্শের পুনর্দর্শনমানসে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বিধাতার স্পর্শ কখন ব্যর্থ হয় না সত্য, কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে, তিনি অনাদি কাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন "যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্ব্বনাশ, তবুও যে না ছাড়ে আমার আশ, আমি হই তার দাসের দাস।" এ তত্ত্ব বৈষ্ণব ধর্ম্ম-জীবন ও সাহিত্যে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইলেও ইহা প্রাচীন তত্ত্ব, ইহা বিধাতার প্রথম বাণী ; তাই কিশোরবয়স্ক দেবেন্দ্রনাথের সরল হৃদয় বিষম সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। পদে পদে সংগ্রামে পরাজয় ঘটিতে লাগিল। বিষয়-বিষ, সংসারের বৈদ্যগণের ব্যবস্থায় ঠিক সূচিকাভরণ রূপ ধারণ করিয়া ভাগবতী কৃপাজাত জ্ঞান-কণাকে ধ্বংস করিতে সদা ব্যস্ত। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরের সকল বিশ্বাসী সন্তানগণের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি উচ্চ সাধকগণের যে দুর্দ্দশা ও পরে রণজয়ে পরম সম্পদ্ লাভ ঘটিয়াছে, দেবেন্দ্র-নাথেরও তাহাই হইল।

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দারুণ অবসাদের সঞ্চার হইল। তিনি এই অবসাদ-ভার বহন করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাহার চিরপ্রিয় পিতা-মহীদেবীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। সেই বৃদ্ধা হিন্দু রমণীকে তীরস্থ করা হয়। গঙ্গার ঘাটে তিনি যে দুই চারি দিন মর্ত্ত্যজীবন ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময়ে পিতামহী দেবীর নিকটে থাকিতেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অবসাদপূর্ণ হৃদয়ে সংসারের অনিত্যতা বৈরাগ্যের সঞ্চার করিতেছিল। এই সময়ে পিতামহী দেবীর সঙ্গচ্যুত হইবার আশঙ্কা সম্বলিত নিমতলার দৃশ্য তাঁহাকে অধিকতর অভিভূত করিত। এক্ষণে এ বৈরাগ্য শ্মশানবৈরাগ্য হইলেও, ইহাও অল্পকালব্যাপী হইলেও, ইহা দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়কে মথিত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

বিধাতার অযাচিত প্রেমস্পর্শ, বিষয়বিভবের আশু প্রীতিকর প্রলোভন, তদুপরি অনিত্যতার ছায়াপাত এ সকল লইয়া যেন কোন নিপুণ

শিল্পী তুলিকা ধারণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের চিত্রপট অঙ্কনে নিযুক্ত। সকলে দেখে না, অনুভব করে না, তাই সকলের ভাগ্যে ঘটে না, নতুবা বিধাতা যে এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কেবল কয়েকজনের হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহার তুলিস্পর্শ-সুখ বিতরণ করেন তাহা নহে; তোমার আমার সকলের জন্যই ঐ ইঙ্গিতাহ্বান বর্ত্তমান। কেহ বলিতে পার কি, জীবনে কখনও কি সে নিমন্ত্রণ শ্রবণ কর নাই? যদি না করিয়া থাক, তবে প্রস্তুত হইয়া কাতর হৃদয়ে অপেক্ষা কর, আমাদের লালা বাবুর ন্যায় অপেক্ষা কর, ঐ নিমন্ত্রণ আসিবে এবং সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে তুমিও লালা বাবুর ন্যায় ধন্য হইবে, তোমার মানবজন্মলাভ সার্থক হইবে। কিন্তু হায়, গভীর আক্ষেপের কথা এই যে, আমার ন্যায় কত হতভাগ্য জীব ঐ আহ্বান শুনিয়া ঐ প্রেমময়ের মধুর স্পর্শ অনুভব করিয়াও বিষয়-বাসনার বন্ধন ছেদন করিতে ও তাঁহার দিকে ছুটিতে পারে নাই, "আছাড়িয়া পড়ি পুনঃ উঠিয়া দাঁড়ায়; নেত্রনীরে দৃষ্টিহীন, তবু চারি ভিতে চায়।" এ অবস্থা-সংঘটন যাহার হইয়াছে, আর যে সে সুযোগ ত্যাগ করিয়াছে, আমার মত সেই সকল কৃপাপাত্রগণের স্থান কোথায় বলিতে পারি না। তবে আশা এই যে, তিনি কখনও কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না।

আমাদের ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথে প্রাক্তন ও পুরুষকারের মিলন সাধনের অপূর্ব্ব উপকরণ বর্ত্তমান ছিল, তাই তিনি ভগবানের অঙ্গুলি-স্পর্শ অনুভব করিয়া বিষয়-বাসনার তাড়নার সঙ্গে সংগ্রামে যখন অবসাদ অনুভব করিতেছিলেন, তখন বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার জীবন-সংগ্রামে জয়-পরাজয়ের অঙ্কপাত করিতে চাহিল; তিনি তখনও সন্দেহের ক্রোড়ে শায়িত, কোন্ পথ শ্রেয় ও প্রেয় তাহা উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই। জীবনে সংগ্রামই চলিয়াছে। ভগবানের স্পর্শ যিনি অনুভব করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তাঁহার সে ভক্ত ও বিশ্বাসী সন্তানকে কখনই ত্যাগ করেন না। তিনি কৃপা করিয়া সেই সাধু সন্তানকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের সৌভাগ্যবশে বিধাতার কৃপা দিন দিন স্পষ্টতর হইতেছে, এমন সময়ে একদিন তিনি জোড়াসাঁকোর ত্রিতলের ছাদের উপর একাকী বসিয়া আত্মচিন্তা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ পুস্তক বিশেষের একখানি ছিন্নপত্র বায়ুভরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তিনি তাহা উঠাইয়া লইলেন। পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তাহা সংস্কৃতে লিখিত ছিল; গৃহে যে পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাকে ডাকাইয়া উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, উহা উপনিষদের ছিন্ন পত্র, তাঁহার দ্বারা ঠিক অর্থ হইবে না। ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকাইয়া উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ তখনই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকাইয়া উপনিষদের ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি সেই অপূর্ব্ব দৈব সংগ্রহের ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিলেন। শ্লোকটি এই:—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥"

অর্থাৎ "জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান

রহিয়াছে সে সমস্তই পরমেশ্বরের প্রভাব দ্বারা সম্যক্‌রূপে আচ্ছন্ন, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়, এই জ্ঞান দ্বারা বিষয়-বাসনা ত্যাগ কর, আর সেই ত্যাগ দ্বারা পরমাত্মাকে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রভাবপূর্ণ জগৎকে ভোগ কর। আর কাহারও ধনসম্পদ্‌ পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিও না।" এই তৃতীয় শুভক্ষণে উপনিষদের ছিন্নপত্রের দৈব সমাগম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যার ফলে দেবেন্দ্রনাথের সকল সংশয় ছিন্ন হইল। তাঁহার দৃষ্টিতে অদ্য সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম-সত্বাপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনিই সর্ব্বময়, তাঁহাকে পাইলে কিছুরই অভাব থাকে না, আর সকলই পাওয়া যায়। আজ দেবেন্দ্রনাথ দিব্যজ্ঞান অনুভব করিলেন, সর্ব্বাগ্রে সেই ব্রহ্মবস্তু লাভ করিতে হইবে, তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে কিছুরই অভাব থাকে না। দেবেন্দ্রনাথ সেই পরম বস্তু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আজ তাঁহার দর্শনে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় অনুভব করিল:—"ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ।" আজ দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের বাসনার বন্ধন ছিন্ন হইয়া সকল সংশয় দূরীভূত হইল। পরব্রহ্মের পূর্ণসত্বা তাঁহার হৃদয়-মন অধিকার করিল, আজ তাঁহার নূতন জ্ঞান লাভে নূতন জীবন লাভে আনন্দ ধরে না। সেই পরব্রহ্ম আজ দেবেন্দ্রনাথের নিকট "আনন্দরূপমমৃতম্‌," আজ—স্বয়ং পরমেশ্বর দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগুরু হইয়া তাঁহাকে বেদান্তবাগীশ সমক্ষে ব্রহ্ম-সাধনের পথ দেখাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সেই নূতন জীবনের নূতন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি শান্ত ও সমাহিত চিত্তে জগতের এই দুর্লভ ধন, মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকার অর্জ্জনে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন।

এখন দেবেন্দ্রনাথ কেবল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নহেন, এখন তিনি কেবল জোড়াসাঁকোর অতুল ঐশ্বর্য্য বিভবপূর্ণ রাজভবনের প্রধান ব্যক্তি নহেন, নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ-বাসনা এখন আর তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে না। তিনি এখন আপনাকে অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের প্রিয় সন্তান বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাঁহার অপার করুণার ধারা সিক্ত হইয়া সংসার নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বন্ধু ও মোসাহেবগণ তাঁহার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে মর্ম্মাহত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-ময় জীবন যাপনের রীতিপদ্ধতি পরিদর্শনে সংসারের লোকও তাঁহার অনুরক্ত হইতে আরম্ভ করিল। তিনি আপন মনে আপনার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে দীক্ষার জন্য কেশব ভারতীর সম্মুখীন হইয়া দীক্ষা দিতে বলিলে পর, ভারতী বলিয়াছিলেন, "তোমাকে দীক্ষা দেওয়া আমার কর্ম্ম নহে।" তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "আমি আপনারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিব।" ভারতী বলিয়াছিলেন "তোমাকে দীক্ষা দিবার মন্ত্র আমার নিকট নাই।" চৈতন্যদেব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমাকে দীক্ষা দিবার মন্ত্র আমিই বলিয়া দিতেছি, আপনি কেবল সেই মন্ত্র আমার কর্ণে শুনাইয়া দিন।" দেবেন্দ্রনাথেরও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল। তিনি দীক্ষার মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে সেই মন্ত্র অব-

লম্বন পূর্ব্বক দীক্ষা দিতে বলেন, তদনুসারে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য দীক্ষার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে দীক্ষা দিবার দিন সেই প্রবীণ আচার্য্যের হর্ষ বিষাদ-বিজড়িত এক অপূর্ব্ব হৃদয়প্লাবন দেখা দিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা অসামান্য গুণবান্ পুরুষ-সিংহ রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী বিদ্যা-বাগীশ আজ প্রিন্সের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করাইবার সময় স্বর্গমর্ত্ত্যের মিলন সন্দর্শনে আকুল হইয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে করিতে রাজার ভবিষ্যৎ বাণীর পরিপূরণ করিলেন। আজ দেবেন্দ্রনাথ রাজানুরোধে বিশ্বপাতার আদেশে রাজার আসন গ্রহণ করিলেন, রামমোহনের স্বর্গীয় অমর আত্মা আনন্দে বিহ্বল হইয়া অবশ্যই আশীর্ব্বাদ সহ পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব--পদ গ্রহণ করিলেন।

এই মহাব্রত গ্রহণপূর্ব্বক দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সহ রাশীকৃত ঋণভার দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে নিপতিত হয়। সে অসীম ঋণভার হইতে সম্পত্তি মুক্ত করা যেমন তেমন লোকের কর্ম্ম ছিল না। বিষয়ী লোকের বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে তিনি অতি সহজ উপায়ে সেই পিতৃকৃত ঋণ অস্বীকার করিয়া সুখে সম্পদ্ ও তজ্জাত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে ও আত্মীয় স্বজনগণকে সুখে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা উত্তমর্ণের প্রাপ্য ঋণ প্রত্যাখ্যানে বাধা প্রদান করিল। তিনি উপনিষদের প্রাচীন ঋষিবাক্যে জানিয়াছেন ' আর কাহারও ধনসম্পদ্ পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিও না।" আজ দেবেন্দ্রনাথের পরীক্ষার দিন উপস্থিত, আজ তিনি জনসমাজ সমক্ষে, সাধিত ধর্ম্ম-জীবনের পরীক্ষা দানে আহূত হইলেন। আজ তিনি পিতৃঋণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেই ঋণদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে যে ভাবে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আর সত্যের পথ পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই, তিনি বুঝিলেন "যে করে তাঁর আশ, তিনি করেন তার সর্ব্বনাশ," তিনি বিধাতার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া এই "সর্ব্বনাশের" পথেই পদার্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে, বিষয়বিভব ত্যাগ করিয়া সুখ সুবিধা সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া পথের পথিক হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সেদিন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পোষ্যবর্গ চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন-হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ঋণ-পরিশোধের পণ কোনও মতে ভঙ্গ হইল না। বহু লোকের সাধ্য সাধনায়ও তিনি একবিন্দু বিচলিত হইলেন না, বরং পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিকে তখন অন্যের সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করিলেন, তাই তদ্ভোগের বাসনা তাঁর হৃদয়ে স্থান পাইল না।

দ্বারকানাথের উত্তমর্ণেরা দেবেন্দ্রনাথের এই মহদ্ভাবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা আদায়ের ব্যবস্থার ভার তাঁহারই উপর

অর্পণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সুব্যবস্থা সহকারে ঋণ পরিশোধের উপায় অবলম্বন করিলেন। অপরের সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিলে কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তি যেরূপ ভাবে গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি নিজে সপরিবারে দারিদ্র্যের শতবিধ ক্লেশভোগ করিয়া বিস্তৃত জমিদারীর আয় হইতে ঋণপাব শোধ করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি এই সময়ে প্রিন্সের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ছিন্ন পাদুকা ও পরিধেয় মেরামত করাইয়া পরিধান করিয়াছেন। গৃহের পরিজনগণেরও এই সময়ে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই অপরিমেয় ক্লেশভোগে তিনি কেবল কাতর হয়েন নাই এমন নহে, তিনি সদা প্রফুল্ল চিত্তে এই অসীম দুঃখ কষ্ট বহন করিয়া জনসমাজ সমক্ষে অপূর্ব্ব উচ্চ চরিত্রের পরিচয় দান করিয়া সংসারে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

এই অসামান্য ত্যাগ স্বীকারে সাধু দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম জীবন উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিল। তিনি এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই "মহর্ষি" পদবাচ্য হইলেন। বর্ত্তমান যুগে আমাদের সৌভাগ্যবশে আমরা দুইজন মহর্ষি পদবাচ্য মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গ-সুখ সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছি। দানে দাতাকর্ণ সদৃশ বিদ্যাসাগর সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া, আর সংসারে বাস করিয়া দেবেন্দ্রনাথ, ত্যাগ-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমান যুগের বিষয় বাসনার বিরুদ্ধে মহৎ জীবন ধারণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সে মহাচিত্র অক্ষয়, কখনও তাহাতে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিবে না। ইহা বাঙ্গালীর পরম গৌরবের কথা। এ মহা চরিত্রের স্পর্শ—ইহার আস্বাদন অমৃত সদৃশ মিষ্ট।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দীর্ঘকাল আমাদের সম্মুখে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যখনই তাহার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়াছে তখনই মনে হইয়াছে, সংসারে বাস করিয়া, রক্তমাংসময় দেহ ধারণ করিয়াও যে ব্রহ্ম-সঙ্গসুখ সম্ভোগ করা যায়, একাল এ শিক্ষা দেবেন্দ্রনাথের স্বোপার্জ্জিত, ইহাতে অন্যের দাবি দাওয়া নাই। প্রসঙ্গক্রমে যখনই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছে, অমনই দেখিয়াছি, "সত্যং" বলিতে সেই পবিত্র সুন্দর ঋষির মুখমণ্ডলে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার মস্তকের কেশ সকল নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছে; তাঁহার অন্তরঙ্গ সখার প্রসঙ্গ তাঁহাকে এমনই আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিত যে, সে সুন্দর সহজ ও স্বাভাবিক ভাব দর্শকরূপে ভোগ করিতে পাওয়াও পরম লাভ বলিয়া মনে হয়। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন মহর্ষির ব্রহ্মসাধন আমাদের জীবন যাত্রার মূলধনে পরিণত হউক। আমরা ধন্য হইব। মহর্ষির মহর্ষিত্বই তাঁহার বিশেষত্ব। ইহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পদ্‌।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিশাপ

(১)

সুবৃহৎ আম্র-কাননের শীতল ছায়ায় পুলিশ সাহেবের তাঁবু পড়িয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস, বাহিরে রৌদ্রের প্রচণ্ড তেজ, কিন্তু বাগানের ভিতর প্রদোষের তরল অন্ধকার। পত্রান্তরালে সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে বিচিত্র আলোক-মালার সৃষ্টি করিয়াছে। শুভ্র তাঁবু-গুলি দূর হইতে সুনীল সমুদ্রবক্ষে সদ্য পাল তোলা নৌকার মত দেখাইতেছিল। দূরে গ্রামের কুটীরগুলির মৃৎ-প্রাচীরের উপর এবং বিবিধ বৃক্ষলতাদির উপর রৌদ্র পড়িয়া উজ্জ্বল বর্ণের ছবির মত মনে হইতেছিল। দূরে গ্রামের রাস্তার উপর উলঙ্গ শিশুর দল ধুলা মাখিয়া গ্রাম্য কুকুরদের সঙ্গে সানন্দে খেলা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাদের আনন্দ কোলাহল শুনা যাইতেছিল।

খানসামাদের তাঁবু হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিয়া বৃক্ষ অন্তরাল ভেদ করিয়া বাহিরের গরম হাওয়ার সঙ্গে মিশিতেছিল। সে তাঁবুতে মহা ব্যস্ততা ও কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে—কেননা সাহেব প্রাতে 'চা-পান' করিয়া বাহির হইয়াছেন, এখনি আসিয়া 'ছোট হাজরী' খাইবেন—সিপাহী পারমন্ আসিয়া খবর দিল দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলা দেখা যাইতেছে।

খবরটা শুনিয়া বড় খানসামা তাঁবুর বাহিরে আসিল—তার মান্দ্রাজ প্রদেশ সুলভ গোলাকার বদনমণ্ডল, মসী-বিনিন্দিত বর্ণ অগ্নির উত্তাপে তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। পাতলা কামিজ ঘামে গায়ের সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া গাত্রবর্ণের আভা প্রকাশ পাইতেছে। খানসামাজি বাহিরে আসিয়া দেখে এক কাক তার বড় কষ্টে প্রস্তুত একখান কাট্‌লেট লইয়া পলাইতেছে, আর তার পিছনে সে বাজ্যের তার সমগ্র স্বজাতিবৃন্দ ছুটিয়াছে। একে গরম তাতে আবার সেদিন খানসামাজীর মেজাজটা বেশ প্রসন্ন ছিল না, কেননা সাহেবের আবার একজন বন্ধু সঙ্গে লইয়া ফিরিবার কথা। এ দৃশ্যে তার ভীষণ মুখমণ্ডল ভীষণতর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কাকজাতির ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইতে লাগিল। সে রাগের ফল ভোগ করিল কিন্তু তাঁবুর খোঁটায় বাধা এক আধমরা মুরগী—হৃত কাট্‌লেটের স্থান পূরণের জন্য তৎক্ষণাৎ সে বেচারার প্রাণবিয়োগ ঘটিল। এমন সময় 'বয়' আসিয়া খবর দিল, সাহেব পৌঁছিয়াছেন—সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

(২)

ঘোড়া হইতে নামিয়াই পুলিশ সাহেব ক্রাইটন হুকুম দিলেন—"বয়, দো গ্লাস হুইস্কি-সোডা বরফ দেকে লাও।" বলিয়া তিনি এবং ইঞ্জিনিয়ার জর্ডন সাহেব দু'খানা আরাম কুর্সির উপর বসিয়া পড়িলেন। হুইস্কি সোডা পান করিতে করিতে পুলিশ সাহেব বলিয়া উঠি-লেন—"দেখ, আজ হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, সে আজ তিন বৎসরের কথা—

সাম্‌নে ঐ যে গ্রাম দেখিতেছ ঐ খানে সে ঘটনা ঘটে।”

বলিতে বলিতে ক্রাইটন সাহেবের স্বর গম্ভীর হইয়া আসিল—বদনে চিন্তার রেখা পড়িল। তিনি অন্যমনস্কভাবে পাশের টে বল হইতে একটা চুরুট লইয়া ধরাইলেন। কয়েক মিনিট পরে বলিয়া উঠিলেন—“তোমার কাপ্তেন কার্টারকে মনে আছে?”

জর্ডন বলিলেন, “হাঁ, বেশ মনে আছে,—বেচারা কাশ্মীরে শিকার খেলতে গিয়ে মারা যায়। আমি চিঠাপুর থাকিতে সে দুই তিনবার মাছ ধরিবার জন্য আমার কাছে আসিয়াছিল—তোমার ত মনে আছে সেখানে আমার বাংলো ছিল নদীর ধারে। আমি কাগজে তার মৃত্যুসংবাদ পড়ি নাই!—গত বড়দিনের সময় আমি তাকে নিমন্ত্রণ করি—কিছু দিন পরে তার রেজিমেণ্টের অফিসরের পত্র পাইয়া তার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিলাম। কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু!”

ক্রাইটন অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বলিলেন “হুঁ।”

তাঁহার ভাব দেখিয়া জর্ডনের কৌতূহল হইল—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, তুমি তিন বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটা ঘটনার কথা বলিলে, তার সঙ্গে কার্টারের সম্বন্ধ কি? ব্যাপার কি?”

ধীরে ধীরে মুখ হইতে চুরুট নামাইয়া ক্রাইটন বলিলেন, “সে অনেক কথা, তা' হলেও আজ তোমাকে সব বলিতেছি! কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে এতদিন পরে আজ ঠিক সেই দিনেই আমরা এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। সে ব্যাপারটা কি বলি শোন—

“সে আজ তিন বৎসরের কথা। কাপ্তেন কার্টার, আমি এবং মিঃ জে তিনজনের এইখানে শিকার খেলিতে আসার প্রস্তাব হয়। আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে চাকরবাকর এবং তাঁবু খাটান হইয়াছিল। আসিবার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে গ্রামের বাহিরে ডান ধারে একটা পুকুর আছে—তাহারই উচু পাড়ের উপর একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ—চাকরেরা সেইখানে আমাদের তাঁবু খাটাইয়াছিল। আমরা পৌঁছিয়া গ্রামের প্যাটেলকে ডাকাইয়া পর দিনের শিকারের জন্য লোকের বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় সেই গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে একজন সন্ন্যাসী আমাদের নিকট আসিল। গ্রামবাসীরা সসম্ভ্রমে তাঁহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া আভূমি প্রণত হইল। আমি এমন অদ্ভুত সন্ন্যাসী কখন দেখি নাই। লোকটা ভয়ঙ্কর শীর্ণ, পরিধানে একখণ্ড জীর্ণ গেরুয়া রঙ্গের কাপড়, গায়ে আগাগোড়া ছাই মাখা, চোক দুটো রক্তবর্ণ, যেন জ্বলিতেছে, কপালে তিলক আর তার চুল—আমি যেন এখনও সেই শণের দড়ার মত জটা পাকান পা-পর্য্যন্ত লম্বা চুল চোকের সাম্‌নে দেখিতে পাইতেছি। বেশ বুঝিলাম গ্রামবাসীরা অদ্ভুত জীবটাকে অত্যন্ত ভয় করে, কেননা সেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা একে একে অদৃশ্য হইল, সমস্ত দিন আর তাহাদের দেখা পাওয়া গেল না।

“গ্রামের লোক সব চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী আমাকে ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল,—সাহেব তোমরা এজায়গা ছাড়িয়া দাও, এস্থানে হনুমানজীর মন্দির ছিল। তোমার চাকররা এই পবিত্র স্থান কলুষিত করিয়াছে—কিন্তু আমি

বলিতেছি তোমরা এখনও এ জায়গা ছাড়িয়া যাও—হাজার হাজার বছর ধরিয়া এখানে হনুমানজীর মূর্ত্তি পূজা পাইয়াছে—এখানে তোমরা থাকিতে পারিবে না। আমি তোমার চাকরদের বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা ছোট লোক, আমার কথা মানে নাই আমাকে অপমান করিয়াছে—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর চোক্ দুটো যেন জ্বলিয়া উঠিল সে রাগে ঘৃণায় ভীষণ হইয়া উঠিল এবং নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া বিড় বিড় করিয়া গালি দিয়া থু-থু করিয়া থুথু ফেলিতে লাগিল। একটা কালা আদমীর তা হউক না কেন সে যোগী সন্ন্যাসী—তার এতটা ধৃষ্টতা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না—একজন কনেষ্টবলকে ডাকিয়া হুকুম দিলাম—এ জানো য়ারটাকে ধরিয়া যেন বাগানের বাহির করিয়া দেয়।

কনেষ্টবলটা সন্ন্যাসীর হাত ধরিবা মাত্র সে জোরে হাত-ছাড়াইয়া লইয়া আমাদের দিকে হাত বাড়াইয়া শাপ দিতে লাগিল তাহার গালাগালিতে কাপ্তান কার্টার আর রাগ সামলাইতে পারিল না। সজোরে সন্ন্যাসীর নাকে এক প্রচণ্ড ঘুষা লাগাইয়া দিল, সন্ন্যাসী মাটিতে পড়িয়া গেল তার নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এ ব্যাপারে আমি মনে মনে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইলাম, কেননা এই সন্ন্যাসী মারা লইয়া গ্রামবাসীরা হয়ত ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তার চোক দুটা তখন যেন জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ডের মত জ্বলিতেছিল! সে বলিয়া উঠিল—হনুমানজীর এই অপমানের জন্য আজ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে তোমাদের তিন জনকেই মরিতে হইবে।"—তারপর কাপ্তেন কার্টারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "তুমি মরিবে সব প্রথমে"—বলিয়া সন্ন্যাসী সে স্থান ত্যাগ করিল।"

গর্ডন ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার পর।"

"তারপর আর কি? সন্ন্যাসী চলিয়া গেল আমরা খুব খানিকটা হাসিয়া লইলাম—তারপর দুদিন শিকার খেলিয়া আমরাও সে স্থান ছাড়িলাম—গ্রামবাসীরা কোন গোল করিল না। এই ঘটনার ঠিক এক বৎসর পরে কার্টারের মৃত্যু হইল—'

গর্ডন বলিল,—"তুমি কি বলিতে চাও যে কার্টারের মৃত্যুর সহিত এই পাগলের প্রলাপের কোন সম্বন্ধ আছে।"

"সাধারণত আমারও সে কথা মনে আসিত না—কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না যে সন্ন্যাসীর অভিশাপ দেওয়ার ঠিক এক বৎসর পরে সেই দিনে কার্টার মৃত্যুমুখে পতিত হয়;—আরো শোন—মিঃ জে—তার সপ্তাহের মধ্যে জলে ডুবিয়া মারা যায়। তিন জনের মধ্যে এখন কেবল এক আমি বাকী—তুমি হয় ত মনে করছ সরকারী কাজের ভাবনায় আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে—তা' মোটেই না। অদৃষ্টচক্রে দেখ না তিন বৎসর পরে আমি আজ ঠিক সেই দিনে ঠিক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—তুমি ত আমাকে বেশ জান। ভয় জিনিষটা আমার বেশী নেই—কিন্তু কেন জানি না আজ আমাকে বড় বিচলিত করেছে। আমার একান্ত অনুরোধ আজ রাত্রে তুমি এখানে আমার কাছে থাক।"

"তা বেশ ত,—আমার ডেরায় ওভার সিয়ারকে খবর দিয়া পাঠাও আজ রাত-টা দুজনে গল্প করিয়া কাটান যাইবে।"

রাত্রে ডিনার লইয়া দুই বন্ধু'তে তাঁবুর বাহিরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে গল্প করিতেছিল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; বাতাসের নাম মাত্র নাই, ভয়ানক গুমট করিয়া রহিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম গাছগুলা দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। পাতার অন্ধকারে জোনাকী পোকার আলো কালো পোষাকের উপর সলমা চুমকার কাজের মত দেখাইতেছে।

গর্ডন বলিয়া উঠিলেন—ভারতবর্ষের সব চেনা যায় কিন্তু প্রকৃতি দেবীকে চেনা বড় দুঃসাধ্য—সমস্ত দিন বেশ থাকিয়া এখন দেখ না ব্যাপার! যে রকম আয়োজন তাতে রাত্রে খুব ঝড় বৃষ্টি হবে, দু-চার বছর এদেশে থাকিলে নিজের দেশের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। আমি ত মাস তিনেক পরে ফার্লো লইয়া দেশে ফিরিব—আর বছর হয় ত এমন দিনে আমাদের শান্ত পল্লীগ্রামের নিভৃত নদী-তীরে মাছ ধরিয়া বেড়াইব।" বলিয়া জর্ডন মেঘাবৃত আকাশের দিকে চাহিয়া অন্য মনস্কভাবে চুরুট টানিতে লাগিল। অন্ধকারে তাঁর লক্ষ্য হইল না যে, ক্রিটনের মুখে অজ্ঞাত আসন্ন বিপদের ভয়ের কালিমা পড়িয়াছে। —অনেকক্ষণ পরে ক্রিটান বলিয়া উঠিলেন—"এক বৎসর পরে—আস্‌ছে বছর এমন দিনে—আমি—আমি কোথায় থাকব কে

বলতে পারে।"

জর্ডন বন্ধুর কথার ভাব বুঝিলেন—বুঝি-, লেন যে সন্ন্যাসীর অভিশাপের কথা তাঁর মাথা হইতে এখনও যায় নাই। তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন—"দেখ তোমার গতিক ভাল নয়, মাথা বিগড়ে গেছে! আর রাত জেগো না —অনেক রাত হয়েছে—চল শুতে যাই—শোবার আগে এক ডোস্ ব্রাণ্ডি ও কুইনিন বাড়াইয়া দিও।" বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন।

ঘণ্টা দুই পরে ভীষণ বজ্রনিনাদে জর্ডনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল—তাঁহার মনে হইল নিকটে কোন বৃক্ষের উপর বজ্রপাত হইয়াছে। —সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জর্ডন বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন—তাঁবুর উপর ঝর ঝর শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং দরজা দিয়া বাদলা হাওয়া আসিয়া তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত দেহ শীতল করিয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরে আবার একবার কড কড করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল—সে শব্দ ধীরে ধীরে দূর দিক্‌বলয়ে মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে মনুষ্য কণ্ঠের ভীষণ কাতর ধ্বনি শোনা গেল—সে ধ্বনি সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া আরো ভীষণ মনে হইল—জর্ডন ভীত হইয়া বিভল-ভার হস্তে তাঁবুর বাহির হইলেন। সেই সময় আবার সেই কাতর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল—জর্ডনের মনে হইল ক্রিটনের তাঁবু হইতে এ শব্দ আসিল।

এই শব্দে তাঁবুর চাকর বাকর, কনেষ্টবল সকলেরই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তাহারাও অন্ধকারে ভূতের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে-ছিল। জর্ডন চীৎকার করিয়া বলিলেন—'ডেরায় যতগুলি আলো আছে সব জ্বালিয়া

ফেল” এবং নিজের তাঁবুর আলো লইয়া বেগে ক্রিটনের তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন —সে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর! তাঁবুর আসবাব চারিদিকে বিক্ষিপ্ত—সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্ত বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, তার উপর রক্তাক্ত কলেবর ক্রিটনের প্রাণ-হীন দেহ পড়িয়া আছে, কে যেন নখ দিয়া তার গল-নালী ছিঁড়িয়া দিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। আর তার শিয়রের কাছে বিপুলকায় এক হনুমান দুই হাত উঁচু করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে —তারও সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত—তার কালো মুখের মধ্যে সাদা সাদা দাঁতগুলো দেখা যাইতেছে। —সে পৈশাচিক দৃশ্যে জর্ডন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জর্ডনকে দেখিয়া হনুমান তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল—কিন্তু জর্ডন তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। সেই একই গুলিতে হনুমান গতাসু হইয়া ক্রিটনের মৃত দেহের উপর পড়িয়া গেল।

জর্ডন তাঁবুর বাহিরে আসিলেন। ভীত খানসামারা এবং কনেষ্টবলগণ আলোক লইয়া তখনও চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে—কেহ কেহ বা কৌতূহলপরবশ হইয়া ক্রিটন সাহেবের তাঁবুর মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। জর্ডন কঠোর কণ্ঠে বলিলেন—“তোমাদের সাহেবকে কে খুন করিয়াছে—এখন এ ঘরে আসিও না—যে আসিবে আমি তাহাকে গুলি করিব।” একজন কনেষ্টবল দৌড়িয়া গিয়া গ্রামের পাটেলকে ডাকিয়া আন, আর বাকী সব ঐ খানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক।”

* * * * *

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গ্রামের পাটেল ও আরো কয়েকজন মাতব্বর প্রজা আসিয়া উপস্থিত হইল—জর্ডন তাহাদিগকে ব্যাপার সব বুঝাইয়া দিলেন, বৃদ্ধ পাটেল তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া সেই মৃত হনুমান দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—“হে স্বামীজী,—হে হনুমানজী তুমি।”

জর্ডন পাটেলের কথা ঠিক বুঝিলেন না—জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ কার হনুমান?”

পাটেল বলিল—“আমাদের গ্রামে হনুমানজীর যে মন্দির আছে—ইনি সেখানকার।”

পাটেল আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু জর্ডন তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“ওঃ বুঝেছি! জমাদার, এই খুনের জন্য সেই সন্ন্যাসী দায়ী—আমার হুকুম ক্রিটন সাহেবকে খুন করায় তুমি এখনি সেই সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার কর, বিলম্বমাত্র করিও না।”

পাটেল বিস্মিত হইয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল- ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল—“ধর্ম্মাবতার, কোন্ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করার কথা বলিতেছেন?”

“কেন, তোমাদের গ্রামের হনুমানজীর মন্দিরের সেই বুড়া সন্ন্যাসী।”

“তাঁকে গ্রেপ্তার! তিনি ত আজ ছয় মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন!”

জর্ডন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—তাঁর মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“এ অভিশাপ, না অদৃষ্ট চক্র!” *

শ্রীসু———।

* ইংরাজি হইতে অনূদিত।

মনসার ভাসান

"মনসার ভাসান" একটি সরল উপন্যাস, ইহাকে কবি জীবনচরিত্র কহিয়াছেন, এবং এক হিসাবে এই আখ্যা সত্য। এই কাব্যে প্রধানতঃ তিনটি ব্যক্তির জীবনী-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সেই তিন ব্যক্তির মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী। আনুষঙ্গিকভাবে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনার ও চরিত্রের বিবরণও অবশ্য ইহাতে আছে, সেগুলির বিষয় আমরা পরে বলিব। কিন্তু ইহার প্রধান চরিত্র তিনটি; চাঁদবেণে, যিনি আধুনিক নাটকে গম্ভীর চন্দ্রধর নামে আসর জমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, লখিন্দর এবং তাহার পত্নী বেহুলা।

মনসার ভাসান অনেকাংশে কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের অনুরূপ—অর্থাৎ ইহাদের উদ্দেশ্য অনেকটা এক ভাবের। শক্তির পূজাপ্রতিষ্ঠা উভয় কাব্যেরই প্রতিপাদ্য; বোধ হয় এই জন্যই ইহাদের গঠন-প্রণালীতে একটা বিশেষ সাম্য আসিয়া পড়িয়াছে, এবং চরিত্র সম্বন্ধে এক কাব্যের ছায়া অপরে আসিয়া পড়িয়াছে। মনসার ভাসানের চাঁদবেণে, চণ্ডীকাব্যের ধনপতি সওদাগরের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। আমরা ইতিপূর্ব্বে ধনপতির চরিত্র বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি, অতএব চাঁদবেণের চরিত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছা নাই। দুই চরিত্রের তুলনায় এই বুঝা যায় যে, চণ্ডীকাব্যের ধনপতির অপেক্ষা আলোচ্য কাব্যের চরিত্রটি অনেক পরিমাণে হাল্‌কা হইয়াছে, কারণ কবি এই চরিত্রের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারেন নাই, এবং শক্তিবিরোধী চাঁদের প্রতি একটু মানসিক আক্রোশ বশতঃ তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গরস করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দৃঢ়ভক্ত চাঁদবেণেকে লইয়া হাস্য পরিহাসে হাস্য রসের বিকাশ হইলেও, সে হাস্যরস আধুনিক নাটকে ষণ্ডামার্ককে লইয়া হাস্যরসের অবতারণার ন্যায়, অনেকটা ছেলেহাসান গোছেরই হইয়াছে, রসের পরিপক্কতা হয় নাই, এবং কিছু বিকৃত রুচিরও পরিচায়ক হইয়াছে। মনসার ভাসান একখানি গ্রাম্য-কাব্য ইহাতে কোনও জটিল দার্শনিক বা পৌরাণিক সমস্যার মীমাংসা নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে ভাবে চন্দ্রধরের চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি এই উপাখ্যানে পাওয়া যাইবে না। বলা বাহুল্য, অন্য কোনও গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মনসার ভাসান একটি গ্রাম্য-কাহিনী, একটা সরল ও সৎ গ্রাম্য-কাহিনী। কবি নিরক্ষর নহেন, তাহা তাঁহার স্তব-বন্দনাদি পাঠে বেশ বুঝা যায়, কিন্তু গল্পের মধ্যে আসিয়া তিনি গল্পই বলিয়া গিয়াছেন, এবং বলিবার কালে তাঁহার বিদ্যাকে দূরে রাখিয়া তাঁহার গ্রাম্য শ্রোতৃবর্গের বোধগম্য প্রাদেশিক সহজ কথার সাহায্য লইয়াছেন আর বোধ হয় এই প্রাদেশিক কথার জোয়ারে কবির গাম্ভীর্য্যও ভাসিয়া গিয়া তাঁহাকে গ্রাম্য

জনোপভোগ্য কাব্যের গায়ক স্বরূপে পরিণত করিয়াছে। প্রাচীন কবিদের কাছে দেবতারাও নিছক মানুষ হইয়া দাড়ান. এই কাব্যখানিতে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইবার খাতিরে যখনি কবিকে তাঁহার—

ত্রিজগৎ ধাত্রীমাতা
যোগরাচা হরের নন্দিনী

মনসাকে চাঁদবেণের মুখ দিয়া "চেঙ্গমুড়ি কাণি" বলিয়া গালি দেওয়াইতে হইয়াছে তখনি মায়াস্বরূপিনী শিবনন্দিনীকেও রবি বাবুর ব্যঙ্গ চিত্রের চরিত্র স্বরূপে নামাইয়া আনিতে হইয়াছে। মনসার ভাসানে বহ্বাড়ম্বরে পূজিত হইলেও মনসা দেবী বেশ কোন্দল-পটু গ্রাম্য রমণী-রূপেই ফুটিয়াছেন, তাঁহার কথা-বার্ত্তায়, কাজকর্ম্মে কোথাও দেবীত্ব বিকশিত হইতে পারে নাই। তাহা না হইলেও কিন্তু এই মনসা দেবী চাঁদবেণে ও তৎসময়ের সকলের কাছেই জীবন্ত; এবং সকলে তাঁহার দেবত্বে বিশ্বাসী না হইলেও তাঁহার অস্তিত্বে সম্পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী ছিল। চাঁদবেণে তাঁহার দেবীত্বে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই ও চাহে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাকে যে "হেথালের" বাড়ি মারা যায়—এ কথা বিশ্বাস করিত, এবং দেবীও এই হেথালের কিছু ভয় রাখিতেন। দেবতা এত বেশী আত্মীয় ও নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমরা স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের নিজের পছন্দসই করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলাম; কাজেই বিরাট গাম্ভীর্য্য বা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব তাঁহাদের কাছ হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। যখন দেবতারই এই অবস্থা তখন মানুষের তো কথাই নাই।

আমরা দেখিতে পাই যে দেবচরিত্র চিত্রণে সকল দেশের কাব্যে প্রায় দুই প্রকার দোষ আসিয়া পড়ে,—প্রথম দোষ—দেবতা একটি ভাব মাত্রে পরিণত হইয়া যান, সেই দেব-চরিত্রে human interest অর্থাৎ মনুষ্যের অনুভবনীয় ভাব কিছুই থাকে না, যেমন বেহুলা নাটকের মনসা-চরিত্র; সে চরিত্র একটা চিন্তা মাত্র, আর কিছুই নহে। দ্বিতীয় দোষ—দেবচরিত্র অত্যধিক মাত্রায় মনুষ্য-স্বভাবাপন্ন হইয়া দেবত্ব হারাইয়া বসে, যেমন মনসার ভাসান প্রভৃতি কাব্যের দেবচরিত্র, এবং মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লষ্ট" কাব্যের ঈশ্বরচরিত্র। কালিদাসের কুমারসম্ভবে, গেটের ফাউষ্টে এই উভয় দোষ বর্জ্জিত হইতে পারিয়াছে—বলিয়া, ঐ কাব্য সকলের দেবচরিত্র গাম্ভীর্য্য ও ভাব-বর্জ্জিত নহে এবং ভাবমাত্রও (abstraction) নহে।

চাঁদবেণের চরিত্র ও মনসার চরিত্র এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া "মনসার ভাসানে" উভয় চরিত্রেরই ক্ষতি হইয়াছে, উভয় চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ও উদারতা নষ্ট হইয়াছে। মনসা দেবী এখানে একেবারে দেবীত্ববিহীনা; সামান্য "খুনসুটী" লইয়াই ব্যস্ত, সামান্য কলহপ্রিয় বা প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীর মত প্রতিহিংসা সাধিতে পারিলেই বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে "জব্দ" করিতে পারিলেই খুসী। মনসা-চরিত্রের এই প্রকার লঘুত্ব অনুভব করিয়াই আধুনিক নাটককার সেই চরিত্রের দেবত্ব উদ্ধার করিবার প্রয়াস করিয়াছেন; ইহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ সন্দেহ

নাই, কিন্তু দেবচরিত্রের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকায় তাহাকে একটা abstractionএ পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন। নাটকে সে রকম সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতামাত্র যেন খাপ খায় না; সমগ্র নাটক হইতে উহা যেন বাহিরে পড়িয়া থাকে।

মনসার ভাসানে মনসার চরিত্র অত্যন্ত লঘুভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সে চরিত্র কাব্যের মধ্যে সজীব ভাবে কার্য্য করিতেছে; যেমন চন্দ্রধরের মনসা বিদ্বেষ আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি, মনসারও প্রতিশোধ দিবার প্রবৃত্তিটাও আমরা সেই রকমই পরিষ্কার বুঝিতে পারি। ফলতঃ মনসা দেবীকে শক্তিশালিনী স্ত্রী বলিয়া ধরিয়া লইলেই গোল মিটিয়া যায়। এই কাব্যের মনসা-চরিত্র দেখিয়া আমাদের এখনকার সফ্রেজেটদিগকে মনে পড়ে। ইহারা যেমন সাংসারিক প্রতিপত্তি ও অধিকার লাভ করিবার জন্য পুরুষগুলাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, শেষ হত্যারও আশ্রয় লইতে বিরত হইতেছে না, মনসাও তেমনি চন্দ্রধরের কাছে পূজা পাইবার জন্য তাহাকে নানাবিধ বিপদে ফেলিয়া তাহাকে জব্দ করিতেছিলেন। কিন্তু বিপদে ফেলিয়া মনসা চাঁদবেণের কিছুই করিতে পারেন নাই, তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারেন নাই; এমন কি তাহার নয়নের মণি সোণারচাদ পুত্র লখিন্দরকে খাইয়াও তাঁহাকে দমাইতে পারেন নাই। ধনে পুত্রে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। বলিবার ভঙ্গী সুসভ্য না হইলেও মনসার ভাসান কাব্য হইতে চাঁদবেণের চরিত্রের দৃঢ়তা ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাঁদবেণে সদর্পে নিজ সবল পুরষকার লইয়া নিয়তির বিপক্ষে শক্তির বিরোধে দণ্ডায়মান— চাঁদবেণের চরিত্র হইতে আমরা এইটুকু শিখিবার মত পাই। যখন লক্ষ্মীন্দরের শোকে সনকা কাঁদিয়া আকুল, বেহুলা আছাড় খাইয়া হাহুতাশ করিতেছে, আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, এমন কি গ্রামের সকলেই শোকাভিভূত, তখনও চাঁদবেণে অটল অচল। পুত্রশোকে তাহার বুকে দাবানল জ্বলিলেও সে স্থির—বিপদে অস্থির হইয়া সে তাহার বদ্ধপরিকরতা পরিত্যাগ করে নাই। ধনপতির চরিত্রে যে গাম্ভীর্য্য আছে তাহা চাঁদবেণের চরিত্রে নাই বটে, কিন্তু ধনপতির অপেক্ষা তাহার পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল; সে পরীক্ষাতেও যখন সে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিল, তখন তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা অধিক প্রশংসনীয়। চাঁদবেণে সংসারে তিলমাত্র সুখী হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহাতেও সে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই; তাহার চরিত্রে অনেকটা Jobএর মত সহিষ্ণুতা দেখা যায়। চন্দ্রধরের অথবা চাঁদবেণের চরিত্রের এইটুকু বিশেষত্ব।

কবি ক্ষেমানন্দ কিন্তু চাঁদবেণের চরিত্র সমুজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই, অথবা বোধ হয় সে চরিত্রের প্রতি ততটা দৃষ্টি রাখেন নাই, এবং সে চরিত্র ফুটাইবার প্রবৃত্তিও তাঁহার বড় বেশী ছিল না। মনসার ভাসান স্ত্রীপ্রধান কাব্য এবং ইহাতে স্ত্রীচরিত্রগুলি যেমন ফুটিয়াছে পুরুষ চরিত্রগুলি তেমন ফুটে নাই। লখিন্দরের চরিত্র চিত্রিত করিবার কোনও প্রয়াস এই কাব্যে দেখিতে পাই না; অবশ্য তাহার জীবনের ঘটনার উল্লেখ

আছে—যতটকু আছে তাহা কেবল কবির যে চরম উদ্দেশ্য বেহুলার চরিত্র বিকশিত করা—তাহা সাধন করিবার প্রয়োজনে। স্ত্রীচরিত্র-গুলিও মুকুন্দরামের স্ত্রীচরিত্রের মত জটিল নহে, ইহারা সবই রেখাচিত্র—রেখাগুলি সরল ও সতেজ এবং চিত্রগুলিও মনোজ্ঞ ও স্বাভাবিক। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বেহুলার চরিত্রই কবির প্রধান অবলম্বন, কিন্তু সনকা ও অমলার চরিত্রও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বেহুলার চরিত্র অবলম্বনে কবি যেমন সতীত্বের মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, অমলা ও সনকার চরিত্রে তিনি কোমল মাতৃত্ব প্রতিফলিত করিয়াছেন। এই দুই চরিত্রে যে ভাবটা প্রকটিত হইয়াছে তাহা বড় স্নিগ্ধ বড় মধুর, এবং এখনও আমাদের নিত্য পরিচিত। বড় পরিতাপের বিষয় যে আমাদের সাহিত্য হইতে মধুর মাতৃ চিত্রগুলি তিরোহিত হইতে বসিয়াছে, আমরা মাতৃভাবের মহিমা ভুলিয়া যাইতেছি।

অমলা ও সনকা দুই ই দুঃখিনী, তাই ইহাদের চরিত্র গঠনে করুণরস উথলিয়া পড়িয়াছে। আমরা এখন শুনিতে পাই যে, প্রাচীন বাঙ্গালী কবিরা কেবল কাম-রস লইয়াই থাকিতেন। আমাদের যে কতক পরিমাণে এই দোষ ঘটিয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন এরূপ মত প্রকটিত হয় তখন আমাদের মনে স্বতঃই এই কথার উদয় হয় যে, উহা প্রাচীন বঙ্গকাব্যের নিতান্ত একদেশ-দর্শী সমালোচনা। যাহাকে বাঙ্গালীর সাহিত্য বলা যাইতে পারে তাহাতে এই কাম-কলা ছাড়া আরও যে কিছু ছিল তাহা অমলা ও সনকার চরিত্র চর্চা করিলেই বুঝা যাইবে। বরঞ্চ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না অথবা যথার্থ কথাই বলা হয় যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য বা ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান প্রভৃতি কাব্যে—কাম-কলার প্রভাব আদৌ নাই, অন্যান্য বিবিধ রসের প্রাদুর্ভাবই অধিক। মনসার ভাসান কাব্য-খানি পবিত্রতার আকর বলিলেও অন্যায় বলা হয় না, কারণ ইহাতে পবিত্র দাম্পত্য-কর্ত্তব্যের সুবিমল স্নেহের ও ভক্তির চিত্র ব্যতীত হেয় ভাবের চিত্র একেবারে নাই। যে সময় মনসার ভাসান বিরচিত হয়, তখন বাঙ্গালী একেবারে অধঃপাতে যায় নাই মনসার ভাসান গাম্ভীর্য্যহীন হউক, বিরাট ভাবের একখানা কাব্য না হউক, কিন্তু নির্ভয়ে এ কথা বলা চলে যে, ইহাতে কোথাও একটিও জঘন্য ভাবের অবতারণা নাই, বেহুলা-চরিত্র উজ্জ্বল-তর করিবার জন্য তাহার আশে পাশে যে দু-একটা কুৎসিত চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহাদিগকে আমরা কোনও ক্রমেই কুৎসিৎচিত্র বলিতে পারি না, অন্ততঃ সেই চিত্র থাকার জন্য মনসার ভাসান কাব্যকে কামোৎফুল্ল কাব্য বলা যায় না। বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে যে এ অধোগতি পরে হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সে যাহাহউক এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে প্রাচীন কবি ক্ষেমানন্দ রসাব-তরণ বিষয়ে বিশেষ পটু। শুধু সনকা ও অমলার চরিত্রে অথবা বেহুলার চরিত্রেই যে আমরা ইহার পরিচয় পাই তাহা নহে; এই গ্রাম্য-কাব্যের সকল ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও এক একটি রসের সাহায্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে স্নেহ-রসটাই অধিক ফুটিয়াছে এবং মনোজ্ঞ-রূপেই ফুটিয়াছে। মনসার ভাসানের মানুষ-

গুলার হৃদয় আছে, তাহারা পরের জন্য কাঁদিতে জানে ; বেহুলার দুঃখে গ্রামশুদ্ধ লোক কাঁদিয়া পৃথিবী সিক্ত করিয়াছিল ঃ—

'নগরের যত লোকে, হাহাকার করে শোকে,'

কেবল এই শোক-সমুদ্রের মাঝে স্থির ছিল - সে একজন চাঁদবেণে ;—

চাঁদবেণে নাহি কাঁদে পায়ে পুত্র শোক।
নখাইরের তরে কাঁদে নগরের লোক॥

আমাদের প্রাণটা আজ কালক্রমে এত অসাড় হইয়া পড়িতেছে যে, আমরা পরের জন্য তো "চুলোয়" যাক, নিজের জন্যও কাঁদিতে ভুলিতেছি ; চন্দ্রধরের মত স্থিরতা বা ধৈর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া যে কাঁদিতে ভুলিয়াছি তাহা নহে, কাঁদাটাকে অসভ্যতার ভিতর গণ্য করি বলিয়া। আমাদের হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে, আমরা এখন "মাথা" লইয়া মাথা ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়িতেছি। তাই এখনকার সাহিত্যে 'রস" উপিয়া গিয়াছে—সারল্য তিরোহিত হইতে বসিয়াছে। সে দিন কোনও এক বিলাতী সমালোচনার মত দেখিলাম যে আধুনিক সাহিত্যে আর রসের স্থান নাই, এখন ইহার ভিতর হৃদয়ের স্থানে মস্তিষ্ককে খুঁজিতে হইবে। ভাল কথা, কিন্তু মস্তিষ্কের সাহায্যে কি সাহিত্য গঠিত হয়—না এখন তাহা হইতেছে? ইউরোপে কি এখন সেক্সপীয়র মিলটনের জন্ম হইতেছে? তাহা হয় না বলিয়া ইউরোপ এবং তদনুকরণে আমরাও নীরস হইয়া পড়িয়াছি ; এখন পিতার সহিত পুত্রের সম্পর্ক শিথিল হইতেছে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে উৎসুক হইয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাবে সমষ্টির অনিষ্ট সাধিতে কেহ পশ্চাদ্পদ হইতেছে না। সাহিত্যে গৃহচিত্র, পারিবারিক চিত্র স্নেহের ছবি বড় একটা স্থান পায় না, তাহার পরিবর্ত্তে বড় বড় সমস্যা (problem) আসর জুড়িয়া বসে। কিন্তু মনুষ্যের মস্তিষ্ক পরিচালক আপাতঃ প্রয়োজনীয় অথবা সাময়িক মূল্য সম্বলিত মত-সমষ্টি বা ঘটনাবলী অপেক্ষা মনুষ্যের অপরিবর্ত্তনীয় হৃদয় বৃত্তিগুলি—যাহারা চিরপুরাতন হইয়াও চিরনূতন এবং রসের অবলম্বন—সাহিত্যের যথার্থ উপাদান, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সেই উপাদান আমরা আজকালকার সাহিত্য অপেক্ষা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বেশী দেখিতে পাই—সেখানে দেখিতে পাই যে মানুষের স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি শুখাইয়া যায় নাই, মনুষ্যের চরিত্র-বল অন্তর্হিত হয় নাই, মানুষ স্বার্থান্ধ হয় নাই।

মনসার ভাসানে শুধু মাতৃ-হৃদয় বা পিতৃ-হৃদয় উন্মুক্ত হয় নাই, স্নেহের আরও অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে ; একটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বেহুলার ভাইয়েরা বেহুলাকে লইতে আসিয়াছে, আসিয়া তাহারা নিদারুণ সংবাদ শুনিল, বেহুলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিল—শুনিল ও দেখিল বেহুলা মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করিতে কৃতসংকল্পা হইয়া স্বামীর শবসহ "কলার মান্দাসে" ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা স্নেহের ভগিনীকে ফিরাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছে, এবং তদুত্তরে বেহুলাও যে যে উত্তর দিয়াছে, কবি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমরা সেই টুকু উঠাইয়া দিতেছি :—

'সুবল সুন্দর বলে ভগিনী-গো শুন।
মড়াটা লইয়া কোলে জলে ভাস কেন॥
বাহুড়িয়া আইস ঘরে ফিরাও মান্দাস।

মাতা পিতা নাহি জীবে গণিও হুতাশ ॥
ভাইয়ের করুণায় তবে রামা বলে শুন।
কূলে দাঁড়াইয়া ভাই আর কান্দ কেন ॥
তিন ভাই বলে ভগ্নী তোর অল্প জ্ঞান।
সর্পাঘাতে মরিলে কি পায় প্রাণ দান ॥
ছাওয়াল ভগিনী তুমি বুঝ বিপরীত।
তোর পতি প্রাণ দান পাবে কদাচিত ॥

*   *   *   *

কূলে দাঁড়াইয়া কাঁদে বেহুলার ভাই।
বাহুড় বাহুড় দিদি চল ঘরে যাই ॥
সাত নাহি পাঁচ নাহি একা ভগ্নী তুমি।
তোমার শোকেতে নাহি জীবে জননী ॥
আমা সবাকারে তুমি কেমনে ছাড়িবে।
মড়াটা লইয়া কেন জলে ভেসে যাবে ॥
ঘরের প্রধান তুমি মায়ের জীবন।
মড়ার সহিত কেন মর অকারণ ॥
আগে তুমি খাবে পিছু আমরা খাইব।
ঘরের প্রধান তুমি মোরা কি বলিব ॥
শুনিয়া বেহুলা বলে শুন সহোদর।
পুনর্ব্বার প্রাণ যদি পায় প্রাণেশ্বর ॥
তোমা সবাকার ঘরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাজের সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে ॥
দারুণ বিধাতা মোরে কৈল কোড়ে রাঁড়ী।
কত বা ফেলিব নিত্য নিরামিষ হাঁড়ী ॥
কহিও মায়েরে মোরে আশীর্ব্বাদ করিতে।
পরিশ্রমে পারি যদি কান্ত জীয়াইতে ॥
বেহুলা বলেন দাদা না কাঁদিহ আর।
চাঁপাতলায় পুঁতি রাখ মেলানির ভার ॥
প্রভুরে জীয়াতে পারি তবে সে আসিব।
খাইয়া মেলানি তবে মায়েরে দেখিব ॥
অকারণ কান্দ ভাই কূলে দাঁড়াইয়া।
কান্ত যদি জীয়ে পুনঃ আসিব ফিরিয়া ॥
আর কেন কান্দ ভাই দাঁড়াইয়া কূলে।
পাইবে আমার দেখা প্রাণনাথ জীলে ॥

মনসার ভাসানে এইরূপ সুন্দর সুন্দর খণ্ড চিত্র অনেকগুলি আছে। কতকগুলি চিত্র কবিকঙ্কণের কাব্য হইতে অনুকৃত হইয়াছে, যেমন বাঙ্গাল মাঝির ক্রন্দন, ঘটকের ঘটকালী প্রভৃতি। বিবাহাদি সামাজিক ঘটনা বর্ণনাও অনেক পরিমাণে এই ধরণের। আলোচ্য কাব্যখানিকে বস্তুনিবন্ধ (matter of fact) কাব্য বলা যায়। ইহার মধ্যে অবান্তর প্রস্তাব বড় কম, এমন কি ইহার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণন একেবারে নাই বলিলেই চলে। লোক যেমন গল্প বলিয়া যাইবার সময় শুধু গল্পই বলিয়া যায়, তাহার ভিতর প্রাকৃতিক শোভার বর্ণন করিতে বসে না, ক্ষেমানন্দও তাহাই করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি বেহুলার জীবনচরিত গল্পের ছলে বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে চরিত্র বিকাশ যতটুকু হইবার তাহা হইয়াছে, তিনি কোথাও এই আখ্যানটিকে অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা করেন নাই। এক হিসাবে ইহাতে তাঁহার কাব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ অলঙ্কার সুবিন্যস্ত হইলে কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর এক হিসাবে ইহাদ্বারা কবির উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে—তাঁহার একাগ্রতা ভাল করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবির উদ্দেশ্য বেহুলার চরিত্র ফুটাইয়া তোলা—এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমাবধি তাঁহার সকল কৌশল প্রয়োগ করিতেছিলেন। তাঁহার মন আর কোনও দিকে যায় নাই, তাঁহার কল্পনা অপর কোনও বিষয় লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, তাঁহার

চক্ষে জগতের সকল শোভা উপেক্ষিত হইয়া এই অপূর্ব্ব সতী-চরিত্ররূপে সার শোভাটিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বুঝিতেন, তাই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা তাহাদের মনকে একটি বিষয়ে বাঁধিয়া রাখা। এমন কি বেহুলার বাহ্য শোভা, তাঁহার রূপবর্ণনেও, কবি অধিক সময়ক্ষেপ করেন নাই, দু একটি উপমায় তাহাও সারিয়া লইয়াছেন। বেহুলার অলৌকিক ব্রত-উদ্‌যাপনার্থ যে যে বিষয়ে তাঁহার যে যে গুণ প্রয়োজনীয় তাহারই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, এই চরিত্রের প্রস্ফুটনার্থ যে যে ঘটনা যে যে চরিত্র চিত্রিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই তিনি আঁকিয়াছেন। মহাকবি কবিকঙ্কণ যে কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, ক্ষেমানন্দের সে প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহার একনিষ্ঠতা তাঁহার সেই দোষ অনেকাংশে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বেহুলাকে লইয়াই তাঁহার কাব্য, বেহুলাকে লইয়াই তাঁহার আখ্যান। যাহা বেহুলা সম্পর্কিত নয় তাহাতে তাঁহার উৎসাহ নাই, দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। বেহুলাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সমগ্র চিত্রাবলী। মনসা বেহুলার আরাধ্যা, বেহুলা তাঁহার পূজা প্রচার করিবে, এবং সেই পূজা প্রচার করিবে চাঁদবেণের সাহায্যে—তাই চাঁদবেণের মনসা-বিদ্বেষ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মনসা পূজা পর্য্যন্ত চিত্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীজীতেন্দ্রলাল বসু।

প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে স্বাস্থ্যলাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরাজি ভাষায় বড় লেখক বা বাগ্মী বলিয়া এ দেশে তাঁহাকে কেহ জানিত না, অতএব বিলাতে তাঁহার যশ প্রচারিত হইবার কোন কথা ছিল না। অথচ এক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার যশ যেরূপ ঘোষিত হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় কোন বাঙ্গালী অথবা ভারতবাসীর সেরূপ হয় নাই। বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় মনে পড়ে। যখন শিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় বিবেকানন্দের ভেরী-কণ্ঠ প্রতীচ্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল তখন তাঁহাকে কে চিনিত? তিনি বেগবতী ওজস্বিনী ইংরাজি ভাষায় ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ কখন ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন নাই, ইংরাজি লেখা প্রকাশ করেন নাই, তবে কোন্ মোহিনী শক্তিতে তিনি ইয়োরোপ ও আমেরিকাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন? সে কথা কাহারও অবিদিত নাই। দূর প্রবাসে বসিয়া তিনি স্বরচিত কতকগুলি কবিতা ইংরাজি গদ্যে অনুবাদ করেন। সে গুলি কয়েক জন ইংরাজ কবি ও সমালোচককে দেখান এবং

তাঁহাদের প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া 'গীতাঞ্জলি" প্রকাশিত করিয়াছেন। মূল রচনা তাঁহার, অনুবাদও তাঁহার। ইহাতেই তাঁহার যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। সে দিন তিনি 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরাজি অনুবাদ সভায় পাঠ করিবার পর ভারতের অন্যতর সচিব মিষ্টার ই এস, মণ্টো যেরূপ করিয়া তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন তাহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ;

প্রবাসে রবীন্দ্রনাথের যেরূপ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, স্বদেশেও তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা টাউন হলে তাঁহাকে যেরূপে অভিনন্দন করা হয়, তাহা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। সে সম্মান রবীন্দ্রনাথের নয়, বাঙ্গালী জাতির। তাঁহার সম্মান করিয়া বাঙ্গালী আপনাকে সম্মানিত করিয়াছে। সকল দেশেই একটা কথা আছে যে, স্বদেশে গুণবানের আদর হয় না। রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করিয়া বাঙ্গালী কর্ম্মক্ষেত্রে সে কথার প্রতিবাদ করিয়াছে। বিদেশে তাঁহার যে সম্মান হইয়াছে তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালীর আরও গৌরব অনুভব করা উচিত, কিন্তু দুই চারিজন বাঙ্গালীর পক্ষে ঘটিয়াছে তাহার বিপরীত। কোন বাঙ্গলা কাগজপত্রে সে কথার বড় উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং কতক বিদ্রূপ, কতক শ্লেষের আমেজ দেখা যায়। সে সকল ইঙ্গিত-কটাক্ষে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের এতটা সম্মান তাঁহাদের তেমন প্রীতিকর হয় নাই, তাঁহাদের মনের ভাবটা যেন তাঁর যতটা খ্যাতি হইয়াছে তিনি তাহার যোগ্য নহেন। ঠারে ঠোরে যেন বলা হইয়াছে যে ইংরাজ জাতি কিছু বোকা, নহিলে রবীন্দ্রনাথের কি এত বড় প্রতিভা যে তাহারা তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি বলে ? তাঁহারা চতুর, ইংরাজের অতিবাদে ভুলিবার পাত্র নন, রবীন্দ্রনাথকে আকাশে তুলিলে তাঁহারা আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত বিবেচনা করিবেন না। কতকটা ঝাঁঝালো (Smart) লেখার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া, কতকটা নির্ভীক সমালোচকের পদ কামনায় কাহারো কাহারো এই রকম মত হয়, কিন্তু জাতির পক্ষে এ লক্ষণ ভাল নয়। কৃষ্ণদাস পাল যখন বঙ্গদেশে প্রধান ব্যক্তি, তখন তাহার নামে একটা ছড়া উঠিয়াছিল—

তেলি
হাত পিছলে গেলি,
অনরেবল হলি !

রবীন্দ্রনাথের নামে কেহ কেহ বা সেরূপ কোন ছড়া তুলিলে অবশ্য কিছু বলা চলিত না, কারণ রসিকতার যে কোন দোষ আছে তা নয়, পৃথিবীতে এমন লোকই নাই যাহার সম্বন্ধে দুইটা হাসির কথা বলা বা লেখা যায় না, কিন্তু ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের গৌরব আমাদের দেশের, আমাদের জাতির গৌরব, এ কথা যদি আমরা না বুঝি বা অপরকে না বুঝাই ত আমাদের মন্দ ভাগ্য। ইংলণ্ডে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, কবি ও সমালোচক। শুধু যে হুজুগ করিবার জন্য তাঁহারা বাঙ্গালী কবিকে বাড়াইয়াছেন এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই, এবং তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা হয়। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সকলেই বাঙ্গালী, ইয়ো-

রোপে ইঁহাদের সকলেরই প্রশংসা এবং সম্মান হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সম্মানেও আমরা গৌরব ও আনন্দ অনুভব না করিব কেন?

ইহার মূলে জাতীয় চরিত্রের একটা বড় কথা আছে। গুণগ্রাহিতা হৃদয়বানের লক্ষণ। নিন্দা করা মানুষের সহজে আইসে কিন্তু ক্রমাগত নিন্দাপ্রবণ হইলে মানুষের প্রকৃতি নীচ হইয়া যায়। সমালোচকের কথা বলিতেছি না, সাধারণ লোকের কথা হইতেছে। যদি জননী জন্মভূমির প্রতি যথার্থ ভালবাসা থাকে ত বাঙ্গালী যে ভাই ভাই এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই কেন? একজন বাঙ্গালীর গৌরবে সমগ্র জাতির গৌরব সে কথা স্মরণ করি না কেন? আমরাই প্রথমে কবিকে জয়মাল্য দিয়া বরণ করি, এখন যদি তাঁহার যশ সুদূর প্রবাসে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে যে আমরা যথার্থ গুণের সমাদর করিতে জানি এই কথা মনে করিয়া আমাদের প্রীতি লাভ করা উচিত। ইয়োরোপে যাহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ললাটে কবির রাজতিলক দিয়াছেন তাঁহারা ধন্য, তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আজ বাঙ্গালার কবি জগতের কবি এ কথা মনে করিয়া কোন্ বাঙ্গালী হর্ষ-গৌরবে আপনাকে ধন্য মনে না করিবে?

আর একটি কথা। মানুষের চরিত্র ও মানুষের প্রতিভা ও শক্তি দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস। চরিত্রশূন্য ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হয় এমন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাহারও চরিত্রে কোন দোষ থাকিলে তাহার কীর্ত্তি ম্লান বা হ্রাস হয় না। প্রাচীন মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তিই আছে, তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। ফরাসী বিপ্লবের প্রধান নেতা কাউণ্ট মিরাবো যেমন শক্তিশালী ছিলেন তেমনি তাঁহার চরিত্রদোষ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে কার্লাইল লিখিয়াছেন যিনি তাঁহার স্রষ্টা তিনি তাঁহার বিচারক, তুমি আমি বিচার করিবার কে? এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে প্রশংসায় বা নিন্দায় বড় একটা আসিয়া যায় না, যাহার যে শক্তি থাকে সেই শক্তির বিকাশে সে স্মরণীয় হয়। কিন্তু যদি প্রতিভা ও চরিত্রের সমবায় একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে গৌরবের বিশেষ কারণ হয়। রবীন্দ্রনাথের ঋষিতুল্য চরিত্র, তাহার বিনয়, তাহার উদারতা ও সৌজন্য কাহার অবিদিত আছে? তাঁহার স্বদেশ-প্রেম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কণ্ঠে কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে। বোলপুরে তাঁহার পাঠশালা ও ছাত্রনিবাস যে দেখিয়াছে সে-ই মুক্তকণ্ঠে তাহার মহৎ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিয়াছে। দিল্লীর সেণ্ট ষ্টীফেন্‌স কলেজের আচার্য্য এণ্ড্রুজের নাম সকলে শুনিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে কয়েক সপ্তাহ রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে বাস করেন। রবীন্দ্র-নাথের সম্বন্ধে তিনি অনেক লিখিয়াছেন এবং রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিংএর সাক্ষাতে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। দিল্লীতে এণ্ড্রুজ সাহেব সর্ব্বদাই আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প করিতেন। তিনি আমাকে বলেন, "I have never seen a greater personality in my life." এ কথা ব্যক্তিগত, কবির প্রতিভা সম্বন্ধে নহে। রবীন্দ্রনাথের সম্মানে বাঙ্গালী জাতির যেরূপ সম্মান ও গৌরব হইয়াছে অনেক কাল সেরূপ হয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বৈদিক সাধনার আভাস

এইরূপে ঋষিগণ শতবর্ষ পরমায়ু প্রার্থনা করিতেন। কেন? মরণের ভয়ে কি? না দীর্ঘকালব্যাপী বিষয়-ভোগের লালসায়? এ প্রশ্নের উত্তর ঋষি নিজেই দিয়াছেন :—

'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্র
পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং
যদায়ুঃ ॥
শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা
জরসং তনূনাং।
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা
রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ ॥"

১।৮৯।৮,৯

হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা কল্যাণময় বাক্য সকল শুনিতে পাই, হে যষ্টব্য দেবগণ, আমরা যেন চক্ষু দ্বারা কল্যাণময় বিষয় সকল দেখিতে পাই। আমরা যেন দৃঢ় অবয়ব ও শরীরযুক্ত হইয়া তোমাদিগের স্তুতি করিতে করিতে দেব-নির্দ্দিষ্ট যে আয়ু তাহা ভোগ করিতে পারি। হে দেবগণ, মনুষ্যদিগের জন্য শত বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব এই আয়ুঃকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে নাশ করিও না, যে কালের মধ্যে আমাদিগের শরীর তোমরা জরাগ্রস্ত করিবে ও আমাদিগের পুত্রেরা আমাদিগের পালক হইবে।

"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম" প্রভৃতি ঋকৃটি মুণ্ডকোপনিষদের মূল শ্লোক; সুতরাং শুধু যে আমাদের মত তাহা নহে, জ্ঞানমার্গের দ্বারপ্রদর্শক ঔপনিষদিক ঋষিরও এই মত যে বৈদিক ঋষি পারমার্থিক শ্রেয়োলাভের জন্যই দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেন। কর্ম্মমার্গের অধিকারী সাধক ইহ জগতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে করিতে শত বর্ষ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেন, ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের মত।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"
—ঈশোপনিষৎ ২।

"অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥"

প্রশ্নোপনিষৎ ২।৬

রথচক্রের নাভিতে অরসকলের ন্যায় সমস্তই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে; ঋক্ সকল, যজুঃ সকল ও সাম সকল এবং যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণও প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে।

তাই বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন :—

"বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ
খামৃতস্য।
মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা
শার্যপসঃ পুর ঋতোঃ ॥"

২।২৮।৫

হে বরুণ, রজ্জুর ন্যায় পাপের বন্ধন আমা হইতে শিথিল কর, যাহাতে আমি তৎসম্বন্ধীয় ঋতের বা সত্যের পূর্ণা নদীকে লাভ করিতে পারি। কর্ম্ম করিতেছি যে আমি আমার কর্ম্মসন্ততি ছিন্ন করিও না, ঋত সমাপ্তি কালের পূর্ব্বে কর্ম্মের শরীর নষ্ট করিও না।

বৈদিক ঋষির নিকট আয়ু কেবল স্থূল দেহের জীবিতসংহতাবস্থাব্যাপক কাল ছিল

না। ঋক্ সংহিতার একাধিক স্থলে বায়ু দেবতা আয়ু নামে অভিহিত হইয়া পূজিত হইয়াছেন। যেমন পরমাত্মা ও জীবাত্মায় বস্তুগত ভেদ নাই, সেইরূপ বিশ্ববায়ুতে ও প্রাণবায়ুতে কোন বস্তুগত ভেদ নাই। জীবাত্মা যেমন অবিদ্যোপহিত পরমাত্মপদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাণবায়ুও সেইরূপ শরীরোপহিত বিশ্ববায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই ঋষি বায়ুদেবতার স্তোত্রগান করিতে করিতে বলিয়াছেন, হে বায়ু, তুমি দেবগণের আত্মস্বরূপ ও ভূতজাতের অন্তর্নিহিত প্রাণস্বরূপ ("আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভঃ।" ১০।১৬৮।৪)। প্রাণবায়ু দ্বিবিধ—স্থূল-শরীরান্তর্গত ও সূক্ষ্ম-শরীরান্তর্গত; কারণ জীবের শরীর দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত; সুতরাং স্থূল শরীরান্তর্গত প্রাণবায়ু স্থূলবায়ু মাত্র। স্থূল শরীরের নাশে স্থূল প্রাণবায়ু স্থূল বিশ্ববায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। সূক্ষ্মশরীর সূক্ষ্মপঞ্চতন্মাত্র দ্বারা গঠিত, সুতরাং সূক্ষ্মশরীরান্তর্গত প্রাণবায়ুর উপাদান সূক্ষ্ম বায়ুতন্মাত্র। সূক্ষ্মশরীর নষ্ট হইলে সূক্ষ্মপ্রাণবায়ু সূক্ষ্মবিশ্ববায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জীব সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অনবরত সেই সঙ্গমের দিকে ছুটিতেছে। কিন্তু যে অনাদিভূত সংস্কার সকলের বশে জীব দেহধারী জীব, সেই সকল সংস্কারের নাশ না হইলে সূক্ষ্ম দেহের নাশ হয় না ও জীবের বিদেহ-কৈবল্যও প্রাপ্তি হয় না। এই সকল সংস্কারের নাশের জন্য জীবকে এক অবিচ্ছিন্নরূপী সূক্ষ্মদেহ ভিন্ন বহু স্থূল শরীর ধারণ করিতে ও ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্যই স্থূল শরীরের প্রয়োজনীয়তা এবং এই জন্যই স্থূল শরীরের দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়। নতুবা, জ্ঞানীর নিকটে জীবের প্রাণ তাহার সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত। যাহারা অজ্ঞানী, যাহাদের দৃষ্টি স্থূলদেহের অতিরিক্ত কোন পদার্থের উপলব্ধিকরণে অসমর্থ, তাহারাই কেবল স্থূলশরীরের নাশে জীবের প্রাণনাশ দেখে। জীবের সূক্ষ্মদেহ একবার ভিন্ন মরে না। সূক্ষ্মদেহের প্রাণ সূক্ষ্ম দেহকে কখনও ছাড়িয়া যায় না, যখন যায় তখন জীব আর জীব থাকে না। সূক্ষ্মদেহের এই সূক্ষ্ম প্রাণই জীবের যথার্থ আয়ু। এই জন্য বৈদিক ঋষি স্থূলদেহাবসানের পর জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—

"আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরিপাসতি ত্বা পূষা ত্বা পাতু
প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ
সবিতা দধাতু॥" ১০।১৭।৪

আয়ুরূপী বিশ্বায়ু তোমাকে পালন করুক; প্রথমে পূষা তোমাকে প্রকৃষ্ট পথে রক্ষা করুন। সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি সকল যেখানে অবস্থিত আছেন ও গমন করেন সেই স্থানে দেব সবিতা তোমাকে স্থাপন করুন।

ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বিতীয় সোপান, অদ্বৈত জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর। বিরাটত্বের প্রথম জ্ঞান প্রথমে অন্নে হয়, পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রাণে হয়। আত্মা অন্নময় এই ধারণার পর আত্মা প্রাণময় এই সূক্ষ্মতর ধারণা হয়। ভৃগু ঋষি দ্বিতীয়বার তপস্যা করিয়া "প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ" প্রাণ ব্রহ্ম ইহা জানিয়াছিলেন (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ" ৩।৩)।

"প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি।
মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।

প্রাণো হি ভূতামানায়ুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্ব্বমেব আয়ুর্যন্তি।
যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।"

যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বায়ু প্রাপ্ত হন। সাধকের বুদ্ধি অন্নময়কোষ হইতে প্রাণময়কোষে স্থির হইলে তাঁহার অমরত্ব প্রাপ্তি হয়। স্থূল-শরীররূপ অন্নময়কোষে আর তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। দেব সবিতা তাঁহাকে স্বর্গে দেবলোকে অমরত্বপদে স্থাপনা করেন। মৃত্যু আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন :—

"পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে স্ব
ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং
রীরিষো মোত বীরান্॥
মৃত্যো পদং চোপযংতো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ
প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত
যজ্ঞিয়াসঃ॥" ১০।১৮।১,২

হে মৃত্যু, দেবযান পথ হইতে ভিন্ন তোমার যে স্বভূত অন্য পথ আছে সেই পথে এ স্থান হইতে গমন কর; চক্ষুষ্মান্ শ্রোত্রবান্ তোমাকে বলিতেছি, আমাদিগের সন্ততি ও পুত্রাদিকে হিংসা করিও না। ১। হে মৃত্যুর পথ (পিতৃযান পথ) পরিবর্জ্জনকারিগণ, যেহেতু তোমরা (দেবযানপথে) আগমন করিয়াছ, অতএব তোমরা দীর্ঘতর ও প্রকৃষ্টতর আয়ু ধারণ কর। হে যজ্ঞসম্পাদনকারী যজমানগণ, তোমরা সন্ততি ও ধন দ্বারা বর্দ্ধিত হও, (জন্মান্তর-সঞ্চিত দুরিত-ক্ষয়-হেতু) শুদ্ধ হও ও (ইহ জন্মোপচিত দুরিত ক্ষয়হেতু) পবিত্র হও। ২।

দেখা গেল বৈদিক ঋষি যে অর্থ, পশু, পুত্র, দীর্ঘজীবন প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা করিতেন তাহা ঐহিক ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, পরন্তু পারলৌকিক ও পারমার্থিক শ্রেয়ের জন্য। পারলৌকিক ও পারমার্থিক শ্রেয় কি তাহা ঋষিবাক্য দ্বারাই দেখাইতেছি। ঋষি বলিতেছেন —

"উর্দ্ধ্ব নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং
সমত্রিণং দহ।" ১৩৬।১৪

(হে যূপ,) তুমি উন্নত হইয়া আমাদিগকে জ্ঞান দ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর, সর্ব্ব-ধ্বংসকারীকে দহন কর।

"ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্ত্যং।
দক্ষিণা পাত্বংহসঃ॥
সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং।
সনিং মেধামযাসিষং॥
যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।
স ধীনাং যোগমিন্বতি॥" ১।১৮।৫,৬,৭

হে ব্রহ্মণস্পতি, ইন্দ্র, সোম ও দক্ষিণাদেবী, মর্ত্ত্যকে পাপ হইতে রক্ষা কর। আমি মেধা লাভ করিবার জন্য সদসস্পতিকে পাইয়াছি যিনি অদ্ভুত, ইন্দ্রের প্রিয়, কমনীয় ও ধনদাতা; যাঁহাকে ছাড়িয়া বিদ্বানের যজ্ঞও সিদ্ধ হয় না। তিনি ধীসকলের যোগ (সম্বন্ধ) স্থাপনা করেন।

"ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিংচ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং॥

অপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা॥

১।২৩।২২-২৩

হে অপ্ সকল আমাতে যাহা কিছু (অজ্ঞানকৃত) দুরিত আছে, অথবা আমি সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানপূর্ব্বক যে দ্রোহ করিয়াছি, কিম্বা (সাধুজনকে) যে অভিসম্পাত করিয়াছি, কিম্বা যে মিথ্যা বলিয়াছি তাহা বহন করিয়া লইয়া যাও। অদ্য অপ্ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া সম্যক্‌রূপে রসসিক্ত হইয়াছি, হে অগ্নি পয়োযুক্ত তুমি আগমন কর ও এতদ্রূপ আমাকে তেজঃসম্পন্ন কর॥

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

—১।১৮৯।১

হে সর্ব্বজ্ঞাতব্যবিষয়ে বিদ্বান্ দেব অগ্নি, আমাদিগকে শোভন পথে (স্বর্গাদি) ধন প্রতি লইয়া যাও। কুটিলকারী পাপকে আমাদিগের হইতে পৃথক্ কর। আমরা তোমার ভূয়িষ্ঠ নমস্কার বিধান করিতেছি।

"অপো সুম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রাড়ৃতাবোঽনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে॥"

২-২৮৬

হে বরুণ, আমা হইতে ভয় দূরীভূত কর। হে সম্রাট্ (সম্যক্ রাজমান্), হে ঋতবন্ (সত্যবন্), আমাকে অনুগ্রহ কর। গো-বৎস হইতে দোগ্ধা যেমন রজ্জু বিমোচন করে, সেইরূপ আমা হইতে পাপ বিমোচন কর। এক নিমেষের জন্যও তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও চাহি না।

"প্র ব একো ভূর্যাগো যন্মা পিতেব কিতবং শশাস।
আরে পাশা আরে অঘানি দেবা মা মাধি পুত্রে বিমিব গ্রভীষ্ট॥ ২।২৯।৪

হে দেবগণ, আমি একাকী তোমাদিগের বিরুদ্ধে অনেক পাপ করিয়াছি এবং তজ্জন্য তোমরা আমাকে পিতা যেমন পুত্রকে শাসন করে সেইরূপ শাসন করিয়াছ। হে দেবগণ, পাশ সকল বিদূরিত হউক, পুত্রের সম্মুখে পক্ষী-পিতাকে ব্যাধ যেরূপ গ্রহণ করে সেইরূপ ভাবে আমাকে গ্রহণ করিও না।

"অস্মাকমগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সূনো ত্রিষধস্থ হব্যং।
বয়ং দেবেষু সুকৃতঃ স্যাম শর্ম্মণা নস্ত্রিবরূথেন পাহি॥" ৫।৪।৮

হে অগ্নি, আমাদিগের যজ্ঞ সেবন কর; হে বলের পুত্র, হে ত্রিস্থানস্থ দেব, হব্য সেবন কর। আমরা যেন দেবগণের মধ্যে সুকৃতি সম্পন্ন হইতে পারি। বরণীয় ত্রিবিধ (বাচিকাদি) সুখের দ্বারা আমাদিগকে পালন কর।

"আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং দিদৃক্ষেণ্যং সূর্যস্যেব চক্ষণং।
উতো অস্মাঁ অমৃতত্বে দধাতন * *॥ ৫।৫৫।৪

হে মরুদ্গণ, তোমাদিগের মহত্ত্ব স্তুতিযোগ্য, তোমাদিগের সূর্য্যের ন্যায় রূপ দর্শনীয়। আমাদিগকে অমৃতত্বে স্থাপন কর।

"ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ॥" ১০।২০।১

হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে শুভযুক্ত মন প্রেরণ কর।

এইরূপে কাতর কণ্ঠে ঋষি চিত্তশুদ্ধির জন্য অহংহঃ প্রার্থনা করিয়াছেন। হে দেব, আমি জ্ঞানহীন আমাকে জ্ঞান দাও, আমি দীন হীন মূঢ় পাপী, আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর, আমার সর্ব্বনাশী অবিদ্যাকে নাশ কর; জ্ঞানে ও অজ্ঞানে আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর, আমি মোহান্ধকারে নিমগ্ন, আমাকে তেজঃসম্পন্ন কর; আমাকে যেন বিভীষিকাপূর্ণ নরকের পথে ভ্রমণ করিতে না হয়। সংসারের তাপ স্মরণ করিয়া আর্য্য ঋষি অশ্রুসিক্ত লোচনে দেবচরণে জানাইয়াছেন, প্রভো, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম; আমি বড় পাপী, কিন্তু তজ্জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী পিতার ন্যায় তুমি আমাকে শাসন করিয়াছ; হে দয়াময়, আর যেন আমাকে পাপ স্পর্শ করিতে না পারে; আর যেন আমি ব্যাধহস্তে ক্ষুদ্র পক্ষীটির মত দুষ্কর্ম্মের হস্তে নিগৃহীত না হই; আমার চিত্তের মল বিধৌত কর। যজ্ঞভূমিতে লুটাইয়া আকুল প্রাণে ঋষি বলিয়াছেন, প্রভো, নাথ, দয়াময়, আমি এক নিমেষের জন্যও তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও চাহি না; তোমার বিরহ আমার অসহ্য।

এইরূপ ভক্তির সাহায্যে ঋষি বিমল বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হইতেন, উর্দ্ধমুখী কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বপিতাকে আরাধনা করিয়া অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিতেন এবং চির আলোকময় সবিতৃরাজ্য স্বর্গধামে বাস করিবার উপযুক্ত হইতেন। ইহারই নাম ধর্ম্মানুষ্ঠান।

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥
সাংখ্যকারিকা, ৪৪।

ধর্ম্মের দ্বারা উর্দ্ধে স্বর্গাদিলোকে গমন হয়, অধর্ম্মের দ্বারা নিম্নে সুতলাদি নরকে গমন হয়, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয় ও অজ্ঞানের দ্বারা সংসার বন্ধন হয়।

যজ্ঞাদি উপাসনামূলক ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তাই সোম-যজ্ঞের অন্তে বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন;—

"যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিঁল্লোকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো
পরিস্রব॥" —৯-১১৩-৭,৮

হে পবমান, যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ বর্ত্তমান, যে লোকে স্বঃ অর্থাৎ আদিত্যাখ্য জ্যোতিঃ নিহিত আছে সেই মরণধর্ম্মরহিত অতএব অক্ষীণলোকে আমাকে স্থাপন কর; হে ইন্দু, ইন্দ্রের জন্য পরিস্রুত হও। যে লোকে বৈবস্বত রাজা, যে লোকে আদিত্য অবরুদ্ধ (অর্থাৎ ভূতবর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট) এবং যে লোকে এই সকল (গঙ্গাদি) মহতী অপ্‌-সকল বর্ত্তমান, সেই লোকে আমাকে মরণ ধর্ম্মরহিত কর; হে ইন্দু, ইন্দ্রের জন্য পরিস্রুত হও। ৮। (ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে বাঙ্গলার একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে। তিনি একাধারে কবি, নাটককার, সঙ্গীতকার, পরিহাস-রসিক ও একজন প্রধান সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলার সাহিত্য ও সমাজে যে স্থান শূন্য হইয়াছে—তাহা শীঘ্র পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে বংশের সন্তান ছিলেন তাহা বাঙ্গলার একটী অতি সম্ভ্রান্ত বংশ। কৃষ্ণনগরের দেওয়ান-বংশকে বাঙ্গলার কে না চিনে? এই বংশ সাহিত্য-চর্চ্চার জন্যও বাঙ্গলায় বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা স্বর্গগত দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। অন্য প্রকারেও তিনি সেকালের বঙ্গসমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং সাহিত্য-সেবা দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক অধিকার ছিল বলা যায়। এই পৈতৃক অধিকারের তিনি য সর্ব্বপ্রকারেই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও বিলাতের সাইরেনসেষ্টার্ কলেজে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রথম যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের দরবারে দেখা দেন, তখন সে হাসির পসরা লইয়া। প্রাচীন বাঙ্গলার হাস্যরস ছিল বটে—কিন্তু তাহা অল্পবিস্তর অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট ছিল, বিশুদ্ধ হাস্যরসের একপ্রকার অভাব ছিল বলিলেই হয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী-প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সেকালের রসিকতাকে তিনি মোটা লাঠির ঘায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই অস্ত্র লইয়া যে আঘাত করিত সে হাসিত বটে কিন্তু যাহার লাগিত তাহার হাসি অপেক্ষা ক্রন্দনের সম্ভাবনাই বেশী থাকিত। একালের রসিকতাকে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন ডাক্তারের ল্যানসেট্। ইহা কুচ করিয়া কাটিয়া দেয়—রক্তও বাহির হয়, কিন্তু রোগী সহজে বুঝিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রও প্রাচীন রসিকতার সংক্রামক স্পর্শ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে এই বিশুদ্ধ হাস্যরসের আমদানী করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আসরে নামিয়াই এই বিশুদ্ধ হাস্যরসে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। বাঙ্গলার লোক তাঁহার আমদানী করা নূতন জিনিষে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া গেল।

বিশুদ্ধ হাস্য যেমন ব্যক্তির পক্ষে তেমনি সমাজের পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কবি বলিয়াছেন যে মানুষ প্রাণ ভরিয়া হাসে না, সে খুন পর্য্যন্ত করিতে পারে। খুন করুক আর নাই করুক, তাহার যে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এ কথা নিশ্চিত। জাতির পক্ষেও তাহাই। হাসি আনন্দের বাহ্যরূপ। যে জাতি হাসিতে জানে না—যাহার প্রাণে আনন্দ নাই, সে যে সুস্থ দেহে নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ অল্প। সে জাতি হয় ত কুশাগ্র বুদ্ধি, গম্ভীর-স্বভাব দার্শনিক হইতে পারে, কিন্তু প্রাণময়, লীলাময়, জীবন্ত জাতি নহে;

—কঠোর নীতি প্রবণ হইতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের মাধুর্য্য হারাইয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং হাসির সাহিত্য জাতীয় প্রাণেরই পরিচয় দেয়, —আর যিনি হাসাইতে পারেন তিনি লোকসমাজের পরম বন্ধু। দ্বিজেন্দ্রলাল এই হিসাবে বাঙ্গালী জাতির পরম বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। এই অবসাদ-গ্রস্ত, দারিদ্র্যভার-পীড়িত জাতিকে তিনি হাসাইতে পারিয়াছিলেন,—এই অনাহার ক্লিষ্ট, রুগ্ন, নিরাশপ্রাণ জনগণের হৃদয়ে তিনি আনন্দধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার কম সৌভাগ্যের কথা নহে। "ডি, এল, রায়ের" হাসির গান ও কবিতা না জানে বাঙ্গলাদেশে এমন লোক কমই আছে। শিক্ষিত ব্যক্তির ত কথাই নাই, হাটে মাঠে ঘাটে নিরক্ষর কৃষকদিগের মুখেও তাঁহার গান শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি। আর এইটীই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। যে কাব্য বা কবিতা, চিন্তা বা ভাব সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহা মূল্যবান্ হইলেও সাধারণের সম্পত্তি বলা যায় না। যাহা অশিক্ষিত জনগণের হৃদয়েও প্রবেশ করে সেই চিন্তা বা ভাবই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বসাধারণের বস্তু।

হাসির কবিতাকে 'রঙ্গাত্মক' ও 'বিদ্রূপাত্মক'—এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। রঙ্গাত্মক কবিতায় কেবল বিশুদ্ধ হাসি—সরল, প্রাণখোলা, নির্দ্দোষ উচ্চহাস্য। এ হাসি অকারণ, ইহা আনন্দের আতিশয্যের ফল। ইহাতে মনের মেঘ কাটিয়া যায়—প্রাণকে হাল্কা করিয়া দেয়। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক কবিতা ততটা অকারণ বা উদ্দেশ্য-হীন নহে। ইহা হাসির অন্তরালে তীব্র ভর্ৎসনা,—অনেক সময় হৃদয়ের গভীর বেদনা-ভরা অশ্রু। ইহা লোকসমাজকে হাসায় বটে—কিন্তু তাহার ব্যাধির প্রতিকারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার মিষ্ট কষাঘাতে একদিকে যেমন আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি না—অন্যদিকে তেমনই আমাদের হৃদয়ে আবার রক্তের রেখা পড়িয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির বাজারে এই দুই প্রকারের জিনিষই আছে। "পারো যদি জন্মো না কেউ বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলা," "বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাক্‌তো," "হ'তে পার্‌তেম্ আমি কিন্তু মস্ত একটা বীর" "তান্‌সেনের গান", "চাষার প্রেম" প্রভৃতি এই শ্রেণীর রঙ্গাত্মক কবিতা। "বিরহে'র অধিকাংশই এই শ্রেণীর। এই সকল গান ও কবিতায়, নির্দ্দোষ অকারণ উচ্চহাস্য ছাড়া আর কিছুই নাই। "আমরা বিলাতফেরত ক'ভাই", "We are reformed Hindus," "একদিন নন্দলাল করিল ভীষণ একটা পণ," "এমন অবস্থাতে পণে সবারই মত বদলায়", "প্রায়শ্চিত্ত," "ত্র্যহস্পর্শ" প্রভৃতি গান ও প্রহসন বিদ্রূপাত্মক শ্রেণীর। ইহাদের তীব্র কষাঘাতে যে বাঙ্গলার অনেক গাধা মানুষ হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ "আষাঢ়ে" নামক হাস্যকাব্যেও এইরূপ দুইশ্রেণীর কবিতাই আছে। "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা", "নসীরাম পালের বক্তৃতা" প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

কিন্তু হাস্যরস-রচনায় অদ্বিতীয় হইলেও দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষমতা এইখানেই সীমাবদ্ধ

থাকে নাই। তিনি সুপ্রসিদ্ধ নাটককারও ছিলেন। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী নাট্যকার বাঙ্গলায় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। বাঙ্গলার নাট্য-সাহিত্য একেই নিতান্ত দরিদ্র। দ্বিজেন্দ্রলালের মত কৃতী ব্যক্তির অভাবে তাহার যে সমূহ ক্ষতি হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এমন এক সময় ছিল যে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের ২।১ থানি নাটক ছাড়া—বাঙ্গলায় উন্নত বিশুদ্ধরুচির নাটক ছিল না বলিলেই হয়। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ এমন কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার রসপ্রবাহ এমন পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, ভদ্রব্যক্তিরা সেখানে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। তাহাতে সামাজিক শিক্ষার পরিবর্ত্তে, তাহার রীতিনীতি দূষিত করিয়া অধঃপতনের পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিতেছিল। এখনও যে এই অধঃপতনের স্রোত একেবারে কমিয়াছে এমন কথা বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের এই হাওয়া যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নাট্য যে অতি উচ্চশিল্প, তাহা তাঁহার রচনায় আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। উন্নত ও বিশুদ্ধ রুচির বহু নাটক রচনা করিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চকে ভদ্রলোকের উপভোগের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাঁহারা বাঙ্গলা 'থিয়েটারে' যাইতে ঘৃণাবোধ করিতেন, এমন অনেক ব্যক্তিও ডি এল, রায়ের নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, জানি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কোন কথা বলা, এই ক্ষুদ্র পবন্ধে অসম্ভব। তবে এ কথা বলিতে পারি যে তাঁহার অনেক নাটকই বাঙ্গলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার নাটকগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক। "পাষাণী" ও "সীতা" এই দুইখানি পৌরাণিক। ইহাদিগকে নাট্যকাব্য বলিলেই ভাল হয়। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'রাণা-প্রতাপ', 'দুর্গাদাস,' 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' এই গুলিই প্রধান। 'রাণাপ্রতাপ' বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। ইহা হৃদয়ে তাড়িত সঞ্চার করিয়া দেয়—হতাশের প্রাণে বল আনয়ন করে। 'দুর্গাদাস' ও 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্র-লালের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। 'দুর্গাদাসে' তিনি এমন একটী বীর চরিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বাঙ্গলা সাহিত্যে দুর্ল্লভ। 'সাজাহান'কে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়াও আমাদের তৃপ্তি হয় না। জগতের সমক্ষে দেখাইবার মত বাঙ্গলা সাহিত্যের যে দুই একটী বস্তু আছে, তাহার মধ্যে এই একটী।

'পরপারে' দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র সামাজিক নাটক—আর ইহাই তাঁহার জীবিত কালে প্রকাশিত শেষ নাটক। এখন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বর্গগত। তাই এই নাটকের নামের সঙ্গে বাঙ্গালীর মনে চিরকাল একটা করুণস্মৃতি জড়িত হইয়া থাকিবে। এই নাটকে 'পরপারে'র ইঙ্গিত করিয়াই তিনি সেই পথে বিদায় লইলেন। এপারের দিন যে শেষ হইয়া আসিয়াছিল তিনি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? এই করুণ বিয়োগান্ত নাটকে তিনি মাতৃভক্তি-হীনতা ও রূপলালসার যে কুফল অঙ্কিত করিয়াছেন,

তাহাতে নিশ্চয়ই বঙ্গসমাজের অনেক উপকার হইবে।

'গীতিকাব্য' ও 'সঙ্গীত' রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত আমার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে কবিতা ও গান রচনা দ্বিজেন্দ্রলালের অবসর কাটাইবার উপায়স্বরূপ ছিল। তাঁহার গীতিকাব্য 'মন্দ্রে'র নাম অনেকেই জানেন। এই "বঙ্গ-দর্শন' পত্রেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই 'মন্দ্রে'র কবিতার নূতন ভঙ্গী, ছন্দের লীলাময়ী গতি বঙ্গসাহিত্যে অভিনব জিনিষ। দ্বিজেন্দ্র-লালের হাসির গানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীতও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ন্যায়ই বাঙ্গলার লোক ভালবাসে। 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি', 'সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে জয় গৌরব জিনি", প্রভৃতি গান বাঙ্গলার ঘরে ঘরে গীত হয়। আমার ত মনে হয় এগুলি 'Inspired' বা কবির মনে দৈবানুপ্রেরিত। নহিলে এত শক্তি গানে আসিতে পারে না। আর কিছু না লিখিলেও শুধু এই কয়েকটী গানেই তিনি বাঙ্গলা দেশে অমর হইয়া থাকিতেন।

কবিহিসাবে বাঙ্গলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়—তাঁহার কবিত্ব কত উচ্চ শ্রেণীর, তাহা বলিবার স্থান এ নহে। এই মাত্র বলিতে পারি যে, বাঙ্গলায় দ্বিজেন্দ্র-লালের পুরুষোচিত ভৈরব রব আমাদের বড় ভাল লাগিত। মিহি ও মেয়েলী সুর, অসুস্থ রুগ্ন মনেরই লক্ষণ; সবল, সুস্থ মন হইতেই পুরুষোচিত কবিত্ব জন্মে। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টান্তে বাঙ্গলার কাব্য-জগৎ হইতে এই 'মানসিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা' যত দূর হয় ততই ভাল। আর একটী অমূল্য খাঁটী জিনিষ আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট পাই; তাহা স্বদেশপ্রেম, তাঁহার প্রতি গ্রন্থের পত্রে পত্রে, প্রতি কবিতা ও গানের ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার হৃদয় বোধ হয় স্বদেশপ্রেমেই ভরা ছিল। তাই, কি রঙ্গরসে, কি করুণ ক্রন্দনে, কি বীরত্বের উত্তেজনায়—কোন স্থলেই তিনি স্বদেশকে ভুলিতে পারেন নাই। এমন মাতৃভক্ত সন্তান হারাইয়া বঙ্গভূমি আজ সত্যই রত্নহীনা হইলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের যাইবার বয়স মোটেই হয় নাই। তাঁহাকে আমরা অকালেই হারাইয়াছি, যে সময়ে তাঁহার প্রতিভার কেবল মধ্যাহ্ন সূর্য্য;—যে সময়ে তাঁহার নিকট আমরা আরো অনেক উৎকৃষ্ট জিনিষের আশা করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়েই তিনি যে চলিয়া গেলেন, ইহা বাঙ্গলার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আধুনিক কালে বাঙ্গলায় অনেক কৃতী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির অকাল-মৃত্যু হইয়াছে। সে কালেও বঙ্কিম-চন্দ্র, দীনবন্ধু মধুসূদন, কৃষ্ণদাস পাল, কেশব-চন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষি-গণেরও অপেক্ষাকৃত এইরূপ অল্প বয়সেই মৃত্যু হইয়াছিল। যে সময়ে তাঁহাদের জীবনের অর্জ্জিত বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশের ও সমাজের উপকার হইবে, ঠিক সেই সময়েই যে তাঁহাদের অভাব হইয়াছে, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। সমাজতত্ত্ব-বিদেরা বলেন যে, যে দেশে প্রতিভাশালী ও

উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের অভাব হয়, সেই দেশই ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে জানিতে হইবে। আমাদের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অকাল-মৃত্যু যে আশাপ্রদ নয় তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। শিক্ষার কুব্যবস্থা, সামাজিক কুপ্রথা, মানসিক অশান্তি অথবা অন্য কি যে ইহার কারণ তাহা কে বলিবে? এই কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদের মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তাহার নিবারণের পথ নির্দ্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে। নহিলে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

চরিত-চিত্র

অশ্বিনীকুমার

(২)

কৈশোরে অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; এমন কি এক সময়, বুঝি বা তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন বলিয়া, অনেকের ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু সে সমাজের আধ্যাত্মিক এবং হেতুবাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও, তৎকালীন সে সামাজিক বিপ্লবে যোগদান করিবার মত তাঁহার সাহস ছিল না। তাই পিতৃ-আদেশে, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, নিতান্ত ভালমানুষটির মত, আপন সমাজের রীত্যনুযায়ী খাঁটি হিন্দু ধরণে বিবাহ করেন। আমি যতদূর জানি, অশ্বিনীকুমার সে অবধি এ পর্য্যন্ত সমাজের অননুমোদিত কোন কার্য্যই করেন নাই। আসল কথা, যে উপাদানে বিদ্রোহি-চরিত্র গঠিত হয়, তাঁহার চরিত্রে সে সকল উপাদান বর্ত্তমান নাই। তাঁহার শত্রুরা বলিয়া থাকে যে, সাধারণ প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; বন্ধুরা বলেন, বিবেকবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়াই তিনি সমাজের বিরুদ্ধে হাত তুলিতে চান না।

কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, এবং স্বকীয় চরিত্রগঠনের জন্য যে অনুশাসন তিনি এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন—তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। ইংরাজী শিক্ষার ফলে, তাঁহার সমসাময়িক যুবকবৃন্দের ন্যায়, গত শতাব্দীর য়ুরোপীয় হেতুবাদের প্রভাব তাঁহার চিত্তে কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছিল, এবং আপনাপন বিচার-বুদ্ধিকেই সদসদের পরিমাপক বলিয়া তিনি এক সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাটা আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের আপনাপন বিচারবুদ্ধি বা বিবেক, সামাজিক বিচারবুদ্ধি এবং সামাজিক বিবেকসাপেক্ষ এবং তাহাদের প্রভাবধর্ম্মী। আমাদের চিন্তাগত বিশ্বাস এবং নৈতিক সংস্কার, আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার সূত্র এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের ফলপ্রসূত। ইহা আমরা স্পষ্ট

বুঝি বা না বুঝি, ইহাকে অস্বীকার করিবার যো নাই। বিভিন্ন জাতির দেহ-মন একই শারীরিক ও মানসিক নিয়মে গঠিত হইলেও, পরস্পরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক জাতির চিন্তা ও ভাব অপর জাতির চিন্তা ও ভাবের সহিত সম্পূর্ণ মিল খায় না। আমাদের যা বিশ্বাস অপর কোন জাতির ঠিক সে বিশ্বাস নয়, আমরা যা ভাবি তারা তা ভাবে না, আমাদের কাছে যেটা সত্য তাহাদের কাছে হয়ত সেটা মিথ্যার রূপান্তর মাত্র। এই জন্যই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্রের উদ্ভব, এবং এমন কি একই দেশে বিভিন্ন চিন্তাশীলের মধ্যেও মতবৈষম্য ঘটে। নৈতিক আচার-ব্যবহারেরও প্রভেদ দেখা যায়—এক সম্প্রদায়ে যাহা নীতি, অপর সম্প্রদায়ে তাহা দুর্নীতি। জগতে নৈতিক আদর্শের একত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অতএব ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের বিচার এবং বিবেক বিষয়ে যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা আমরা বলিয়া থাকি, সেটা বস্তুতঃ সমাজেরই প্রভাবধর্ম্মী; নৈতিক বিষয়েও তাই। ইহারই বলে, গত দুই শতাব্দীর ব্যক্তিগত হেতুবাদ (individualistic Rationalism) কতক খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক তত্ত্বজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধ হইতেছে। অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের এই দীনতাটুকু সহজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রাজা রামমোহন রায়ের পর হইতে ব্রাহ্মসমাজ যে ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, সেটা তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচার (philosophical anarchism) ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম হইতেই একটা নিজের creed খাড়া করিয়া ব্যক্তিগত-স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতাকেই বড় করিতে চাহিয়াছে,—কিন্তু সেটা যতটা গায়ের জোরে ততটা যুক্তিবাদের অনুসরণে নয়। সমাজ-সমষ্টির মত-সমবায় লইয়াই তাহার ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সমাজের অধিকাংশ লোক যেটা মানিয়া চলে সেইটাকেই সমাজ বড় বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। রস্কিন্ বলেন—"দশটা নির্ব্বোধ থেকে কখনও একটা জ্ঞানীর উদ্ভব হয় না।" কিন্তু ব্যক্তিগত হেতুবাদের এই creed যখন ধর্ম্মবিশেষে রূপান্তরিত হইয়া, বিধি অনুশাসন এবং নৈয়মিক ক্রিয়া-সংস্কারাদির সৃষ্টি করে, তখন তাহা হইতে ইহাই মাত্র প্রমাণিত হয় যে, দশজন মূর্খ—যেহেতু তাহারা দশজন, আট জন নয়—ন' জন বুদ্ধিমানের অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিমান্! অশ্বিনীকুমার সময়ে এটুকু বুঝিয়া ধর্ম্মের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিচারানুমোদিত আরও গভীর ভিত্তির অনুসন্ধিৎসু হইয়াছিলেন। হিন্দুর গুরুবাদে তিনি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন, গুরুর প্রতি তাঁহার অবিচলিত অনুরাগ এবং গুরুর নিকট হইতে তিনি যে গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা (inspiration) লাভ করিয়াছেন, তাহারই ফলে তাঁহার চরিত্রের যত কিছু আপাতঃ অসঙ্গতি।

জাগতিক অপর তত্ত্বজ্ঞানসমূহের কাছে হিন্দুর গুরু বাদ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। ম্যাকসেল ও ম্যাককস্ প্রমুখ Intuitionist Schoolএর মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত খৃষ্টবাদ, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের ছায়া মাত্র। তাঁহাদের মতে, খৃষ্টের দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তি,-

এক ঐতিহাসিক খৃষ্ট, অপরটি জ্ঞানময় খৃষ্ট। প্রথমটি বিষয়াশ্রিত (objective), দ্বিতীয়টি অধিকরণনিষ্ঠ (subjective); দুই-ই এক পরমপিতার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। খৃষ্টীয়ান মতে,—জ্ঞানময় খৃষ্ট নিয়তই আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন, তাঁর প্রকাশ অখণ্ড অব্যাহত, তাঁহার পূর্ণতাও নাই, শেষও নাই, কিন্তু যিনি ঐতিহাসিক খৃষ্ট তিনি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জুডিয়া দেশে অনন্তকালের মত একবার মাত্র আবির্ভূত হইয়া, ক্যালভেরীতে (Calvery) ভগবানের কাছে সমগ্র মানবজাতির পাপের জন্য আপনাকে উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। হিন্দু গুরুবাদের সহিত তাহার প্রভেদ এই শেষটুকু লইয়াই। খৃষ্টানের জ্ঞানময় গুরুই হিন্দুর চৈত্য-গুরু; কিন্তু যিনি objective বা মহান্ত-গুরু—মানবের দেহের মধ্য দিয়াই যাঁহার প্রকাশ—তাঁহার আবির্ভাব একযুগে একবার মাত্র নয়। হিন্দু বুঝে যে মানবের সহজ জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং পরিপুষ্টির জন্য বাহ্যিক প্ররোচনার বিশেষ আবশ্যক; অথচ এই সহজজ্ঞান সকল মানবের পক্ষে সমান নহে, কাজেই তাহাদের বাহ্যিক প্ররোচনাও সকল ক্ষেত্রে সমান হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। একজনকে যে জিনিষ উদ্বোধিত করে, তাহা যে আর একজনকেও ঠিক সেই ভাবেই করিবে এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। অতএব, ঠিক দেখিতে গেলে, প্রত্যেক মানবের জন্য এক একটি ঐতিহাসিক খৃষ্টের আবশ্যক হইয়া পড়ে; অন্ততঃ প্রতি যুগে, প্রতি দেশে এবং সভ্যতানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে, একজন করিয়া ঐতিহাসিক অবতারের আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হয়, নহিলে তাহার কোন মূল্য থাকে না। হিন্দু ইহা বুঝিয়াই নানা অবতার-বাদ এবং গুরু-বাদ গ্রহণ করিয়াছে,—কিন্তু এই সকল বিভিন্ন বাদের মধ্যেও অখণ্ড অব্যয় একমাত্র মহাসত্ব যে একজন আছেন, সে কথা সে ভুলে নাই। গুরু এবং শিষ্যের যে সম্বন্ধ তাহা একটা দৃঢ়বদ্ধ পারস্পরিক সম্বন্ধ। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্রই তাহার কাছে গুরু আপনাকে প্রকাশিত করেন। গুরু ভগবানের অভিব্যক্তিস্বরূপ, সুতরাং সেটা কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক না হইয়া, রক্তমাংসময় মানব-দেহ লইয়া তাহার প্রকাশ থাকা আবশ্যক; বিশেষতঃ যাহারা দেহবিযুক্ত আত্মার কথা কল্পনা করিতে পারে না, এবং বহুদিনব্যাপী শারীরিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশাসন দ্বারা আত্মা ও দেহের পারস্পরিক বিভিন্নতা যাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে এটা বিশেষরূপই প্রয়োজনীয়। এইখানেই খৃষ্টীয় অবতারবাদ অপেক্ষা ইহা পূর্ণতর এবং অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ—কারণ ইহার মধ্যে অবিরুদ্ধ বা অসদৃশ কোন ভাবই নাই। ইহারই উপর অশ্বিনীকুমার আপন ধর্ম্মজীবনের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গুরুর সহিত এক হইবার আকাঙ্ক্ষাই অশ্বিনীকুমারের জীবনের লক্ষ্য—ইহারই জন্য তাঁহার জীবনের যা কিছু সংগ্রাম, তাঁহার চরিত্রের যা কিছু দুর্ব্বলতা। স্বভাবতঃই তিনি ভাবপ্রবণ, ভাবের বশে কোন কার্য্যে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া, পরক্ষণেই 'গুরু কি ভাবিবেন,' 'গুরু এ অবস্থায় কি করিতেন' ইত্যাদি ভাবিয়া দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া

ইতস্তত: করিতে থাকেন ; ফলে, সময়ে সময়ে তিনি দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। শিষ্য যে গুরু নয় সে কথা তিনি ভুলিয়া যান ; এবং তীব্র বিবেকানুভূতি লইয়া গুরুর কার্য্য এবং দায়িত্বের সহিত আপনার কার্য্যের পরিমাপ করিতে যান। হিন্দুর বেদপুরাণের শিক্ষা সে চরিত্রের মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত হইলেও, হিন্দুর সহজাত জ্ঞান বুদ্ধি লইয়াও, এ সব ক্ষেত্রে তাঁহাকে উচ্চদরের হিন্দু শিষ্য অপেক্ষা বরং একজন যথার্থ খৃষ্টীয় ভক্ত বলিয়াই মনে হয়। খৃষ্টভক্তের কাছে, খৃষ্টের প্রায়শ্চিত্ত এবং আত্মাহুতি বাহিক ধর্ম্মবিশেষ এবং অনুষ্ঠান মাত্র নয়, তাহা আধ্যাত্মিক পরিজ্ঞানেরই স্ফুট বিকাশ ; তিনি প্রভুর পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া পাপ বা পুণ্য কিছুরই ভাবনা ভাবেন না,—তাঁহার মনের মধ্যে দৃঢ় ধারণা থাকে যে তাঁহার জ্ঞানজ বা অজ্ঞানকৃত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ যীশুর রক্তে ক্ষালিত হইয়া গিয়াছে ও যাইবে। যথার্থ হিন্দু-শিষ্যও আপন গুরুকে সেই চক্ষে দেখে। তাহার আদর্শ বাক্যই হইতেছে—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

অশ্বিনীকুমারকে বুঝিতে হইলে তাঁহার গুরুর চরিত্রও বুঝা আবশ্যক। স্বভাবের শিশুর ন্যায়ই সে চরিত্র—এই কোমল, পরক্ষণেই প্রচণ্ড ; মুহূর্ত্তে হাস্যস্নিগ্ধ, মুহূর্ত্তেই আবার অশ্রুপ্লুত ; মুহূর্ত্তে আশাদীপ্ত, পরমুহূর্ত্তে আবার নিরাশদিগ্ধ ; এই সাধারণ নিন্দিত সর্ব্বাপেক্ষা দূষণীয় কার্য্যের সমাদর-রত, এই আবার সামান্য ত্রুটীর প্রতি খড়্গহস্ত ; এই কালাপাহাড়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, এই আবার প্রচলিত রীতি-নীতির বাধ্যতম সাধক এবং পরিপোষক। কিন্তু Universal যিনি তিনি অসংখ্য ভাবের সমষ্টিমাত্র, ভগবান্ পরস্পরবিরুদ্ধ অনন্ত ভাব-সংঘাতের লীলাভূমি। ভাগবত শক্তির লীলাক্ষেত্র মানববিশেষের চরিত্রে এ বিরোধ দোষের নহে, বরং স্বাভাবিক ; এই সকল নানা বিরোধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সেই এক অনন্ত মহাপুরুষের সহিত তিনি আপনার সংযোগ স্থির রাখেন। নীতি-শাস্ত্রের মাপকাঠী দ্বারা এ সকল লোকের কার্য্যের বিচার করা চলে না ; সাধারণ নীতির আইন বন্ধনে তাঁহারা বাঁধা পড়েন না, তাঁহারাই সে সব আইনের সৃষ্টিকর্ত্তা। সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সাধারণ কার্য্যপরম্পরার বিচার করিয়া থাকি, কাজেই পদে পদে আমাদের ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় ; তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ, বিশ্বকার্য্য-কারণ-পারম্পর্য্যের সহিত তাঁহাদের কোথায় এবং কিসে সামঞ্জস্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁহারা অনন্তের মধ্যে আপনাদের সান্তত্বকে ডুবাইয়া দিয়া, একটা universal stand-point হইতে সে সকল দেখেন এবং বিশ্ব জগতের সৃষ্টি-নিয়মের কোন্ উদ্দেশ্য তাহারা সাধন করিতেছে তাহা বুঝিয়া তাহাদের বিচার করেন। গুরুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, আমিত্বকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, যে ভাবে তিনি চালান সেই ভাবে চলিয়া, ভাবে চিন্তায় এবং জীবনের বাহিক ঘটনাচক্রের ফলস্বরূপ আমাদের দৈহিক

মানসিক প্রবৃত্তি বিষয়ে নিতান্ত সহজ ভাবে তাঁহাদের শক্তি এবং প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, আমরা চলিতে পারি। তাহা অনধিকার-চর্চ্চা নহে, সেই টুকুই শিষ্যত্বের বিশেষাধিকার। কিন্তু যতদিন না আমরা সম্পূর্ণরূপে সে চরিত্রের অনুযায়ী আপনাপন চরিত্র গঠন করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত হুবহু তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদের মত সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ধৃষ্টতা। এবং সেই চেষ্টার ফলেই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের দুর্ব্বলতা।

বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র খৃষ্টীয় ও হিন্দু তত্ত্ববাদের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ। আমাদেরও সকলেরই কম বেশ তাই। তাঁহার নম্রতা, স্থৈর্য্য, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব, কর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তের পরিবর্ত্তে শান্ত প্রাকৃত কার্য্যাবলীর প্রতি অনুরাগ, প্রচলিত রীতিনীতির অসামঞ্জস্য দেখিয়াও তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ন্যায় অপেক্ষা কর্ত্তব্যের প্রতি অধিকতর আসক্তি, বিরোধ অপেক্ষা বশ্যতা-স্বীকারের ইচ্ছা, বিদ্রোহের পরিবর্ত্তে তিতিক্ষার ভাব,—এ সকলই হিন্দুর অন্তরতম ভাব; অশ্বিনীকুমারে ইহা অতি সুন্দর রূপেই ফুটিয়াছে। অপর পক্ষে,—তাঁহার সূক্ষ্ম নৈতিক জ্ঞান, সমাজ-সংস্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের ইচ্ছা—এ সকল পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চরিত্রগত ভাব; অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে এ সকলেরও পূর্ণ বিকাশ রহিয়াছে।

অশ্বিনীকুমার নূতন ভাবের ভাবুক (Original thinker) নহেন, কোন একটা পদ্ধতি (System) গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই; সেই জন্যই এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার চরিত্রের এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের একটা যুক্তিযুক্ত অন্বয় করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের দিক্ দিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত প্রাচ্যকে দেখেন নাই, বা প্রাচ্যের দৃষ্টি দিয়া পাশ্চাত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের বিশিষ্ট প্রভাব তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যামন্দিরে, যুবকবৃন্দের শিক্ষাগুরুরূপে সংযম এবং পবিত্রতার প্রচারকরূপে, শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্বাধিকাররক্ষিরূপে তাঁহার চরিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাবের নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। অপরপক্ষে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধু কতিপয়ের কাছে, ভগবানের নামসংকীর্ত্তনে, ভাগবতাবৃত্তিতে, এবং ভক্তিযোগ বা কর্ম্ম যোগের ব্যাখ্যানে—তাঁর চরিত্রে প্রাচ্য ভাবটুকু ফুটিয়া উঠে। সে সব সময়ে বাস্তবিকই মনে হয় যে, আজীবন যে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার অন্তরে এ ভক্তির উচ্ছ্বাস, এ গোড়া হিন্দুত্বের ভাব কি সম্ভবপর?

এই খাঁটি হিন্দুত্বের ভাব লইয়াই আজ অশ্বিনীকুমার অনন্যসহজলভ্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবল মাত্র একজন শিক্ষাগুরু এবং আধুনিক জন-নায়ক হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত। যদিও সে হিসাবে তাঁর ভক্ত সংখ্যা কম নহে। পরন্তু, আমার বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গে—যশোহর হইতে সুদূর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত—তাঁহার প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার বরিশালস্থ কলেজে,

তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, গিয়া থাকে। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের এবং শিক্ষার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। তত্রাচ, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, অশিক্ষিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার প্রভাবই তাঁহাকে এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার হিন্দুত্বের ভাবই তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণব প্রভাব অধিকতর প্রকাশমান। বৈষ্ণব আদর্শে এমন একটা মানবিকতার ভাব আছে যাহা সম্পূর্ণ আধুনিকতাময়। মানবে নারায়ণের প্রতিষ্ঠা দর্শন করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাহার মত স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে মানবের ঈশ্বরত্বের কথা প্রচার করে নাই। মানবের দেহ এবং চিত্তবৃত্তিকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া, পিতা-পুত্র, প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধবী প্রভৃতির সম্বন্ধকে ভগবানের সৃষ্টি-পরম্পরার উদ্দেশ্যভূত লীলাবৈচিত্র্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া, বৈষ্ণব আদর্শ এবং অনুশীলনের বিশেষত্ব। মানবের এবং তাহার চিত্তবৃত্তির বিনাশে বা বিরোধে নহে, কিন্তু আত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে একটা চরম আধ্যাত্মিক আদর্শের ভাবে অনুপ্রাণিত করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এই ভাব অশ্বিনীকুমারের সামাজিক আচার ব্যবহারে বিশেষরূপেই পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমার হিন্দু সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধের পরিপোষক; কিন্তু কর্ত্তব্যের দায়ে তিনি সকল সংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া উঠেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও বক্তৃতা দেন নাই, কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্য এবং মানবের কল্যাণের জন্য অনেক স্থলেই তিনি জাতিভেদ প্রথার গ্রন্থি শিথিল করিয়াছেন। তাহার শিক্ষার ফলে, কলেরা বা অন্য মহামারীর প্রকোপের সময়, তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, উচ্চনীচ জাতি-নির্ব্বিচারে, পীড়িতের সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। হতভাগিনী পতিতারাও তাহাদের সে সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না। এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা, বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া, স্বহস্তে নীচজাতীয় রোগীর বিছানাদি, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত, পরিষ্কৃত করিতেছে; এমন কি সময়ে সময়ে, লোকাভাব ঘটিলে, অস্পৃশ্য চণ্ডালাদির মৃতদেহও আপন স্কন্ধে বহিয়া সৎকার করিয়া আসিয়াছে। দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরের সময়, হিন্দু ও মুসলমান দুঃস্থ ব্যক্তিগণ তুল্যভাবে অশ্বিনীকুমারের সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে। বহুবৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহচর বা কমিশনের বিশ্বস্ত বন্ধু নহেন; তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু দুর্দ্দিনের সহায়, এবং দুঃখে কষ্টে একান্ত সহানুভাবক প্রিয়জন বলিয়াই জানে। অগাধ অর্থ নহে, বাগ্মিত্বের অপূর্ব্ব স্ফুরণ নহে, জ্ঞানের চরম বিকাশও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায় ভাবে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। একমাত্র অশ্বিনীকুমারে আমরা এদেশে অধুনা তাহার কতকটা আভাস পাই। তত্রাচ, এ

ভাব এ দেশে নূতন নহে, ইহা বহু পুরাতন; হইয়া নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে—এই দেশকাল-পাত্রোচিতভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত মাত্র! *

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালা বন্ধু বিলাতের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এ'পারের পাখী ও'পারে যাইয়া কি গান গাহিবে? এই ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে যাইতে রাজী হন নাই। এ'পারের পাখীর কলকণ্ঠও যে ও'পারের বনস্থলীকে কাঁপাইয়া, নাচাইয়া তুলিতে পারে,—এখন রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এটা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। এ'পার ও'পার কেবল আমরাই মায়ার প্রভাবে নিজেদের মনের মাঝে গড়িয়া তুলি। বিশেষতঃ যে কেবলই ভাগ বাটোয়ারা করিতে বসে, সে সত্য কবি হয় না। কবি এ'পার ও'পার জানেন না; অপারের সুরই সাধিয়া থাকেন। কবি-প্রতিভা সান্তকে ধরিয়া পড়িয়া থাকে না, অনন্তেতেই প্রতিক্ষণে যাইয়া উঠে। তিনি যে ভাষাতেই আপনার মানসপট অঙ্কিত রঞ্জিত করুন না কেন, ভাব তাঁর সকল ভাষার বাঁধন ছাড়াইয়া যায়। দুনিয়ার ভাষা অনেক, কিন্তু রস এক। ধরণ অনেক কিন্তু ধারণ এক। একটা স্থান আছে, যেখানে সকল মানুষ এক হইয়া যায়। শীতোষ্ণাদি বোধ যেমন সকলেরই হয়, রোগ-শোক পরিতাপাদি যেমন সকলেই ভোগে, হাস্যোদ্ভূত করুণ রুদ্র শৃঙ্গারাদি রসও সেইরূপ সকলেই আস্বাদন ও সম্ভোগ করিয়া থাকে। আর এই রস-জগৎই কবির সত্য জগৎ। এই জগতের বরণ কিরণ গন্ধ লইয়াই কবি আপনার অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি সকল রচনা করেন। এ রসের রাজ্যে দেব মানবে ভেদ নাই; এখানে আবার এ'পার ও'পার কি? রবীন্দ্রনাথ এ'পারকে যেমন মাতাইতে ছিলেন, ও'পারকেও তেমনি মাতাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হই নাই; তবে যখন ডাকিয়াছিলাম তখন যে যান নাই, এখন দেখিতেছি তাহা ভালই হইয়াছিল।

সত্য বলিতে কি, গেলবছর যখন রবীন্দ্রনাথ বিলাতে যাইবার সংকল্প করেন, তখন সে কথাটা ভাল লাগে নাই, তাঁর নিজের

---

* গত বৈশাখের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অশ্বিনী বাবুর যে চরিত্র-চিত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অশ্বিনী বাবুর ধর্ম্মজীবনের দিক্ দিয়া কোন কথা বলেন নাই। পরে তাঁহার ইংরাজি মাসিক পত্র হিন্দু রিভিউয়ে সে চিত্র দিয়াছেন। অশ্বিনী বাবুর চরিত্র চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্ত বঙ্গদর্শনে সে চিত্র বাঙ্গলায় প্রকাশ করা হইল। বঃ সঃ।

ধর্ম্মজীবন ও অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে এ বিলাত-যাত্রা যে বড় ভাল হইয়াছে, এখনও এমনটা বুঝিতে পারি নাই ও পারিতেছি না। তবে, আমরা যে ভাল মন্দের কথা বলি, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, তাহা অনেক সময় অতি বাহিরের কথা। আমরা কার ভিতরকার খবর কি রাখি, কার অন্তঃপ্রকৃতির অবস্থা কিই বা জানি কার জন্য কখন কি ভাল আর কি মন্দ, তার কিই বা বুঝি আমরা নিজেদের ছোট্ট দাঁড়িপাল্লা লইয়া বিশাল বিশ্বটাকে ওজন করিতে যাই, বেঘত প্রমাণ সোজা ফুটক'লের টুকরা লইয়া সকল জটিল জীবনের ভালমন্দের কালি কষিতে চাই। কাজেই আমাদের ভাল মন্দের অনেক সময়েই কোনও সত্য অর্থ থাকে না। দুনিয়ার মালিক তো আমরা নই। যিনি মালিক তিনিই আমাদের সমুদায় বিচার আন্দাব, কলহ কোলাহলকে উপেক্ষা করিয়া তাঁর দুনিয়াকে আপনার নিয়তি-পথে নিত্য চালাইতেছেন। কিন্তু সে পথের আলোক চক্ষে পড়ে নাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের এই বিলাত-যাত্রাটা প্রথমে ভাল লাগে নাই।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অতি আদরের বস্তু। দেশের লোকে তাঁর নিকটে বিস্তর আশা করে। দেশের অশেষ কাজও পড়িয়া আছে। স্বদেশীর প্রথম কর্ম্মচেষ্টা নিস্কম রাষ্ট্রনীতির অনভ্যস্ত পথে যাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে সে পথ ছাড়িয়া সংযত সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত হইতেছিল। বাংলা সাহিত্যে যে রবীন্দ্রনাথের অনন্ত সাধারণ শক্তি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না, অস্বীকার করিতেও কেহ চাহে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথই সে সাহিত্য-সাম্রাজ্যকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন বাংলা সাহিত্যের একজন যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যরথী বলিয়া ধরা যায়, রবীন্দ্রনাথকেও অনেকটা সেইরূপই ধরিতে হয়। রবীন্দ্রনাথও বাংলা কাব্যে ও গদ্যে এক নূতন ভাব, এক নূতন আদর্শ, এক নূতন এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যুগ-প্রবর্ত্তক সাহিত্যিককে এমন সময় আপনার চিরাভ্যস্ত কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিয়া আমরা অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। তাঁর অভাবে আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনগুলি কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথের এ বিলাত-যাত্রা নিষ্ফল হয় নাই। এ'ও বিধাতারই এক অদ্ভুত চাল। তিনিই এ'পারের পক্ষীকে ও'পারে লইয়া গিয়াছেন। সকলে হয়ত ইহাতে ভগবানের হাত এখনও দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু বিলাত যাইয়াও রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশেরই সেবা করিতেছেন, তাঁর এই সদ্যোলব্ধ যশের দ্বারা, বিদেশীর সমাজে তাঁর এই নূতন প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা, যে আমাদের মুখই উজ্জ্বল করিতেছেন, আমাদের গৌরবই বাড়াইতেছেন, আমাদের দেশাত্মাভিমানকে ও স্বজাতি-চেতনাকে জাগাইয়া তুলিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় কি? এই দিক্ দিয়া স্বদেশের এমন সেবা এ পর্য্যন্ত আর কোনও বাঙ্গালী বা ভারতবাসী করেন নাই ও করিতে পারেন নাই।

রাজা রামমোহনের কাল অনেক দূরে

পড়িয়া গিয়াছে। তখনকার সময়ের বিলাতের কথাও প্রত্যক্ষ ভাবে জানি না, ভারতের কথাও চাক্ষুষভাবে জানি না। তিনি মোটের উপরে ইংরেজের নিকটে হিন্দুর প্রতিভা ও হিন্দুর শাস্ত্র ও সাধনার অনেকটা গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন, সত্য। কিন্তু এমন সময় আইসে নাই, রাজার উদার শিক্ষা গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকার ইংরাজ তখনও লাভ করে নাই। রাজার যুক্তির দিক্‌টাই তারা ধরিতে পারিয়াছিল। তাঁর প্রতিবাদের বা protest সেই কথঞ্চিৎ মর্ম্ম গ্রহণে তারা সমর্থ ছিল। কিন্তু তাঁর সম্যক্ দর্শন, তার সামঞ্জস্য বা Synthesis এর বিশ্বজনীন ঔদার্য্য তারা ধারণ করিতে পারে নাই তাই কেহ বা রাজাকে যুক্তিবাদী, কেহবা একেশ্বরবাদী বা ইউনিটারিয়ান্, অপর কেহ বা একরূপ খৃষ্টীয়ান্ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। রাজার সাধনার হিন্দু দিক্‌টা তারা আদৌ ধারণা করিতে পারে নাই। রাজার চরিত্রে তাঁর বিদ্যায়, তাঁর বুদ্ধিমত্তায়, তাঁর প্রতিই তারা অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাঁর স্বজাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয় নাই।

রাজার পরে কেশবচন্দ্র বিলাত যাইয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচারে বাঙালীর সাধনার বা ভারতের ধর্ম্মের প্রভাব বিলাতে বিস্তৃত হয় নাই। কেশবচন্দ্র সেখানে একরূপ খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদই প্রচার করেন। অন্যদিকে স্বদেশের, সমাজের ও ধর্ম্মের অনেক দোষের কথা বলিয়া স্বজাতিকে ইংরেজের চক্ষে যে একটু আধটু হেয় করেন নাই, এমনও বলা যায় না। কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে নিজেই বড় হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন, সেখানে স্বদেশ ও স্বজাতিকে বাড়াইয়া দিয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁর পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-প্রচারকেরাও তাহাই করেন। এখনও অনেকে তাহাই করিতেছেন। ইংরেজের নিকট নিজেদের দেশের ভ্রম কুসংস্কারের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া, কার যে কি উপকার হয়, দেশের লোকে ইহা বোঝে না। অথচ অনেক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তাই বিলাতে ও আমেরিকায় যাইয়া সর্ব্বদাই নিজেদের নিন্দা কুৎসা প্রচার করিয়া আসেন।

কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের পরে বিবেকানন্দ বিলাত ও আমেরিকায় যাইয়া, একটা নূতন সুর জাগাইয়া তোলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্য ভাবে পশ্চিমের প্রাধান্য অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া, ভারতের সাধনাকে সভ্য জগতের আচার্য্যের আসনে বরণ করিয়া থাকেন। তাঁর পূর্ব্বে আমরা শিষ্য হইয়াই বিদেশে যাইতাম, তিনিই প্রথমে শিক্ষক হইয়া বিদেশীয়দিগের মাঝখানে দণ্ডায়মান হন। এতটা বুকের পাটা আর কারও হয় নাই। বিবেকানন্দ কত বড় কাজটা যে করিয়া গিয়াছেন, দেশের লোকে এখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই। এ জাতটা যদি কখনও আবার মাথা তুলিয়া জগতের মাঝখানে যাইয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে তিন জন বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সাধনা বলেই তার এই মহোচ্চপদলাভ হইবে। প্রথম—রাজা রামমোহন; দ্বিতীয়—বঙ্কিমচন্দ্র, আর তৃতীয়—বিবেকানন্দ। এই তিন মহাস্তম্ভের উপরে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আশা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ এই তিন জনার প্রভাব স্বদেশের উপরেই বেশী পড়িয়াছে। বিবেকানন্দ বিলাতে ও আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন বটে, এখনও তাঁর লোকেরা মার্কিণে মঠ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সেখানে অতি অল্প লোকেই তাঁর শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে বা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। বিবেকানন্দ সেখানে স্বদেশের একটা শ্রেষ্ঠ মত ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, ধর্ম্মের ও কর্ম্মের একটা অভিনব পন্থা প্রচার করিয়াছেন। এ পথে বিরোধ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথাই বাধিয়া উঠে। আর এই বিরোধের মধ্যে যিনিই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে যান না কেন, কিছুতেই তিনি সকলের বা অধিকাংশ লোকের চিত্তকে অধিকার করিতে পারেন না। সুতরাং বিলাত ও আমেরিকার শিক্ষিত সমাজও অকৈতবে বিবেকানন্দের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই। আর এই জন্যই বিবেকানন্দের তেজে, সাহসে, স্পর্দ্ধাতে, আমাদের আত্মচৈতন্যকে ও স্বদেশাভিমানকেই জাগাইয়া তুলিয়াছে; কিন্তু বিদেশীয় সমাজে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, এমন কি সমকক্ষতা পর্য্যন্তও প্রতিপন্ন বা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই।

এই কাজটী রবীন্দ্রনাথ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও বাঙালী বা ভারতবাসী ইহা করিতে পারিতেন না

একদিন ছিল যখন আমরা সভ্যতাভিমানী বিদেশীয়দিগের নিন্দাস্তুতিতে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত হইয়া পড়িতাম। সে দিন আর নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই সে অবস্থা অনেকটা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। যাহারা আমাদের স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশাভিমান বাড়াইয়া দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। যাঁরা দেশের শিক্ষিত সমাজকে ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ করিয়া তুলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অগ্রণী দলভুক্ত। আর তিনি এ কাজটা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আজ বিদেশীয়দের নিকটে তিনি এতটা পরিমাণে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন দেখিয়া তাঁর স্বদেশবাসিগণ উল্লাসে একেবারে আত্মহারা হইয়া যায় নাই। অনেকেই কতকটা ঔদাসীন্য সহকারে তাঁর বিলাতী কীর্ত্তি-কাহিনী শ্রবণ বা পাঠ করিয়া থাকে। বিদেশীয়দের প্রশংসাপত্রের যে মূল্য বিশ, বিশ এমন কি দশ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল, স্বদেশীর কল্যাণে আজ আর তাহা নাই। এই ভাবে যারা রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান কর্ম্মচেষ্টার ওজন ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইবেন, তাঁরা তার ঠিক মাপ ও দাম কষিতে পারিবেন না। কথাটা এখানে প্রশংসার নয়, প্রভাবের। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের, শিক্ষার, সাধনার, প্রতিভার প্রশংসা কে কতটা করিতেছে বা না করিতেছে, ইহা অতি হেয় কথা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যা ছিলেন, তাহাই আছেন, বিলাতী সার্টিফিকেটে তাঁর প্রতিভার বা কাব্যের, শিক্ষার বা কার্য্যের মূল্য ও মর্য্যাদা এক রতিও বাড়িবে না। আর তাঁর "গীতাঞ্জলি" যদি ইংরেজের নিকটে হেয়ও হইত, তথাপি আমাদের চক্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌরবের এক কণাও কম হইত না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের স্তুতিতে বড়ও হইবেন না, ইংরেজের নিন্দাবাদে ছোটও হইবেন না। ইংরেজ যদি আজ তাঁর এমন প্রশংসা

না করিয়া নিন্দাই করিত—তাহা হইলেও আমরা হাসিতাম। কথাটাই তাহা নয়। কিন্তু তারা রবীন্দ্রনাথকে যে বুঝিতে পারিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির রস আস্বাদন যে করিতে পারিয়াছে ইহাই আসল কথা, এই কথাটাই আমাদের নিকটে সব চাইতে বড় কথা।

ইংরেজের রসনায় যখন এ রস মিষ্ট লাগিয়াছে, তখন রসটা অবশ্যই অ ত উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইল বলিয়া যে এই কথাটাকে এত বড় ভাবি তাহা নহে। এত দিনে আমরা দুনিয়ার মাঝখানে একটা কেউ কেটা হইলাম ভাবিয়া যে আনন্দে আট খানা হইয়া পড়িতেছি, তাহাও নহে। এত দিনে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের একটা রসের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিল, এই জন্যই এই কথাটাকে এতটা বড় ভাবিতেছি। এতাবৎকাল ইংরেজ তাদের নিজের যা কিছু ভাল তাহা আমাদের দিবার জন্যই ব্যস্ত ছিল। এরূপ দানে কোথাও কল্যাণ হয় না। ইহার ফলে কেবলই উত্তরোত্তর দাতার অভিমান ও অহমিকা এবং গ্রহীতার অপমান ও অসন্তোষই বাড়িয়া যায়। এরূপ দানে মানুষকে মানুষের কাছে লয় না, বরং আরো দূরেই ঠেলিয়া ফেলে। মানুষে মানুষে সত্য সম্বন্ধ গড়ে কেবল দানে নয়, কিন্তু যথাযথ আদানপ্রদানে। এতাবৎকাল ইংরেজের সঙ্গে আমাদের প্রাণের বস্তুর আদানপ্রদান হয় নাই। ইংরেজ এত দিন আমাদিগকে তার সভ্যতা, তার শিক্ষা, তার বিদ্যা, তার ধর্ম্ম—এ সকলই দিতে চাহিয়াছে, কখনও প্রাণ খুলিয়া, সত্যভাবে, আগ্রহ করিয়া, লোলুপ হইয়া, আমাদের ধান চাল ও ধন রত্ন ভিন্ন আর কোনও কিছু আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে চায় নাই। আমাদের চিন্তা বা ভাব, চরিত্র বা সদ্ধাস্থ,—আন্তরিক কোনও বস্তুর প্রতি তার কখনও লোভ জন্মায় নাই। আর এই লোভ যেখানে নাই, প্রাণের টানও সেখানে হয় না, সত্যিকার হৃদয়ের গ্রন্থি সেখানে বাঁধে না, মানুষে মানুষে সত্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সেখানে হয় না। অথচ যতদিন না এই মানুষী সম্বন্ধটা গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিন কিছুতেই ইংরেজের ভারতবর্ষে আসা সার্থক হইবে না ততদিন আধুনিক ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মূল লক্ষ্যটী সাধিত হইবে না রবীন্দ্রনাথই বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজের প্রাণে আমাদের সভ্যতার ও সাধনার ভাষার ও সাহিত্যের রস আস্বাদনের লোভটা জাগাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান প্রবাস-যজ্ঞের ইহাই সকলের চাইতে বড় কথা ও বড় ফল। আর রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মনের বর্ত্তমান অবস্থাতে, ইহাই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। কেবল তিনিই এ কর্ম্মের অধিকারী। আর কেউ নাই যিনি এ কাজটা করিতে পারিতেন বা করিতে পারেন।

কিছুকাল হইতে তাঁর আপনার দেশে ও আপনার সমাজে যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে কমিয়া যাইতেছিল, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব এবং অস্বীকার করা অনাবশ্যক। আমরা সকলেই এইজন্য মনে মনে ক্লেশ পাইতেছিলাম। কিছুকাল হইতে তিনি স্বদেশের প্রাণ-স্রোত হইতে যেন কতকটা সরিয়া পড়িতেছেন, এমনই মনে হইতেছিল। ইহাতে তাঁর নিজের অকল্যাণ ও দেশের

গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কায় আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াই উঠিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতাপুরুষ এমন অপূর্ব্ব চতুরতা সহকারে যে রবীন্দ্রনাথকে আর এক কাজের জন্য অগ্রে অগ্রে প্রস্তুত করিতেছিলেন, ইহা বুঝিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন রচনাদি পড়িয়া সময়ে সময়ে এমনও মনে হইয়াছে যে বুঝিবা তাঁর অন্তরের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাঁর জীবনের কাজ ফুরাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এসকলের ভিতরে বিধাতাপুরুষ যে গোপনে গোপনে এ'পারের পাখীকে ও'পারের সুর সাধাইতেছিলেন, ইহা বুঝি নাই ও ধরিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি তাহাই সত্য কথা।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে যাইয়া আজ যে কাজটা করিতেছেন, তারই জন্য তাঁহাকে স্বল্পবিস্তর পরিমাণে স্বদেশের সেই চিন্তাস্রোত ও প্রবলতার স্রোত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়া প্রয়োজন ছিল। এক সময়ে তিনি এই স্রোতের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদের প্রাণের উপরে সে সময়েই রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন স্বদেশের ও স্বজাতির প্রাণের সঙ্গে ও তাহাদের সনাতন সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্র প্রতিভার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, আজ আর তাহা নাই। তখন রবীন্দ্রনাথ বাংলার শিক্ষিত সমাজের চিন্তানায়ক ছিলেন। কিন্তু ক্রমে দেশের চিন্তার গতি তাঁহার চিন্তাস্রোতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। ইহাতেই তাঁর সঙ্গে দেশের অনেকের ক্রমে একটা মত-ভেদ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। তাঁর বিলাতযাত্রার কিছু পূর্ব্বে এই ভাবটা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। ইহাতে কেহ কেহ বিস্মিত, কেহ কেহ দুঃখিত ও ব্যথিত হইতেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি কিয়ৎ পরিমাণে ইহা হইতে ফিরিয়া না দাঁড়াইতেন, তবে আজ বিলাতে যাইয়া তিনি যে কাজটী করিতেছেন কিছুতেই তাহা পারিতেন না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী।

(উপন্যাস)

(২)

সদর রাস্তার উপরেই জেলখানা। জীন নিরুপায় হইয়া বাহিরের ঘণ্টার দড়িটা ধরিয়া টান দিল—আশা, যদি সেখানে কোন আশ্রয় মেলে!

সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট দ্বার খুলিয়া গেল।—"কে তুমি? কি চাও?"

"মশাই গো আজ রাত্রের মত এর মধ্যে আমাকে আশ্রয় দিতে পারেন?"

ভিতর হইতে উত্তর হইল—"এটা জেলখানা, সরাইখানা নয়। পুলিশের হাতে বন্দী হও, তখন অবশ্য তোমায় ঠাঁই দিব'—সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে জীন এক অপ্রশস্ত রাস্তায় আসিয়া পড়িল।—উভয় পার্শ্বেই পথের শোভাসম্বর্দ্ধনকারী উদ্যানসমূহ, কেবল মাত্র লতাপাতার বেড়া রাস্তা হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

এমনি এক উদ্যানে এক শ্বেত-অট্টালিকার অভ্যন্তরে একটি কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। জীন সেই দিকে ফিরিল। স্বচ্ছ সার্সির ভিতর দিয়া কক্ষের মধ্যস্থ সব জিনিষই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল—সুপ্রশস্ত চূর্ণকামকরা কক্ষ,—আসবাবের মধ্যে ছিটের মশারিযুক্ত বিছানা, একপাশে একটা দোল্না, খানকতক চেয়ার এবং দেওয়ালে ঠেসানো একটা দোনলা বন্দুক; মাঝখানে মোটা পরিষ্কার একখান চাদরে ঢাকা তৈরী খাবার; একটা পিতলের আলোকদানে আলো জ্বলিতেছে টেবিলের উপরে মদ্যপরিপূর্ণ টিনের পাত্রটা সে আলোতে ঝক্‌মক্ করিতেছে, পার্শ্বে অপর একটা পাত্রে গরম ঝোল হইতে ভাপ উঠিতেছে।

টেবিলের কাছে আনুমানিক চল্লিশবর্ষ বয়স্ক সরলাকৃতি একটি লোক কোলের উপর শিশুপুত্রকে নাচাইতেছিল, তাহার পার্শ্বে বসিয়া একটি যুবতী অপর এক শিশুকে স্তন্যদান করিতেছিলেন। ছেলেরা হাসিতেছিল, পিতাও হাসিতেছিলেন, জননীও মৃদুহাস্যে সে আনন্দে যোগদান করিতেছিলেন। জীন কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ হইয়া এই মধুর বাৎসল্য অভিনয় দেখিতে লাগিল। তাহার মনে কি ভাব উঠিতেছিল কি করিয়া বলিব? বুঝি বা সে ভাবিতেছিল,—এই আনন্দপূর্ণ গৃহে হয়ত অতিথির আশ্রয় মিলিতে পারে; যেখানে এত আনন্দ, সেখানে হয়ত একটু করুণার অভাব হইবে না!

উৎকণ্ঠা-পীড়িত জীন সার্সিতে মৃদু আঘাত করিল—কেহ শুনিতে পাইল না। দ্বিতীয়বার আঘাত পড়িল।

"দেখত বাইরে কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে না?"

"কই না।"

সাহসে নির্ভর করিয়া জীন তৃতীয়বার আঘাত করিল। সে শব্দ স্পষ্ট ভিতরে শ্রুত হইল—গৃহস্বামী টেবিলের উপর হইতে বাতিদানটা লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।—এইখানে গৃহস্বামীর একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না অর্দ্ধ মজুর—অর্দ্ধ কৃষকের মত তার চেহারা, তখন সে সবে কাজ হইতে ফিরিতেছে তাই তখনও সম্মুখভাগে একটা প্রকাণ্ড চামড়ার আস্তরণ তার কাঁধ পর্য্যন্ত আঁটা—তাহাতে একটা হাতুড়ি, একখানা লাল রুমাল, একটা বারুদের টিন – তা ছাড়া কোমরবন্ধে আরও কত কি জিনিষ ছিল। ডবল ভাঁজকরা কলারের মধ্য দিয়া তার খোলা এবং ধবধবে গলা দেখা যাইতেছিল। মোটা ভ্রূযুগ, কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর গুম্ফ, অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষুর্দ্বয় এবং উচ্চ চোয়াল তাহার আকৃতির বিশেষত্ব;—আপাতঃ দৃষ্টিতে লোকটিকে ধীর এবং অচঞ্চল বলিয়া বোধ হয়।

তাহাকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া জীন একটু থতমত খাইয়া বলিল—"মাপ কর্‌বেন মশায়। অর্থের বিনিময়ে কি আপনি আমাকে এক ডিস্ ঝোল, আর আপনার বাইরের ঘরের এক কোণে আজকার রাত্রিটার মত একটু স্থান দিতে পারেন?"

"কে তুমি?"

"আমি বিদেশী পথিক। পয়ন্তিয়াস থেকে সমস্তটা পথ আজ হেঁটে এসেছি। আমার টাকা আছে—যা বল্‌লাম, দিতে পারেন ?"

"কোন ভদ্রলোককে অর্থের বিনিময়ে আশ্রয় দিতে আমি অনিচ্ছুক নই।—কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সরাইখানায় গেলে না কেন ?"

"সেখানে জায়গা নেই।"

"জায়গা নেই! এ হতেই পারে না। বিশেষতঃ আজ হাটবার কি মেলার দিনও নয়—যে তেমন ভীড় হবে। তুমি ল্যাবাবদের ওখানে গিয়েছিলে ত ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তারা কি বল্লে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া জীন বলিল—"কেন জানি না, তারা আমাকে সেখানে থাকতে দিলে না।"

"ভাল, সকেট রাস্তায় কি নাম ভাল, তাদের ওখানে গিয়েছিলে ?"

জীন এ প্রশ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিল, ঢোক গিলিয়া বলিল—"তারাও জায়গা দিলে না।"

কৃষকের মুখে হঠাৎ সন্দেহের ছায়াপাত হইল,—সে জীনের আপাদমস্তক বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"তুমিই কি সেই লোক ?"—জীনের আগমনবার্ত্তা শাখা-পল্লবিত হইয়া ইতিমধ্যেই সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

স্বামীর সে শেষ প্রশ্ন শুনিয়া, যুবতী তাড়াতাড়ি শিশু পুত্র দুটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, স্বামীর পিছনে যাইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।—পার্শ্বের দেওয়াল হইতে চকিতের মধ্যে বন্দুকটি উঠাইয়া লইয়া, আর এক বার জীনের প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কৃষক হাঁকিল—"বেরোও—"

"দয়া করুন,—শুধু এক গ্লাস জল—

"ছিটে ভরা একটা গুলি"!—বলিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া কৃষক তাহাতে ডবল খিল লাগাইয়া দিল। মুহূর্ত্তপরেই জানালার ঝিলমিলিগুলাও বন্ধ হইয়া গেল,—বাহির হইতে লৌহ-অর্গল বন্ধ করার সে শব্দ জীনের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় যাইয়া পশিল।

রাত্রি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল—আল্‌স্ পর্ব্বতের হিমবায়ু শরীর কাঁপাইয়া দিতেছিল। বাগানের একপাশে একটা মৃৎকুটীর দেখিতে পাইয়া জীন অবশেষে সেই দিকে অগ্রসর হইল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তখন তাহার শরীর অবসন্ন, রাত্রিটা উপবাসে কাটাইতে হইলেও, বাহিরের দারুণ হিমের হস্ত হইতে এখানে সে তবু কতকটা পরিত্রাণ পাইতে পারে! রাস্তা মেরামতের সময় রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে যেমন ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর তৈরী হয়—এটাও অনেকটা সেই ধরণের, প্রবেশ-পথ অতি সঙ্কীর্ণ। হামাগুড়ি দিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল—ভিতরটা বেশ গরম, খড়ও যথেষ্ট ছিল।—এত কষ্টের পর আপাতঃ আরামের সম্ভাবনায় ভিতরে প্রবেশ করিয়া জীন হাত পা ছড়াইয়া দিল, তার পর পিঠের থলিটাকে উপাধান করিয়া শুইবার মতলবে ব্যাগটাকে খুলিতে আরম্ভ করিল। সহসা বহির্দ্দেশে একটা গুরু গম্ভীর শব্দ হইল। সর্ব্বনাশ! বাহিরে যে ভীষণ দর্শন একটা কুকুর! লোকটা কি তবে না

জানিয়া কুকুরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! তাড়াতাড়ি ছড়িটা তুলিয়া লইয়া, আত্মরক্ষার্থ থলিটাকে ঢালের মতন করিয়া, চকিতে সেস্থান হইতে সে সরিয়া পড়িল।—তাড়াতাড়িতে তার ছেঁড়া পোষাকটা আরও খানিক ছিঁড়িয়া গেল। পিছু হটিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুকুরটাকে দূরে দূরে রাখিয়া, অবশেষে, অতি কষ্টে বেড়া পার হইয়া পুনরায় সে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। সঙ্গি-হীন—গৃহ-হীন—আশ্রয়-বিহীন, তৃণ-শয্যা হইতেও বিতাড়িত হতভাগ্য জীন পাথপার্শ্বে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায়, আমি একটা কুকুরের সমানও নই! একটা কুকুরের যে আশ্রয় আছে, তাও আমার নাই!"

আবার সে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এবার সহর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে যাইয়া পড়িল—আশা, যদি কোন বৃক্ষতলে বা মাঠের মধ্যে কলকারখানায় কোন আশ্রয় মেলে!

অবনত মস্তকে কতক্ষণ সে এইভাবে চলিল। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হইলে সে একবার মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল।—চতুর্দ্দিকে জনশূন্য প্রান্তর ; সম্মুখে হ্রস্বকেশ-শিরোদেশের ন্যায় ক্ষুদ্র লতাগুল্মাদি মণ্ডিত এক পর্ব্বতখণ্ড ; তাহার গাত্র এবং সমস্ত আকাশ মণ্ডল ছাইয়া মেঘের জমাট বাঁধিতেছিল ; রজনীর অন্ধকার ক্রমশঃ দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিতেছিল।—তবু তখনো গোধূলির আলো সম্পূর্ণ মিলায় নাই, চন্দ্রও সবে উঠিতেছিল, উর্দ্ধে গগনগাত্রে জ্যোৎস্নাবিমণ্ডিত দু'একটি মেঘখণ্ড হইতে পৃথিবীর উপর একটা অস্পষ্ট আলোক প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িতেছিল। অন্ধকার দিক্‌চক্রবালে অসম পর্ব্বতখণ্ড একটা ক্ষীণ ছায়া রেখা টানিয়া দিতেছিল। সমস্ত প্রান্তরের মধ্যে কয়েক পদ মাত্র ব্যবধানে একটী মাত্র স্কন্ধহীন বৃক্ষকাণ্ড দাঁড়াইয়াছিল।

হৃদয় ও মনের যে সূক্ষ্মতম অনুভবশক্তি থাকিলে, মানুষ প্রকৃতির গূঢ় রহস্যটুকুর সন্ধান পাইতে পারে—জীনের তার কিছুই ছিল না ; তত্রাচ সেই আকাশ, সেই পর্ব্বত-খণ্ড, সেই প্রান্তর এবং পল্লবশূন্য নগ্ন বৃক্ষ-কাণ্ডে এমন একটা নিঃসঙ্গ এবং নিঃসহায় ভাব জাগিতেছিল যে, নিশ্চল ভাবে কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাড়াইয়া থাকিয়া, সহসা চকিত হইয়া সে বড় রাস্তার দিকে ফিরিল। সময়ে সময়ে প্রকৃতিকে শত্রুর ন্যায়ই ভীষণ বলিয়া মনে হয়।

ডি—সহরটি বহু পুরাতন, পূর্ব্বে প্রাকার-বেষ্টনী প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত হইলেও, ধর্ম্মবিপ্লবের পর হইতে তাহা অনেকটা জখম হইয়া গিয়াছিল। সেই ভগ্ন প্রাচীরের একাংশ দিয়া জীন সহরে পুনঃ প্রবেশ করিল।

তখন রাত্রি প্রায় ৮টা, পথঘাট তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ; অনুদ্দেশ ভাবে, সংশোধনাগার স্কুল প্রভৃতির পার্শ্ব দিয়া চলিতে চলিতে বড় গির্জ্জার সম্মুখে আসিয়া সে পড়িল, গির্জ্জার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিল।

গির্জ্জার বেষ্টনী-পথের একাংশে একটা ছাপাখানা ছিল—এই খানেই এল্‌বাদ্বীপ হইতে আনীত ও স্বয়ং সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জবানী হইতে লিখিত, সৈনিক সমূহের

প্রতি সম্রাট্‌ ও ইম্পিরিয়েল গার্ডের ঘোষণা-বলী প্রথম মুদ্রিত হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত জীন সেই ছাপাখানার সম্মুখে একটা পাথরের বেঞ্চে শুইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে জনৈক বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। জীনকে অন্ধকারে সেখানে শয়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়, এখানে আপনি এসময় শুয়ে কেন?

"দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে ঘুমাব বলে শুয়েছি?"—জীনের স্বর বিরক্তিপূর্ণ, কর্কশ।

স্ত্রীলোকটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া, তাহার অন্তঃ-করণটি করুণা ও মমতায় পূর্ণ ছিল। বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি? ঐ বেঞ্চের উপর?"

"ক্ষতি কি? উনিশ বছর ধরে কাঠের শয্যায় কাটিয়ে এসেছি, আজ না হয় পাথরের বেঞ্চেই শুলাম।"

"ওঃ, তুমি একজন সৈনিক ছিলে বুঝি?"

"আজ্ঞা, হাঁ।"

"আচ্ছা, সরাইখানায় গেলে না কেন?"

"কাছে পয়সা নেই বলে।"

"তাই ত, আমার কাছে যে মোটে চার ফ্রাঙ্কের বেশী এখন আর কিছু নেই।"

"আচ্ছা তাই না হয় দিন,"—বলিয়া জীন হাত পাতিল।

স্ত্রীলোকটি অর্থ দিয়া বলিলেন—"সামান্য এই পয়সা নিয়ে কোন সরাইখানায় অবশ্য তোমায় স্থান দেবে না। কিন্তু তা বলে ত তুমি এ ভাবে রাত্রি কাটাতে পার না। তোমাকে যে রকম ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত দেখ্‌ছি, তাতে অন্ততঃ করুণার খাতিরেও, তোমাকে বিনা খরচায় তাদের আশ্রয় দেওয়া উচিত। কোথাও চেষ্টা করে দেখেছ কি?"

"চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি!"

"কি হ'ল তাতে?"

"সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে।"

স্ত্রীলোকটী তাহার স্কন্ধে মৃদু করস্পর্শ করিয়া পথের অপর দিকে ধর্ম্মযাজকীয় প্রাসাদের পার্শ্বে একটি ছোট বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"সব বাড়ীতেই গিয়েছিলে?"

"হাঁ"

"ও বাড়ীটায় গিয়েছিলে কি?"

"না"

"তবে ওখানে গিয়ে দেখ দেখি।"

(৩)

মহিলাটি যে ক্ষুদ্র বাড়িটী জীনকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন—তাহা সে প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক চার্লস ফ্রান্সিস বিয়েভুঁ মিরিয়েলের আবাসবাটী।—এইখানে তাঁহার সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা না বলিলে এ আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; কারণ, প্রত্যক্ষভাবে ইহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, পরোক্ষভাবে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব ইহার মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ধর্ম্ম-যাজক মিরিয়েলের বয়ঃক্রম পঁচাত্তর বৎসর। সরল ধার্ম্মিক উদার তিনি সকলেরই চিত্ত জয় করিয়াছিলেন; দরিদ্র আর্ত্ত কখনও তাঁহার সহানুভূতির ফল হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগটা সম্বন্ধে লোক-পরম্পরা হইতে এইটুকু জানা যায় যে তিনি এইকস পার্লামেণ্টের অন্যতম এক সদস্যের পুত্র ছিলেন, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ হয় এবং ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের পাকে তদানীন্তন রাষ্ট্রনীতির পরিপোষকগণ যখন একে একে নির্য্যাতিত হইতে থাকেন তখন মিরিয়েল স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ইটালিতে যাত্রা করেন,—তাঁহার স্ত্রী বহুদিন হইতে শ্বাসরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, সেখানে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিপত্নীক অপুত্রক মিরিয়েলের জীবনের গতি অতঃপর কি ভাবে চালিত হইয়াছিল? পুরাতন ফরাসী-সমাজের পতন, নিজ বংশের ভাগ্যবিপর্য্যয়, রাষ্ট্রবিপ্লবের ভীষণ ঘটনাবলি হয়ত তাঁহার মনে একটা গভীর নির্জ্জনতা এবং বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিয়াছিল, এবং সাধারণ দুঃখবাধায় অচল অটল তাঁহার চিত্তে একটা গভীর রেখা টানিয়া দিয়াছিল।—যাই হউক, যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন লোকে দেখিল তাঁহার অঙ্গে ধর্ম্মযাজকের বেশ।

সহরে,—যেখানে যথার্থ চিন্তাশীলের অপেক্ষা বক্তা এবং পরচর্চ্চাকারীর সংখ্যা বেশী—সেখানে, কোন নূতন আসিলে যে অসু-বিধা ভোগ করিতে হয় ডি-তে আসিয়া মিরি-য়েলকে প্রথম প্রথম কতকটা সে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কিছু-কাল পরে নিষ্কর্ম্মা নিন্দকদের সে সব মিথ্যা রটনা ক্রমশঃ চাপা পড়িয়া গেল।

মিরিয়েলের পরিবারবর্গের মধ্যে কেবলমাত্র ভগ্নী ব্যাপ্তিস্তাইন ও বৃদ্ধা পরিচারিকা ম্যাগ-লোয়ার। ব্যাপ্তিস্তাইন ক্ষীণা দীর্ঘদেহা রুগ্না এবং নিতান্ত ভালমানুষগোছের স্ত্রীলোক;—মিরিয়েল অপেক্ষা তিনি প্রায় দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। সুন্দরী তিনি কখনো ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবন পুণ্যকার্য্যের সমষ্টিমাত্র ছিল—তাহাই তাঁহার জীবনে একটা শুভ্রতার আবরণ টানিয়া দিয়াছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ক্রমশঃ মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। যৌবনে যেটা ক্ষীণতা মাত্র ছিল, বার্দ্ধক্যে তাহাই স্বচ্ছতারূপে অনুমিত হইত এবং সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া তাঁর অন্তরের দেবী মূর্ত্তি খানি প্রকাশ পাইত। তাঁহার সে ক্ষীণ দেহ বুঝি জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে,—তাহা যেন প্রভাময় বিন্দুপরিমাণ জড় পদার্থ, পৃথিবীতে আত্মার অবস্থিতির একটা উপলক্ষ্যমাত্র। বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার ঠিক তাঁর বিপরীত—সুন্দরী, মোটাসোটা, কার্য্যক্ষমা এবং চঞ্চলা, সর্ব্বদাই হাঁপাইতেছে,—কতকটা পরিশ্রমের জন্য, কতকটা তার শ্বাসরোগের ফলে।

স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মিরিয়েল বাসের জন্য ধর্ম্মযাজকীয় প্রাসাদ পাইলেন। সে প্রাসাদ যথার্থই সার্থকনামা ছিল। ধর্ম্মযাজকীয় কক্ষ-সমূহ, অভ্যর্থনা কক্ষগুলি, শয্যাগৃহশ্রেণী, পুরাতন ফ্লোরেন্সের ফ্যাসনের ন্যায় খিলানযুক্ত সুবিস্তৃত দরবার হল, বৃক্ষশ্রেণী শোভিত তৎসংশ্লিষ্ট সুন্দর উদ্যান যথার্থই পরম রমণীয় ছিল।

প্রাসাদের পার্শ্বেই হাঁসপাতাল;—ছোট খাট-দ্বিতল বাটী, তাহার সহিত খানিকটা বাগানও ছিল। ডি—তে আসার তিন দিন পরে মিরিয়েল হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে গিয়া রোগীদের নানা অসুবিধা এবং স্থানাভাব লক্ষ্য করিয়া আসেন। ফলে, পরদিন হাঁস-

পাতাল প্রাসাদ স্থানান্তরিত হইল, এবং মিরিয়েল হাঁসপাতালের ক্ষুদ্র বাটীতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। বিস্মিত অধ্যক্ষের কোন আপত্তি টিকিল না। মিরিয়েল বলিলেন—"সে কি কথা? আপনার ছাব্বিশজন রোগীর জন্য ওই ছোট বাড়ী, আর আমাদের এই তিনটি প্রাণীর জন্য এত বড় একটা প্রাসাদ?—এমন একটা ভুলের প্রশ্রয় দেওয়া হতেই পাবে না।"

প্রধান ধর্ম্মযাজকের বৃত্তি হিসাবে বাৎসরিক যে ১৫,০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক তিনি পাইতেন ডি—তে আসিয়া তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যয়-তালিকা করিয়া ফেলিয়াছিলেন।—স্কুল, খৃষ্টীয় প্রচারসমিতি, কারাগার সমূহের সংস্কার সাধন, কয়েদীগণের সাহায্য ও উদ্ধার, দুঃস্থ শিক্ষকগণের বারতি বেতন, ঋণদায়ে কারাগ্রস্ত গৃহস্বামীদের মুক্তি, শস্য বিতরণ, দরিদ্র-বালকবালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা হিসাবে ও দরিদ্রের জন্য মোট ১৪০০০; এবং নিজের খরচপত্র হিসাবে অবশিষ্ট এক হাজার ফ্রাঙ্ক মাত্র।—বৃদ্ধা ব্যাপ্তিস্তাইন হাসিমুখে এ ব্যয় স্বীকার করিয়া লইলেন—কারণ, মিরিয়েল তাঁহার কাছে একাধারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ধর্ম্মগুরু, স্বভাবতঃ স্নেহের এবং ধর্ম্মতঃ তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্র; বিনাবিচারে তিনি ভ্রাতার সকল কথাই মানিয়া লইতেন।—বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার কিন্তু এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ডি—তে মিরিয়েল যতদিন ছিলেন, ততদিন এ ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

গাড়ী ঘোড়ার খরচ বলিয়া ডি-র ধর্ম্মযাজকের বার্ষিক ৩০০০ ফ্রাঙ্কের একটা পৃথক্ বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এর জন্য তাঁকে একটু লেখালেখি করিতে হয়;—ছিদ্রান্বেষীরা সে বিষয় লইয়া অনেক পরিহাস ও আন্দোলন করে। শেষে কিন্তু মিরিয়েলেরই জয় হইল। সে অর্থের সমস্তই তিনি অনাথভাণ্ডারাদিতে দান করিলেন, আপনার জন্য এক পয়সাও রাখিলেন না, বলিলেন—"গরীবরা ত খেয়ে বাঁচুক, আমার পা থাকলেই যথেষ্ট।"

গাড়ী ঘোড়া না রাখিলেও তাঁহার পরিদর্শন-কার্য্যে কোন দিন তিনি অবহেলা করেন নাই। কখনো পদব্রজে, কখনো ডুলিতে, কখনো গর্দ্দভপৃষ্ঠে যখন যাহাতে সুবিধা এবং ব্যয়সংক্ষেপ হইত তাহাতেই যাইতেন।

তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা মাধুর্য্য এবং মোহিনী শক্তি ছিল যে তাহা শ্রোতার অন্তস্তল পর্য্যন্ত যাইয়া স্পর্শ করিত। সাধারণতঃ তাঁহার টীকা-টিপ্পনীগুলি বেশ একটু গভীর এবং মর্ম্মস্পর্শী হইত। একবার তাঁহার দূরসম্পর্কীয়া এক ধনাঢ্যা আত্মীয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন, এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে নিজেই 'মূল গায়েন' হইয়া, তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে, উত্তরাধিকারসূত্রে নিকট বা দূর জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে কাহার কত অর্থলাভের সম্ভাবনা তাহারই বিশেষ আলোচনা করিতে থাকেন। বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া শুনিয়া বলিলেন—"দেখ, আমার মতে, যার কাছে উত্তরাধিকারিত্ব বলে কিছু নেই, সেই ভগবানের উপরই ভরসার যা কিছু সব থাকা উচিত।"

আর একবার কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, নিমন্ত্রণের চিঠিপত্রাদিতেও তাঁহার গুণগাথা এবং এমন কি তাঁহার আত্মীয়গণের পদবী পর্য্যন্ত ছাপা হয়। তাহা দেখিয়া মিরিয়েল বলেন—"মৃত্যুর পিঠটা খুবই চওড়

বল্‌তে হবে—দেখ দেখি কত পদবীর ভার সে হাসিমুখে বহন করে। ধন্য মানুষ, যে আপনার জাঁক প্রচারের জন্য কবরকে নিয়েও টানাটানি করে।"

দুঃস্থের সাহায্যের জন্য হাত প্যাতিয়া, কখনও কাহাকে তিনি 'না' বলিতে দেন নাই। একবার এক মার্কুয়িসের নিকটে তিনি সাহায্যপ্রার্থী হন। ভদ্রলোকটি কিছুতেই তাঁহাকে এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন—"মশায়, আমার নিজেরই এলাকায় কত দরিদ্র রয়েছে।" "বেশ ত, সে দরিদ্রদের ভারও আমার উপরেই দিন।" অবশেষে মার্কুয়িস চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু সাহায্য করিতে বাধ্য হন।

ঘটনা পারম্পর্য্য না দেখিয়া, ঝোঁকের মুখে কোন জিনিষেরই তিনি ভালমন্দ বিচার করিতেন না। তিনি বলিতেন—'মানুষের এই দেহ—তার বোঝা এবং প্রলোভন। সর্ব্বদা একে চোখে চোখে রাখতে হয়, নিতান্ত নিরুপায় না হলে এর বশ্যতা স্বীকার করতে নেই। সে বশ্যতা স্বীকার করাও হয়ত দোষের—কিন্তু সেটা তত মারাত্মক নয়; সেটা পতন বটে—কিন্তু রসাতলে নয়, তাতে মানুষকে কেবলমাত্র নতজানুই করে—তা থেকে পরিণামে তার ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সম্ভব। যথার্থ সাধু ২।৪ জনই হয়; কিন্তু ন্যায়পরায়ণ হওয়াটা তত শক্ত নয়। ভুল কর, সন্দেহ-দোলায়িত হও, পাপে পড়—তবু ন্যায়পরায়ণ থেকো।

"সর্ব্বাপেক্ষা কম পাপ করাই মানুষের ধর্ম্ম। একেবারে নিষ্পাপ জীবন যাপন করা একমাত্র দেবতাদের পক্ষেই সম্ভব। মর্ত্ত্য জীবন মাত্রেই পাপশঙ্কী, কারণ পাপ জিনিষটাই মাধ্যাকর্ষণধর্ম্মী।"

তাঁহার একথার উত্তরে যাহারা 'কি ভ্রান্তি!' 'কি দুর্ভাগ্য!' বলিয়া ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিত, তাহাদের উদ্দেশে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন—'পাপ মাত্রেই কি তবে এত ভয়ানক? অথচ এরা সবাই-ই ত পাপী। ভণ্ডামি জিনিসটা দেখ কেমন করে আপনাকে বাঁচাতে চায়—কেমন করে আপনাকে ঢেকে ফেল্‌বার চেষ্টা করে।"

স্ত্রীলোক এবং দরিদ্র—সমাজের উৎপীড়ন যাদের বিশেষ ভাবেই সহ্য করতে হয়—তাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার বিশেষ করুণ ও সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। তিনি বলিতেন—"দেখ, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা, ঝি চাকর, দুর্ব্বল, অজ্ঞ এবং ছুতার মজুরদের দোষ ততটা তাদের নয় যতটা তাদের স্বামী, বাপ মা, প্রভু, প্রবল, শিক্ষিত-সম্প্রদায় এবং ধনবানদের। অজ্ঞ যারা আছে, তাদের শিক্ষিত কর; এত যে পাপের অনুষ্ঠান এ কেবল সমাজের শিক্ষা নেই বলেই। যে জীবনে অনুশীলন আদৌ হয় নি, সে জীবন ত পাপের আকর হবেই। যে পাপ করে তারই উপর কেন সব দোষ চাপাও? অন্ধকার যে সৃষ্টি করে সেই সমাজই কি মূলতঃ এজন্য দায়ী নয়?"

একবার একটা লোক টাকা জাল করার অপরাধে ধৃত হয়। স্ত্রী পুত্রের অন্ন সংস্থানের কোন সুবিধা না করিতে পারিয়া, লোকটা অবশেষে এই উপায় অবলম্বন করে। যন্ত্রাদি তাহার কাছে কিছু পাওয়া যায় নাই—একমাত্র স্ত্রীর কথার উপরেই তাহার বিচারফল নির্ভর

করিতেছিল।. কিছুতেই যখন স্ত্রী তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিল না, তখন সরকারী পক্ষের উকীল এক চাল চালিলেন। জাল চিঠি পত্রাদি এবং অর্থপুষ্ট সাক্ষী সাবুদের দ্বারা তিনি স্ত্রীলোকটির কাছে সপ্রমাণ করিলেন যে তার স্বামী দুশ্চরিত্র এবং অন্য রমণীর প্রণয়াসক্ত। হিংসায় অভিমানে তখন স্ত্রী সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিল। সকলেই সরকারী উকীলের বুদ্ধির ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। সব শুনিয়া মিরিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ লোকটার কোথায় বিচার হবে?"

"সেসনে।"

"আর এই সরকারী উকীলের?—"

আর একবার তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন হতভাগ্যের মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে, তাহার মর্ত্ত্য-জীবনের শেষ কয়দণ্ডের জন্য তাহার কারাকক্ষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যান।—আজীবন সে হতভাগ্য ধর্ম্মের আলোক দেখে নাই—মৃত্যুর তীরে আসিয়া সম্মুখে অনন্তবিস্তৃত জমাট অন্ধকারই সে দেখিতেছিল এবং সেই রসাতলের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে বিশ্বাসের বর্ত্তিকা লইয়া আসিয়া মিরিয়েল তাহাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিলেন। প্রভাতে, যখন বালারুণ নিশার অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছিল, তখন সেই হতভাগ্যের সহিত বধ্যমঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর করুণ স্বরে মিরিয়েল বলিলেন—'মানুষ যাহাকে মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষেপ করে, ভগবানই তাকে নবজীবন দেন; সমাজ যাকে দূর করে দেয়, তিনিই তাকে কোলে তুলে নেন; তাঁর শরণাপন্ন হও, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ, নবজীবন পাইবে। ওই দেখ, বিশ্বপিতা তোমারই জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

এ ঘটনা কিন্তু মিরিয়েলের মনে একটা গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। অপরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার প্রতি আমরা যতই উদাসীন হই না কেন—মৃত্যুর পুরোহিত-স্বরূপ গিলটিন-যন্ত্র * দেখিয়া কেহই অচঞ্চল থাকিতে পারে না। সেটা যেন শুধু নির্জ্জীব কাষ্ঠ এবং শাণিত ছুরিকামাত্র নয়; সে যেন তার কাষ্ঠ ছুরিকা এবং যন্ত্র দিয়া সবই দেখে, জানে, শোনে, বোঝে;—যত জীবন সে এ পর্য্যন্ত হনন করিয়াছে, সেই সমস্ত প্রাণ লইয়া যেন সে অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে। এ ঘটনার পর হইতে মিরিয়েলের চিত্তের প্রশান্তি কতকটা লুপ্ত হইয়াছিল,—সমাজের বিচার, প্রেতের ন্যায় তাঁহার মনশ্চক্ষে জাগিতে থাকিত। এক একদিন আপন মনে তিনি বলিতেন—"মৃত্যুতে ভগবানেরই অধিকার। কোন্ অধিকারে মানুষ সে দুর্জ্ঞেয় জিনিসের উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়?"

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

---

* 'গিলটিন'—হনন যন্ত্র বিশেষ; ফাঁসির পরিবর্ত্তে ফ্রান্সে তখন গিলটিনেরই প্রচলন ছিল।

সোরাব রোস্তাম

ফেরুদের কাছে তবে এল যত যোধ মন্ত্রণায়,
জোয়াব া,গুডার্জ্জ, আর ফেরাবর্জ—যিনিপার্সীদের
দ্বিতীয় নায়ক আর খুল্লতাত নৃপতির। কয়জনে
একত্রে মিলিলা পরামর্শে। গুডার্জ্জ কহিলা তবে
"ফেরুদ্! এরণের আহ্বান স্বীকারি' লইতে হবে,
তা না হ'লে পাব বড লাজ। কিন্তু যোধ নাহি হেবি
যুঝিবে যে এ যুবার সনে—বন্য-কুরঙ্গের গতি
সিংহের হৃদয় আর রয়েছে ইহার। আসিয়াছে
রুস্তাম হেথায় কালিরাতে। ভারি ভারি মন তার
তাই সে একাকী আছে বহুদূরে শিবির পাতিয়া।
তারি কাছে যাব, আর তাতারের এ যুদ্ধ-আহ্বান
যুবকের নাম সনে তুলিব তাহার শ্রুতিমাঝে।
হয়ত ভুলিয়া ক্রোধ যুদ্ধযাত্রা করিবে রুস্তাম,
সবে মিলি ইতিমধ্যে লহ মানি' এই আবাহন।"
গুডার্জ্জ কহিলে কথা ফেরুদ্ দাঁড়ায়ে উচ্চে কয়
"বৃদ্ধবীর! যেমনি বলিছ তুমি তেমনই হোক্
সোরাব করুন সজ্জা—নির্বাচিয়া দিব মোরা যোধ।"
'কথা শেষ হ'লে তার পেরাণ উইজা এল ফিরি'
অশ্বারোহি-মধ্য দিয়া আপন শিবিরে। সমুৎসুক
পার্সী মধ্যে ছুটিয়া গুডার্জ্জ কিন্তু গেল অতিক্রমি'
পশ্চাৎ শিবির—ধীরে ধীরে উত্তরিল বালুচরে
রুস্তামের আবাস শিবিরে। হেরিলা রুস্তামে তথা,
প্রাতরাশ হইয়াছে শেষ কিন্তু তখনো তাহার
সম্মুখে রয়েছে খাদ্য আস্তরণে সাজানো যতনে।
সিদ্ধ মেষ-মাংস-খণ্ড, রুটি ও পিষ্টক, নানা ফল।
অন্যমনা আছে বসি' রুস্তাম তথায়; হাতে লয়ে
একটি পাখীরে খেলিছে তা'সনে। অগ্রসরি তথা
পুরোভাগে দাঁড়াল গুডার্জ্জ। রুস্তাম হেরিয়া তারে
মহানন্দে চিৎকারি' দাঁড়া'ল—পাখীটিরে দিলফেলি'
গুডার্জ্জের হাতধরি' দুই হাতে কহিল তাহারে

"আরে বন্ধু এস, এস – আজি বড় সুপ্রভাত মোর—
কিসংবাদ? আচ্ছা থাক্ ব'স খাও দাও আগে তুমি।"
গুডার্জ্জ শিবির দ্বারে দাঁড়াইয়া কহে—"এখন না,
পানাহার করিবার পাইব সময় এর পরে,
কিন্তু আজ নয়। আজ আসিয়াছি গুরুতর কাজে,
উভ সৈন্য বাহিরি' দাঁড়ায়ে আছে—দেখা যায়
পরস্পর। সুদূর তাতার হ'তে এসেছে আহ্বান
পারস্য প্রধান হ'তে যোদ্ধা এক নির্ব্বাচিত করি'
দিতে হবে যুদ্ধ তরে তাহাদের এক যোধ সনে।
নাম তুমি জান' তা'র—সোরাব বলিয়া ডাকে তারে,
কার-পুত্র কিন্তু কেহ নাহি জানে তাহা। হে রুস্তাম!
তোমারি সমান বুঝি এই যুবা মহাশক্তিধর,
কুরঙ্গ সমান গতি সিংহ সম হৃদয় তাহার।
যুবা সেইজন—আর ইরাণের যত যোধ, বৃদ্ধ
হইয়াছে—দুর্ব্বল সকলে তা'র কাছে। তাই বন্ধু
যত আঁখি তোমাপানে চাহে আজি একান্ত আশায়;
এস বাহিরিয়া আজি; যুদ্ধ কর—নহে মান যায়।"
গুডার্জ্জ কহিলে কথা উত্তরিলা হাসিয়া রুস্তাম—
"ইরাণের বীরগণে বুড়া যদি বল—তা' হ'লেত'
আরো বুড়া আমি। যুবা যদি হয় বলহীন, তবে
কায়খশ্রু নরপতি পড়েছেন মহাভ্রমে। নিজে
তিনি যুবা—তাই তাঁর কাছে যত যুবারি আদর
বুড়ারা কবরে গিয়ে লউক বিশ্রাম—এই মানি
তাঁ'র মত। রুস্তামের পরে তাঁ'র পূর্ব্বপ্রীতি নাই
যুবজনে এখন বিশেষ সমাদর। সোরাবের
আস্ফালন হেরি,' যুবাদল উঠিবে কোমর বাঁধি,
আমি নয়। বীরত্বের কীর্ত্তি তা'র গাহে জনে জনে
কিন্তু কহ কি তাহে আমার আসে যায়। যদি মোর
সেই অসহায় শিশু একমাত্র কন্যার বদলে
বীরপুত্র থাকিত অমনি—অমনই কীর্ত্তিশালী,

তাহ'লে তাহারে রণে পাঠাইয়া আমি সেই মোর তুষার ধবল ক্লেশ পিতা "জাল" সনে থাকিতাম ঘরে;—আফ্‌গান-দস্যুগণ উত্যক্ত করিছে তাঁরে, কাড়িয়া লইছে ভূমি—পশুপাল করিছে হরণ;— নিঃসহায় এ দশায় কেহ নাহি দেখিতে তাঁহারে। সেইখানে যাইতাম, রণসজ্জা রাখিতাম তুলি', শুধু মোর সুবিখ্যাত নাম দিয়া বৃদ্ধ পিতাটিরে গণ্ডী দিয়া রাখিতাম ঘেরি'। অর্জ্জন করে'ছি আমি ধনরাশি যত, করিতাম ব্যয়—আর শুনিতাম সোরাবের দিব্য যশোগাথা—আর এই অকুঞ্জ নৃপগণে মরণের মাঝখানে করিতাম ত্যাগ— তার পর এই হস্তে আর নাহি ধরিতাম অসি।" কহিয়া হাসিল বৃদ্ধ। গুডার্জ্জ উত্তরে কহে "লোকে কি বলিবে তবে হে রুস্তাম,এ কথা শুনিলে পরে— সোরাব ডাকিছে রণে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোধে ডাকিছে তোমারে বিশেষতঃ-আর তুমি(একান্ত সে তোমারেই চায়) মুখ লুকাইয়া র'বে গৃহ কোণে র'সি? অবস্থিত হও বন্ধু—লোকে নাহি বলে পাছে 'বুড়া কৃপণের মত রুস্তাম আপন কীর্ত্তিটিরে সযতনে সঙ্গোপনে রেখেছে লুকায়ে—নাহি চায় বিপন্ন করিতে তা'রে বুঝি যুবাসনে।" সে কথায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হ'য়ে গর্জ্জিল রুস্তাম—"হে গুডার্জ্জ হেন কথা কি হেতু কহিছ বল? মানি ইহা হ'তে প্রিয়তর বাক্য তুমি জান' না বদর! হোক্ বৃদ্ধ, হোক্ যুবা হোক্ বীর কিম্বা ভীরু—অল্প কীর্ত্তিশালী কিম্বা হুকীর্ত্তিশালী, হোক্ না যে কোনো যোধবীর আমা সনে তুলনা কাহার? তারা ত' মানুষ মাত্র, আমি না রুস্তাম? কিন্তু কহ শুনি কেন নগণ্যতরে বিপুলবীরত্ব গর্ব্ব প্রকাশিতে চায়? এস তবে দেখিবে রুস্তাম নিজকীর্ত্তি কি করিয়া সযতনে সঙ্গোপনে রেখেছে সঞ্চিত। কিন্তু কহিতেছি শুন "অজ্ঞাত যুঝিব আমি ধরিয়া সামান্য অস্ত্র হাতে। লোকে নাহি কহে যেন রুস্তামের কথা—যুঝিয়াছে মর্ত্ত্যের মানব সনে একা সেই দ্বৈরথ সমরে॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

৩

জগদীশ বাবুর ১৮৬৮ সালে নোয়াখালিতে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হওয়ার পর প্রথম বৎসরেই সে অঞ্চলের ডাকাতি ৭০।৭৫ হইতে যে দশ বারটীতে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার কার্য্য-কালের দ্বিতীয় বৎসরে আর ডাকাতির নামগন্ধও রহিল না। তৃতীয় বৎসরে জগদীশ বাবু কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট রিপোর্ট করিলেন "এখন এ জেলায় ডাকাতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নূতন ডাকাত-দলের সৃষ্টি না হইলে, এখানে ডাকাতি হওয়া অসম্ভব।" বিড্‌লেন বলিয়া এক কর্ম্মচারীর হস্তে ইনি চার্জ্জ দিয়া আসেন। ঐ সাহেব চট্টগ্রামে লর্ড ইউলিক ব্রাউন ডিভি-সনাল কমিসনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান এবং নোয়াখালি পুলিসের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, লর্ড ইউলিক ব্রাউন (যিনি সে দিন

মারকুইস অফ্ শ্লীপো হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন) বলিলেন "নোয়াখালির অবস্থা খট্ খট করিতেছে ; কথা হইতেছে, তুমি সে রকম রাখিতে পারিবে কি না"। একটা কথা পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি,—যখন ইং ১৮৬৬তে ভুটান লড়াই হয় তখন জগদীশনাথ রায়কে লড়ায়ের কোন কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করা হয়, রায় মহাশয়ও যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার যাওয়া হইল না, কি কারণে তাহা বলিতে পারি না। রায় মহাশয় সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সাহসের কথা ক্রমান্বয়ে বলিব নোয়াখালির দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব মাত্র। একদিন গভীর রাত্রে তিনি একখানা ভাড়াটিয়া শকটে আরোহণ করিয়া মফঃস্বল হইতে সদরে আসিতেছিলেন, সঙ্গে আর্দ্দালি কিম্বা অপর কোন কনেষ্টবল ছিল না ; একাকীই ছিলেন, সহসা গাড়ির গতি কে থামাইল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুই, কেন গাড়ি থামাইলি ?" উত্তর প্রদত্ত হইল, "আমি কয়েদ খালাসি ডাকাত, তোমাকে খুন করিব বলিয়া গাড়ি থামাইয়াছি।" জগদীশনাথ রায় অম্লান বদনে বলিলেন, "ব্যাটা, তুই বোধ হয়, খেতে পাসনি তাই এত লম্ফ ঝম্ফ করিতেছিস্, হাতের ছোরা খানা আমায় দে, আর গাড়োয়ানের কাছে গিয়া বোস।" ডাকাত দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল। তাহাকে সদরে লইয়া আসিয়া রায় মহাশয় আপনার আর্দ্দালির কনেষ্টবলীতে ভর্ত্তি করিলেন এবং সে আর্দ্দালি হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। আর একবার সংবাদ আসিল একটা মানুষ খুন হইয়া মাঠে পড়িয়া আছে। রায় মহাশয় অকুস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। লাসটি যে অবস্থায় ছিল তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইল যে মানুষটি সেখানে মারা পড়ে নাই, স্থানান্তর হইতে মৃত দেহ লইয়া গিয়া সেখানে ফেলা হইয়াছে। দেহটিতে সড়কির খোঁচা দাগও দৃষ্ট হইল। মনুষ্যের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, এক মাইল দূরে গ্রাম দৃষ্ট হইল, গ্রামের ভিতর একটা বাড়ীতে পোড়া মসাল, নূতন হুঁকা কলিকা প্রভৃতির চিহ্ন পাইয়া, রায় মহাশয় বুঝিলেন সম্ভবতঃ এই বাড়ীতেই পূর্ব্বরাত্রে ডাকাত পড়িয়াছিল, মৃত মানুষটি এই বাড়ীরই লোক ; খুব সবল ও হৃষ্ট পুষ্ট। ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিতে এই লোক মারা পড়িয়াছে। রায় মহাশয় যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাই সত্যে পরিণত হইল। বাড়ীতে "কে আছ" বলিয়া ডাক দেওয়া হইলে মৃত ব্যক্তির বাটী হইতে ছয়জন সুস্থকায় সবল লোক বাহির হইল তাহাদের দেখিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "তোরা ডাকাত তাড়াইয়াছিস্, সম্ভবতঃ দু'টা একটা খুনও হইয়াছে, আর মৃত লোকটির চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ তোদের ভাই, একে ডাকাতেরা মারিয়া গিয়াছে, কেমন, এ সব কথা সত্য নয় ?" ছয় ভাই গোপনে কি পরামর্শ করিল, এবং একজন বলিয়া উঠিল—"হাঁ, আমরা দু'টা ডাকাতকে মারিয়া ফেলিয়াছি, তোকেও মারিব, সাবধান।" জগদীশনাথ রায় তাহাদের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং এমন তীব্র দৃষ্টিতে উহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে তাহারা ভয় পাইল এবং বলিয়া উঠিল "দোহাই তোমার, আমাদের রক্ষা কর, আমরা সব

বলিতেছি এবং সমস্ত দেখাইয়া দিব।" তাহারা বলিল—"তোমার কথা সত্য, গতকল্য রাত্রে আমাদের বাটীতে ডাকাত পড়ে, আমরা বলিলাম, কি আমরা সাত ভাই থাকিতে আমাদের বাড়াতে ডাকাতি? দস্যুদের সড়কি ও বল্লম লইয়া আক্রমণ করিলাম, দুইজনকে বাঁধিয়া ফেলিলাম, যখন ডাকাতেরা প্রাণভয়ে পলাইল, যাইবার সময় আমাদের ভাইকে বল্লমের দুটা খোঁচা মারে, তাহাতে তার মৃত্যু হইল, ভাইকে লইয়া মাঠে ফেলিয়া আসিলাম, আর ডাকাতদের লাস দুটা, পাড়ার পুষ্করিণীর ভিতর গাড়িয়া রাখিলাম, এখন আমাদের বাচাও, খুন হইতে রক্ষা কর।" আপনার জীবন, সম্পত্তি ও খ্যাতি রক্ষার জন্য যদি মানুষ মারা পড়ে, তাহা খুন নহে, এ কথা তাহারা জানে না; রায় মহাশয় এ কথা তাহাদের বুঝাইয়া দিলে, তাহারা বড় আনন্দিত হইল। দুইটি মৃতদেহ পুকুর হইতে তুলিয়া আনিয়া উঁহাকে দেখাইল এবং যাহা যাহা তাহাদের করিতে বলিলেন সেই মত তাহারা করিল। উঁহার রিপোর্ট পাইয়া সরকার হইতে তাহাদের ইনাম প্রদত্ত হইল। তিন বৎসর নোয়াখালিতে থাকিয়া রায় মহাশয় বালেশ্বরে বদলি হইলেন। এই বদলির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। স্যার উইলিয়াম গ্রে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, জগদীশ বাবুকে বীরভূমে বদলি করিলেন। মেজার বটন্‌সা নামধারী একজন পল্টনিয়া সাহেব বীরভূমে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহাকে বীরভূমে রাখিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করা হইল, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট হইল যে জগদীশ বাবু চিরদিন যে যে স্থানে নিমক পোক্তান হয়, সেই সেই স্থানে চাকুরি করিয়াছেন, সুতরাং যে জেলায় নিমক্ এখনও প্রস্তুত হয় সেইখানে তাঁহাকে পাঠান কর্ত্তব্য।" এ দিকে জগদীশ বাবু এক পত্র পাইলেন যে তিনি বালেশ্বরে যাইতে পারেন কি না। বালেশ্বর স্বাস্থ্যকর স্থান, সুতরাং সেইখানে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সেই পত্র গ্রে সাহেব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট পাঠান হইল, গ্রে সাহেব জগদীশ বাবুকে বালেশ্বরে বদলি করিলেন।

জগদীশনাথ রায় সেরেস্তাদারী অবস্থায় যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখনকার একটা কথা বলিতে স্মরণ হয় নাই, সে কথাটা এই খানে বলি। জগদীশ বাবুর নিকট অনেক ভদ্রসন্তান ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম; একজনের নাম শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার, ইহাঁর নিবাস বর্দ্ধমান জেলার সাতসইকার এলাকাধীন নপাড়া গ্রামে, ইনি জাতিতে বৈদ্য, মহাকুলীন এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়। প্রসন্ন বাবু পাঠ সমাপনান্তে পুঁটিয়ার বিখ্যাত মহারাণী শরৎসুন্দরীর দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাঁর কার্য্যক্ষমতা, জ্ঞান, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা, দয়া এত উচ্চভাবের ছিল যে, সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিত। ইহাঁর এক পুত্র প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তাঁর আর এক পুত্র বঙ্গদর্শনের বর্ত্তমান সম্পাদক। অপর ভদ্রলোকটির নাম শ্রীযুক্ত রূপনারায়ণ মজুমদার। রূপনারায়ণ বাবুও বৈদ্য, উচ্চকুলসম্ভূত এবং আদর্শচরিত্রের লোক ছিলেন। ইনি জগদীশ বাবুর ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করেন। জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা পাস করিয়া

সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। জুনিয়ার স্কলারসিপ্ পরীক্ষা পাস করিয়াই ইনি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরাজি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাঁর শিক্ষকতায় বড় তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। রূপনারায়ণ বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র মজুমদার আজও জীবিত আছেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট পেন্সন পাইয়া থাকেন। ইনি পিতার ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও প্রেমিক।

জগদীশ বাবু যখন বালেশ্বরে বদলি হন, তখন তাঁহার অধীনে তিন জন সাহেব আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। দুই জন, বাঙ্গালীর তাঁবেদারী করিতে হইবে বলিয়া, বহু চেষ্টা করিয়া অন্যান্য স্থানে বদলি হন। তৃতীয় ব্যক্তি—লেফ্‌টেনেণ্ট রাউটান বড় উদারচরিত্র ছিলেন। তিনি বালেশ্বরে রহিলেন এবং সর্ব্বদাই বলিতেন যে "জগদীশ বাবুর মতন সুযোগ্য, শিক্ষিত, কার্য্যদক্ষ ভদ্রলোকের অধীনে কার্য্য করা তিনি সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করেন।" পরে গ্রেভস্ বলিয়া আর একজন সাহেব ইহাঁর অধীনে ছিলেন। নোয়াখালিতে রায় ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত গদাধর খাঁ ইহাঁর আসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ ওহাবীদলকে কারারুদ্ধ করেন এবং পুলিশের কার্য্য ছাড়িয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হন। কেন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইলেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "জগদীশ বাবুর মতন নিখুঁত লোককে বহুবেগ দিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করিয়াছে, আমার মতন লোককে এ পদ কখনই দিবে না।"

নিমক বিভাগে হাকিমী করিবার সময় জগদীশ বাবু প্রথমতঃ বালেশ্বরে যান, সেখান হইতে মেদিনীপুরে বদলি হন, মেদিনীপুর হইতে তমলুকে আসেন, তমলুকে প্রায় ৭।৮ বৎসর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় তখন মহকুমার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, তজ্জন্য বঙ্কিম বাবু ও সঞ্জীব বাবু প্রায়ই পূজার বন্ধে তমলুকে যাইতেন। তখন জগদীশের বাটীতে বড়ই আনন্দস্রোত চলিত; প্রত্যেক দিন বৈকাল বেলায় সঙ্গীতাদির চর্চ্চা, ভোজনাদি এবং নানা সাহিত্য বিষয়ক কথা হইত। এই দলে আর একজন যোগ দিতেন, তাঁহার নাম ছিল রাজা শ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র। ইনি ময়নাগড়ের রাজা; নানাপ্রকার ক্রীড়ায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সঙ্গীতও জানিতেন এবং বড়ই আমোদপ্রিয় ছিলেন। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত সরকারী ডাক্তার ছিলেন, ইনিও আসিয়া জুটিতেন। তমলুক অতি প্রাচীন স্থান, ইহা পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তি বলিয়া খ্যাত ছিল এবং বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান ছিল। দেবী বর্গভীমা তমলুকে বিরাজ করিতেছেন, ইনিও সতীর অঙ্গসম্ভূত। বর্গভীমার মন্দিরে একটি কুণ্ড আছে। কথিত আছে ইহার জল স্পর্শে মৃত জীব সজীব হইত। তমলুকের জনৈক রাজা ছিলেন, তিনি এক মেছুনীর নিকট মৎস্য লইতেন, মৃত মৎস্য গ্রহণ করিতেন না; মৃত মৎস্য আনিলে মেছুনীকে শাস্তি দিতেন। কথিত আছে, এক দিন কতকগুলি জীবন্ত মৎস্য তমলুকে পৌঁছিয়া মরিয়া গেল, মেছুনী ভয়ে আকুল; কুণ্ডে মৎস্য ধৌত করিতে গেল, তখন মৃত মৎস্যগুলি সজীব হইল। মেছুনী আহ্লাদিত

হইয়া অকুতোভয়ে মৎস্য যোগাইতে লাগিল। একদিন অনেক লোক এ রহস্য দেখিয়া রাজাকে গিয়া বলে, রাজা পরীক্ষা করিয়া এর সত্যতা জানিতে পারিলেন ; ক্রমে এ কথা রটিয়া গেল, দুঃখের বিষয় সাধারণের জ্ঞান লাভের সঙ্গে কুণ্ডের মাহিমা চলিয়া গেল। তমলুকে ১৭০০ ঘর জহুরী বাস করিতেন, এখনও অনেকে রূপনারায়ণ নদের ধারে পুরাতন মোহর পান। তমলুকে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, তাহার জল কখন কমে না। একজন পাগ্‌লা সল্ট এজেণ্ট কলিকাতা হইতে এন্‌জিন লইয়া গিয়া জল ছেঁচিতে লাগিলেন, দিন ভোর যদি দুই ইঞ্চি কমিত, তবে প্রাতে চারি ইঞ্চি বাড়িত। শ্যামাচরণ বাবুর বাসাবাটী রূপনারায়ণের ধারে ছিল, বিজয়া দশমীর দিন নদীতীরে চাঁদমারি হইত, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি সকলেই যোগদান করিতেন। তমলুক হইতে জগদীশ বাবু কলিকাতায় বদ্‌লি হন এবং এখানে কিছুদিন কর্ম্ম করিয়া নিমক বিভাগ উঠাইয়া দেন। কলিকাতার বেকার মহলে একটা কথা ছিল যে, জগদীশনাথ রায়ের নিকট সুপারিস লইয়া গেলেই চাক্‌রী হয়, এইজন্য প্রাতঃকালে তাঁহার বাটীতে বিস্তর লোকের সমাগম হইত। একটি ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি, ইনি সর্ব্বদাই জগদীশ বাবুর নিকট আসিতেন, ইহাঁর নাম ছিল ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে, ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম এম্. ডি উপাধি পান। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আসিতেন, তাঁহার কন্যা "লীলার" বিবাহের সময় কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রস্তাব নানা কারণে কার্য্যে পরিণত হইল না। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র জগদীশ বাবুর সহপাঠী, ইনি অবসর লইয়া সর্ব্বদাই সিমুলিয়া বাটীতে আসিতেন। মুর্শিদাবাদের ডক্তার রামদাস সেনকেও আমরা আসিতে দেখিয়াছি। মুসলমানদের ভিতর নবাব আবদুল লতিফ্ মধ্যে মধ্যে আসিতেন।

তমলুকে বন্য বরাহের বড় উপদ্রব ছিল। একদিন জগদীশ বাবুর বৈঠকখানায় অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে, এমন সময় চাষারা আসিয়া জানাইল "হুজুর বরাহের দৌরাত্ম্যে, আমাদের ফসল বাঁচান দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আপনারা একটা উপায় করুন।" বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবু প্রস্তাব করিলেন "চল, আমরা এখনই যাই।" জগদীশ বাবু বলিলেন "দেখ, আমি ছাড়া এখানে শিকারী কেহ উপস্থিত নাই, তা আমি এখনি যাইতে প্রস্তুত, যদি তোমরা পিছনে থাকিয়া গাদা বন্দুকগুলি আমার হাতে দিতে পার।" শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন, "তা আর পারব না কেন ?" তখন পদব্রজে সকলেই গমন করিলেন, মাঠে প্রবেশ করিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন "দেখ, তামাসগির লোক, এই রাস্তায় অপেক্ষা কর, মাঠের মধ্যে জঙ্গলে আমি যাইব এবং আমাকে গাদা বন্দুক এগাইয়া দিবার জন্য, শ্যামাচরণ, মহিম (রায় মহাশয়ের জামাতা) এবং আহেদ আর্দ্দালি চলুক।" সেই মত কার্য্য হইল, জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চাপ্‌রাসিটা বলিয়া উঠিল "হুজুর ঐ"। একটা নালার ধারে বরাহ মহাশয়েরা ছিলেন, শব্দ শুনিয়া তাদের চাঁই সকলকার অপেক্ষা বৃহৎ একটা বরাহ

দাঁড়াইয়া উঠিল, যেমন দাঁড়াইয়াছে, জগদীশ বাবু বন্দুক ছুড়িলেন, জন্তুটার এক কাণের ভিতর লাগিয়া আর এক কাণ দিয়া গুলি বাহির হইয়া গেল, যন্ত্রণায় জন্তুটা একটা শঙ্খধ্বনির মতন শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। শব্দটা দশটা শাঁখ একত্রে বাজাইলে যেমন তীব্র এবং গম্ভীর হয়, সেই মত হইল। শব্দ শুনিয়া রাস্তায় যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা কে কোথায় পলায়ন করিলেন, তাহার আর ঠিকানা পাওয়া গেল না, চাপ্‌রাসী ভায়া দৌড় দিয়া পলায়ন করিল, শ্যামাচরণ বাবু গাছে উঠিতে না পারিয়া ঝুলিতেছেন, মহিমচন্দ্র কাপড় পায়ে জড়াইয়া জমিতে শয়ন করিয়াছেন, একক জগদীশ বাবু দণ্ডায়মান। তখন শ্যামাচরণকে নামাইয়া, মহিমকে তুলিয়া, বলিলেন, "তোমরা আমাকে বন্দুক বেশ যোগাইয়াছ, বরাহটা আক্রমণ করিলে, আমাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিত, ভগবানের ইচ্ছায় দলপতিটা এক গুলিতেই মরিয়াছে।" ভয়ে দলটা অপর দিকে ছুটিয়া গিয়াছে। তখন বরাহটাকে গরুর গাড়ি করিয়া তমলুকে লইয়া যাওয়া হইল; মাঠ হইতে তমলুক আড়াই ক্রোশ অন্তরে স্থিত, সেখানেও ঐ শঙ্খধ্বনি পৌঁছিয়াছিল। বালেশ্বরে জগদীশ বাবু যখন প্রথম যান, তখন ওখানে ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্‌টার ছিলেন বিখ্যাত বীমস্‌ সাহেব, ইনি বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিলেন এবং বাঙ্গালীদের বড় পছন্দ করিতেন না। জগদীশ বাবুর বালেশ্বরে বদলির কথা শুনিয়া বীমস্‌ সাহেব গবর্ণমেণ্টকে লিখেন যে বালেশ্বরের এলাকায় অনেক গড়জাতি রাজা আছেন, সে দিন কেঁওঝড়ে ইংরাজের সঙ্গে গড়জাতীদের লড়াই হইয়া গিয়াছে, এমত অবস্থায় এ স্থানে একজন পল্‌টুনে কর্ম্মচারী, অন্ততঃ একজন সাহেব পুলিসের কর্ত্তা হওয়া আবশ্যক। গ্রে সাহেব (ছোট লাট) তাহার উত্তরে বলিলেন—"গবর্ণমেণ্ট যেখানে যাহাকে পাঠাইতে হইবে তাহা জানেন, উপযুক্ত লোককেই বালেশ্বরে পাঠান হইয়াছে; ইহাতে বীমস্‌ সাহেবের অমত হইলে তিনি বেলভিডিয়ার গদিতে আসিয়া বসুন এবং আমি বালেশ্বরে যাই।" বীমস্‌ সাহেব লজ্জা পাইয়া অধোবদন হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেটকাফ্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌—৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভক্ত বৎসল

শুক্লাম্বরনামা এক নিষ্ঠাবান সুশান্ত ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে বাস করিতেন। সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি যে কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেন সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া নিজে গ্রহণ করিতেন। কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারে অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িত। গৌর তাহাকে শ্রীবাস গৃহে নিজ নৃত্য দেখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। একদিন গৌরের নৃত্য দেখিতে দেখিতে শুক্লাম্বর ঝুলি কাঁধে নিজেও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের ঈশ্বরাবেশ হইল। তখন শুক্লাম্বরকে ডাকিয়া গৌর কহিলেন—"হে আমার জন্মজন্মান্তরের দরিদ্র সেবক, তুমি তোমার সমস্ত আমাকে অর্পণ করিয়া নিজে ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ। অনুক্ষণ তোমার দ্রব্য আমি কামনা করি, তুমি না দিলেও বলপূর্ব্বক আমি তাহা গ্রহণ করি। হে ভক্ত! দ্বারকায় আমি তোমার খুদ কাড়িয়া খাইয়াছিলাম, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি?" এই বলিয়া শুক্লাম্বরের ঝুলির মধ্যে হস্ত নিবেশিত করিয়া মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া গৌর চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "আমার তণ্ডুলে বিস্তর খুদকণা আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চাও প্রভু!" গৌর কহিলেন—"তোর খুদকণাই আমি চাই। ভক্তিহীন অমৃত দান করিলেও আমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাই না। হে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর! সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে আমি বিরাজমান আছি। তোমার ভোজনেই আমার ভোজন, তোমার পর্য্যটনেই আমার পর্য্যটন। জন্মে জন্মে তুমি আমার সেবা করিয়াছ, তোমাকে আমি প্রেমভক্তি দান করিলাম।" ভক্তপ্রতি প্রভুর অপার করুণার পরিচয় পাইয়া ভক্তগণ রোদন করিতে লাগিলেন।

মুরারি একদিন মনে মনে চিন্তা করিলেন—"ঈশ্বরলীলা মানববুদ্ধির অগম্য। যে সীতার জন্য রামচন্দ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিলেন, তাহাকে পাইয়াই আবার বর্জ্জন করিলেন।

যে যাদবগণকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রাণের মত দেখিতেন, তাঁহারই সম্মুখে সেই যাদবগণ নিহত হইল। গৌরও কখন অন্তর্হিত হইবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব তিনি পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই আমাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে।" মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই রাত্রিতেই দেহত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে এক শাণিত ছুরিকা আনিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু অচিরেই গৌর তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"মুরারি, আমার একটী কথা রক্ষা করিতে হইবে।" মুরারি কহিলেন—"কি আদেশ প্রভু? আমার এ দেহ তোমারই।" গৌর কহিলেন—"সত্য বলিতেছ?" মুরারি বলিলেন—"নিশ্চয়।" তখন গৌর কহিলেন—"মুরারি, ছুরিকাখানি আমাকে দান কর।" অনন্তর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গৌর নিজেই গুপ্তস্থান হইতে ছুরিকাখানি বাহির করিয়া আনিলেন।

প্রভু বলে "গুপ্ত এই তোমার ব্যভার।
কোন্ দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা;
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥
* * * * *
মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও।
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও॥"

মুরারি প্রেমাশ্রুতে গৌরের চরণ অভিষিক্ত করিলেন।

একদিন শ্রীধরের কুটীরে উপস্থিত হইয়া গৌর দেখিলেন, জীর্ণ কুটীরের দ্বারদেশে এক অতি পুরাতন বহুতালিযুক্ত জলপূর্ণ ঘটী রহিয়াছে। ঘটী হস্তে লইয়া গৌর জলপান করিলেন। 'মরিলাম, মরিলাম' বলিয়া শ্রীধর চীৎকার করিয়া উঠিল এবং "আমার সর্ব্বনাশ করিতে আমার ঘরে আসিয়াছ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌর কহিলেন—"শ্রীধরের জলপান করিয়া আমার কলেবর শুদ্ধ হইল, আজি আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করিলাম"; বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

নৃত্য করিতে করিতে আচার্য্য হঠাৎ ভূলুণ্ঠিত হইলেন। ভক্তগণ কিছুতেই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না। গৌর তাহার হস্ত ধরিয়া বিষ্ণুগৃহে লইয়া গেলেন এবং দ্বাররুদ্ধ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচার্য্য, তোমার অভিলাষ আমায় খুলিয়া বল।" আচার্য্য কহিলেন—"তোমাকেই চাই, আর কি চাহিব?" গৌর কহিলেন "আমি ত তোমার সম্মুখেই আছি।" তখন অদ্বৈত কহিলেন—"পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে যে রূপ দেখাইয়াছিলে, তাহাই আমাকে দেখাইতে হইবে!"

বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিকে সৈন্য দেখে মহাযুদ্ধপথ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে॥
কোটী চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥

ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া অদ্বৈত নমস্কার করিলেন। এমন সময় দ্বার-সমীপে ভয়ানক গর্জ্জন শ্রুত হইল। দ্বার উন্মুক্ত হইল। নিত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল।

নৃত্যান্তে গৌর প্রত্যহ স্নান করিতেন। শ্রীবাসের দুঃখী নাম্নী দাসী তাঁহার স্নানার্থ গঙ্গাজল লইয়া আসিত। গৌর যখন নৃত্য করিতেন, দুঃখী মুগ্ধনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত; পরক্ষণেই জল আনিতে ছুটিত। স্নানকালে প্রত্যহই গৌর দেখিতে পাইতেন, সারি সারি পূর্ণকুম্ভ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। একদিন শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে প্রত্যহ আমার জন্য গঙ্গাজল বহিয়া আনে?" শ্রীবাস দুঃখীর নাম করিলে, গৌর কহিলেন—"আর তাহাকে দুঃখী বলিও না। আজি হইতে তাহার নাম হইল সুখী।"

শ্রীবাসগৃহে নৃত্য হইতেছে—এমন সময় তাঁহার অন্তঃপুরে আকুল-ক্রন্দন শ্রুত হইল। দ্রুতগতিতে গমন করিয়া শ্রীবাস দেখিলেন, তাঁহার ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবাস স্ত্রীলোকদিগকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া কহিলেন—"অন্তিমকালে যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলে অতি-বড় পাতকীও বৈকুণ্ঠলাভ করে, স্বয়ং তিনি এখন আমার গৃহে নৃত্য করিতেছেন। আমার পুত্র ভাগ্যবান্ তাই এমন সময়ে পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে। যদি একান্তই শোক সংবরণ করিতে তোমরা সক্ষম না হও, তাহা হইলে প্রভুর নৃত্য শেষ হইলে রোদন করিও। তোমাদের ক্রন্দনে যদি তাঁহার নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।" স্ত্রীগণ শান্ত হইলেন। শ্রীবাস গৃহবহির্ভাগে গমন করিয়া সংকীর্ত্তনে রত হইলেন। অচিরেই শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগসংবাদ ভক্তগণের কর্ণগোচর হইল, কিন্তু গৌরের নৃত্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই তাহা তাঁহাকে জানাইলেন না। নৃত্যান্তে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে? পণ্ডিতের গৃহে কি কোনও অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে?" ভক্তগণ তখন সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। গৌর কহিলেন —"কখন পুত্র পরলোক গমন করিয়াছে?" ভক্তগণ কহিলেন—"চারি দণ্ড রাত্রিকালে। তোমার আনন্দ-ভঙ্গভয়ে এই আড়াই প্রহর শ্রীবাস কাহারও কাছে সে কথা প্রকাশ করেন নাই!" গোবিন্দ স্মরণ করিয়া গৌর কহিলেন—"হায় এমন ভক্তের সঙ্গ আমি কিরূপে ত্যাগ করিব? আমার প্রেমে যে পুত্রশোকের তীব্রতা জানিল না, তাহাকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইব?" গৌর কাঁদিতে লাগিলেন। "ত্যাগ" শব্দ শুনিয়া ভক্তগণ ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় আকুল হইলেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইল।

মৃত শিশুর সংকারের জন্য তাহাকে বাহিরে আনা হইল। মৃত শিশুকে সম্বোধন করিয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন—"শিশু, শ্রীবাসের গৃহ কেন ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?" মৃত শিশু উত্তর করিল—"প্রভু, তোমার নির্ব্বন্ধ অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যত দিন নির্ব্বন্ধ ছিল, ততদিন এ দেহের রস ভোগ করিয়াছি; নির্ব্বন্ধ ঘুচিয়াছে, আর এখানে থাকিবার সাধ্যও নাই। তাই অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরে গমন করিতেছি। কেহ কাহারও পিতা নহে, কেহ কাহারও পুত্র

নহে; সকলেই আপনার কর্ম্মফল ভোগ করে। তোমার চরণে নমস্কার করিতেছি—এখন বিদায়”—বলিয়া শিশু নীরব হইল। মৃত পুত্রের কথা শুনিয়া শ্রীবাস ও ভক্তগণ শোক বিস্মৃত হইলেন।

একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে গৌর কহিলেন “শুক্লাম্বর। আজি মধ্যাহ্নে আমি তোমার অন্ন ভোজন করিব।” শুক্লাম্বর ত্বরিত গৃহে গমন করিয়া পরম যত্নে রন্ধন করিলেন। মনে বড় সন্দেহ হইতে লাগিল—পাছে ভিক্ষুকের অন্নে গৌরের তৃপ্তি না হয়। যথাসময়ে গৌর আসিয়া ভোজন করিলেন, ভোজনান্তে কহিলেন—“আমার জীবনে এমন সুস্বাদু অন্ন কখনও খাই নাই।” কিয়ৎকাল কৃষ্ণ কথালাপ করিয়া গৌর শুক্লাম্বরের গৃহে শয়ন করিলেন। ভক্তগণ তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন। বিজয় দাস নামক গ্রন্থ-লিখনব্যবসায়ী এক ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত পরিপাটী ছিল এবং সাধারণের নিকট তিনি “আঁখরিয়া বিজয়” নামে পরিচিত ছিলেন। গৌর তাঁহাকে দিয়া অনেক পুঁথি লিখাইয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বিজয় গৌরের পাশেই শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল গৌরের হস্তস্পর্শে বিজয় চাহিয়া দেখিলেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই জ্যোতির মধ্যে নানারত্নমণ্ডিত হেমস্তম্ভসদৃশ সুগঠিত এক হস্ত, তাহার অঙ্গুলিনিচয়ের মূলদেশ শ্রীরত্ন মুদ্রিকা-শোভিত। বিজয় বিস্মিত ও ভীত হইয়া চীৎকার করিতে উদ্যত হইলেন। গৌর তাঁহার মুখে হস্তার্পণ করিয়া নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন—“যতদিন আমি এখানে থাকিব, ততদিন এ কথা কাহাকেও বলিও না।” বিজয় হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—ভক্তগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাঁহারা দেখিলেন, বিজয় উন্মাদের মত উল্লম্ফন করিতেছে। ক্ষণকাল পরে বিজয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছান্তে সাতদিন আহার ও নিদ্রা-শূন্য হইয়া বিজয় জড়ের মত নবদ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস

হরিনাম যতই প্রচারিত হইতে লাগিল, যতই নবদ্বীপের পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র হরিধ্বনি উঠিতে লাগিল, ততই গৌরের ভক্তিবিহ্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবা নিশি তাঁহার নয়ন বহিয়া অবিরল অশ্রুধার পড়িতে লাগিল, হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিলেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এক মহাকম্পের উদ্ভব হইত, সময়ে সময়ে তাহার প্রাবল্যে গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। ক্রমে এমন হইল যে, তিনি কি বলিতেছেন কি করিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কখনো বলিতেন—“আমি মদন গোপাল,” কখনও বলিতেন—“আমি চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের দাস।” কখনও বা সমস্ত দিন ভরিয়া “গোপী-নাম” জপ করিতেন, আবার সময়ে সময়ে কৃষ্ণ-নাম শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন এবং বলিতেন—“কৃষ্ণ শঠ, কৃষ্ণ দস্যু ও কিতব, কে তাহাকে ভজনা করিবে?” ক্ষণে ক্ষণে “গোকুল গোকুল”, কখনও বা “বৃন্দাবন বৃন্দাবন,” আবার সময়ে সময়ে “মথুরা

মথুরা” বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। কখনও ভূমিতলে ত্রিভঙ্গিম বংশীবাদন-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া নয়নজলে তাহাকে অভিষিঞ্চিত করিতেন। কখনও কখনও রাত্রিকে দিন ও দিনকে রাত্রি বলিয়া ভুল করিতেন। জননীর সন্তোষ বিধানের জন্য সময় সময় বাহ্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, এই প্রেম-বিহ্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কালে এমন হইল যে, বিষ্ণুপূজা করিতেও গৌর অপারক হইয়া পড়িলেন। স্নানান্তে যখন বিষ্ণুপূজার্থ গৌর উপবেশন করিতেন, তখন অবিরল ধারে অশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বসন সিক্ত করিত। সিক্ত বসন ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান করতঃ আবার যখন পূজা করিতে বসিতেন অমনি দ্বিগুণ বেগে অশ্রু গলিত হইয়া সে বসনও ভিজিয়া যাইত। এইরূপ কিছুক্ষণ ধরিয়া কেবল বস্ত্রপরিবর্ত্তনই চলিতে থাকিত। পূজা আর হইয়া উঠিত না। পরিশেষে গদাধরকে ডাকিয়া একদিন গৌর কহিলেন—“গদাধর, আজ অবধি তুমিই বিষ্ণুপূজা কর, আমার সে সৌভাগ্য নাই।”

একদিন গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া গৌর অনবরত “বৃন্দাবন” “গোপী” এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় এক টোলের ছাত্র উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“নিমাইপণ্ডিত! গোপীনাম-জপে কি ফল হইবে, কৃষ্ণনাম জপ কর।” গৌর ক্রুদ্ধ-স্বরে উত্তর করিলেন—“কৃষ্ণ ত দস্যু, কে তাহার ভজনা করে? যে বিনাপরাধে বালীকে বধ করিয়াছিল, বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে পাতালে পাঠাইয়াছিল, তাহার নাম লইলে কি ফল হইবে?”—এই বলিয়া এক স্থূল বংশদণ্ড লইয়া গৌর ছাত্রকে তাড়া করিলেন। ছাত্র পলায়ন করিয়া সহাধ্যায়ী-দিগকে গৌরের আচরণের বিষয় জানাইল। সকলে মহাকুপিত হইয়া উঠিল এবং আর কাহাকেও মারিতে আসিলে তাহারা গৌরকে প্রহার করিবে—এইরূপ ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা বলিতে লাগিল—

রাজা ত নহেন তেহোঁ মারিবেন কেনে।
আমরাও সমবায় হও সর্ব্বজনে॥
যদি তেহোঁ মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকল তবে না সহিব আর॥
হের সভে পড়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিঁহো গোসাঞি বা হইলা কেমনে॥

ছাত্রগণের ষড়যন্ত্রের কথা গৌরের কর্ণ-গত হইল, এবং ইহার কয়েকদিন পরে এক দিন পারিষদদিগের সমক্ষে, তিনি বলিলেন,—

‘করিল পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া কফ আরো বাড়িল দেহেতে॥

বলিয়া গৌর খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ভিন্ন কেহই এই প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দের বদন বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণকাল পরে নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া গৌর কহিলেন, “নিতাই, মনের কথা তোমাকে খুলিয়া বলি। আমি আসিলাম জগতের উদ্ধারের জন্য, কিন্তু দেখিতেছি, আমা দ্বারা লোকের সংহারের পথই প্রসারিত হইতেছে। কোথায় মানবের বন্ধন ছেদন করিব, না, আমা দ্বারা তাহাদের বন্ধন দৃঢ়তর

হইয়া উঠিতেছে। আমাকে মারিবার জন্য লোকে ষড়যন্ত্র করিতেছে ; বৈষ্ণবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সমগ্র নবদ্বীপে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিতে চাহিতেছে ; ইহাতে ত তাহাদের বন্ধন বাড়িবে। শোন নিতাই, আমি স্থির করিয়াছি, শিখাসূত্রে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। যাহারা আমাকে মারিতে চাহিতেছে, কালি তাহাদের দ্বারেই আমি ভিক্ষুকবেশে উপস্থিত হইব। তখনও কি আমার প্রতি তাহাদের রাগ থাকিবে ? সমাজ সন্ন্যাসীকে ভক্তি করে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, লোকে ভক্তির সহিত আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। তাই নিতাই, গৃহস্থাশ্রম বর্জ্জন করিতে আমি কৃতসংকল্প হইয়াছি ; তুমি অনুমতি দাও।" নিতাই বিষাদিত হইয়া বলিলেন— "আমি কি বলিব ? তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তোমার সকল ভক্তগণকে তোমার অভিপ্রায় জানাও। তাঁহারা কি বলেন, শোন।" তখন নিত্যানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৌর মুকুন্দের আবাসে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে স্বীয় সংকল্পের কথা বলিলেন। মুকুন্দ মর্ম্মাহত হইলেন এবং বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর বলিলেন—"যদি একান্তই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, তবে অন্ততঃ দিনকতক থাকিয়া পূর্ব্বের মত কীর্ত্তন করিয়া যাও।" মুকুন্দের নিকট হইতে গৌর গদাধরের নিকট গমন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া—

অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
যতেক অদ্ভূত সেই তোমার উত্তর॥
শিখাসূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হরে।
তোমার সে মত এ বেদের মত নহে॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমনে ছাড়িবে।
প্রথমে ত জননীবধের ভাগী হবে॥

গদাধরের নিকট হইতে গৌর একে একে যাবতীয় বৈষ্ণবের গৃহে গমন করিয়া স্বীয় সংকল্পের কথা সকলকে অবগত করিলেন।

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কাঁদে সর্ব্বভক্তগণ॥
কেহো বলে "সে সুন্দর চাচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥
কেহো বলে "না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।
কেমতে রহিব এ না পাপিষ্ঠ জীবন॥
সে কেশের দিব্যগন্ধ না লইব আর।"
এত বলি শিরে কর হানে আপনার॥
কেহো বলে "সে সুন্দর কেশ আরবার।
আমলক দিয়া কি না করিব সংস্কার॥"
হরি হরি বলি কেহ কাঁদে উচ্চস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥

বিচ্ছেদশঙ্কাকুল ভক্তগণকে প্রবোধ দিয়া গৌর কহিলেন—"লোকরক্ষার জন্য আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ। অন্তরে কখনও আমি তোমাদের সঙ্গছাড়া হইব না।

সর্ব্বকাল তোমরা সকল মোর অঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি আমা সবা সঙ্গে।
নিরবধি আছে সঙ্কীর্ত্তনসুখরঙ্গে॥
এই মত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহারেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥

গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্পের কথা

ক্রমে জননীর কর্ণগোচর হইল। শুনিয়া, শচীমাতা মূর্চ্ছিত হইলেন। বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের পর হইতেই যে আশঙ্কায় তাঁহার মন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিত, গৌরের গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতে তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া যে আশঙ্কায় তাঁহার মন অনবরত আলোড়িত হইতেছিল—সে আশঙ্কা সত্য হইতে চলিল। আজ বিশ্বরূপের শোক ও স্বামিশোক বিধবার হৃদয়ে নূতন হইয়া উঠিল। বেদনাভাবাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্রের নিকট গমন করিয়া শচী কহিলেন—"বাপ নিমাই, আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না। তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমি বাচিব না। জননাকে কষ্ট দিলে কি তোমার ধর্ম্ম হইবে? নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি বান্ধবগণের সহিত গৃহে থাকিয়াই কীর্ত্তন কর। ধর্ম্মময় তুমি, আমাকে ত্যাগ করিয়া জগৎকে কি শিখাইবে বাপ?"

জননীর আকুল ক্রন্দনে গৌরের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল; তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—কোনও বাক্য নিঃসরণ হইল না। উত্তর না পাইয়া জননী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আহারনিদ্রা বন্ধ হইল—শরীর কঙ্কালসার হইল। দেখিয়া, একদিন জননীকে নিভৃতে লইয়া গৌর কহিলেন—"মা, মন স্থির কর। তুমি কি কেবল আমার এই জন্মেরই মা? তুমি পৃশ্নিনামে এই ধরাধামে বিরাজ করিতে; তখনও তোমারই পুত্ররূপে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তোমারই গর্ভ আশ্রয় করিয়া আমি শ্রীরামরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। দেবহুতিরূপে কপিলরূপী আমাকে তুমিই প্রসব করিয়াছিলে। দেবকীরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে তুমিই স্তন্য দান করিয়াছিলে। আরও দুইবার আমাকে তোমার পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইতে হইবে। সংসার ত্যাগ না করিলে আমার জন্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। জগতের মঙ্গলার্থে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দেও মা।" পুত্রের কথা শুনিয়া শচীর মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

গৌর স্বীয় সংকল্পের কথা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু সাধ্বী লোকমুখে সমস্তই শুনিয়াছিলেন। রজনীতে গৌর শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় দেবী শয্যায় গমন করিয়া দুই হস্তে স্বামীর চরণদ্বয় ধারণ করিলেন। অশ্রুতে গৌরের চরণ প্লাবিত হইল। গৌর নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিয়া সাদরে প্রিয়াকে আলিঙ্গন করতঃ গৌর কহিলেন—"কাঁদিতেছ কেন প্রিয়ে?" বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বক্ষোদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। উত্তর না পাইয়া গৌর আবার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বিষ্ণু প্রিয়া কহিলেন "কেন কাঁদিতেছি, জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি কিছুই শুনি নাই? তোমার সন্ন্যাসের সংকল্পের কথা কি আমি জানি না? হায়! তোমাকে পতি পাইয়া ভাবিতাম, আমার মত ভাগ্যবতী আর কেহ নাই। তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব। তুমি গেলে কি লইয়া আমি গৃহে থাকিব? কেমন করিয়া কণ্টকময় অরণ্যে তুমি বেড়াইবে? তোমার কুসুমকোমল শরীরে কেমন করিয়া তুমি শীতাতপ সহ্য

করিবে? আর কেমন করিয়াই বা বৃদ্ধা পুত্রবৎসলা জননীর কাতর ক্রন্দন আমি প্রতিদিন সহ্য করিব? আমার উপরই যেন তোমার মমতা নাই, কিন্তু তোমার প্রাণাধিক মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতিকে কোন্ অপরাধে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? তারা যে তোমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিবে? সংসার ত্যাগ করিতে চাও? তোমার সংসার ত আমি। তবে আমারই জন্য তুমি দেশ ত্যাগী হইতে চাহিতেছ? বেশ, তুমি দেশান্তরে যাইও না—আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

আদরে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নজল মুছাইয়া গৌর বলিলেন—"প্রিয়ে! অনর্থক গোল করিও না। কে তোমাকে বলিল আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব? যদি সন্ন্যাস করি, তৎপূর্ব্বেই তোমাকে বলিব।" বলিয়া অসংখ্য চুম্বন দানে বিষ্ণুপ্রিয়ার মানসিক ভাব লঘু করিবার চেষ্টা করিলেন। সমস্ত রজনী প্রণয়ালাপে অতিবাহিত হইল। শেষ রজনীতে সাধ্বী পুনরায় ব্যাকুলভাবে কহিলেন—"আমার ভয়ে মিথ্যা কথা বলিও না। বড় ভয় হইতেছে—তুমি আমার অগোচরে পলায়ন করিবে। আমার সাধ্য নাই, তোমার কার্য্যের প্রতিরোধ করি। আমাকে প্রবঞ্চনা করিও না—নিশ্চয় করিয়া বল—তুমি সংসার ত্যাগ করিবে কি না।"

তখন হাসিতে হাসিতে গৌর কহিলেন—"প্রিয়তমে, মন দিয়া আমার কথা শোন। পিতামাতা পতি পত্নী প্রভৃতি জাগতিক সম্বন্ধ সমস্তই মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভিন্ন মানবের প্রকৃত আত্মীয় কেহ নাই। দৃশ্যমান সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মায়া; তিনিই এক পরমাত্মা, সর্ব্বত্র তিনিই প্রকাশিত। তাঁহাকে ভজনা করিবার জন্য জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়াই আপনাকে ভুলিয়া যায়—ফলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার নাম, প্রিয়ে তোমার নাম সার্থক হউক, তুমি শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ কর—অনর্থক শোক পরিত্যাগ কর।" তখন দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিলেন—বিশ্বম্ভর চতুর্ভুজরূপে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। স্বামীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া দেবী কহিলেন—"আমার পরম সৌভাগ্য পরমেশ্বররূপী তুমি আমাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে কিন্তু কোন্ পাপে তোমার সেবা হইতে আমি বঞ্চিত হইব?" দেবী রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া গৌর কহিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি, যেখানেই আমি থাকি, তোমার সঙ্গ কদাচও ত্যাগ করিব না।" বিষ্ণুপ্রিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

কয়েকদিন গত হইলে গৌর নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কহিলেন—"আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। ইন্দ্রাণীর নিকটস্থ কাটোয়া গ্রামে কেশব ভারতী নামে এক শুদ্ধসত্ত্ব সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারই নিকট আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। আমার জননীকে আর গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য ও মুকুন্দকে এই সংবাদ তোমাকে দিতে হইবে।" নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

গমনের দিন স্থির হইল। শচীদেবী নিত্যানন্দ, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও

মুকুন্দ ভিন্ন কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বদিন সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে গৌর নিজ গৃহে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। গৌরের অভিপ্রায় অবগত না হইলেও সেদিন সকল বৈষ্ণবই তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সকলকেই পরম স্নেহে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দিয়া গৌর বিদায় দিলেন। অবশেষে খোলাবেচা শ্রীধর একটী লাউ লইয়া প্রভুর দর্শনে আসিলেন। সযত্নে ভক্তের উপহার গ্রহণ করিয়া গৌর সেই রাত্রেই তাহা রন্ধন করিতে জননীকে অনুরোধ করিলেন। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে সমাগত সকলকে বিদায় দিয়া গৌর ভোজন সমাপন করতঃ শয়ন করিলেন। হরিদাস ও গদাধর তাঁহার নিকট শয়ন করিয়া রহিলেন। শচীমাতার চক্ষুতে নিদ্রা নাই— কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে গৌর শয্যাত্যাগ করিলেন। গদাধর ও হরিদাসও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। গদাধর সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, গৌর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। শচীমাতা দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া জননীর হস্তধারণ করতঃ গৌর কহিলেন "মা, তোমার জন্যই আমার সব হইয়াছে; তোমার ঋণ আমি শোধিতে পারিব না। কি করিব মা, জগৎ ঈশ্বরের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে। সংযোগ বিয়োগ সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন। আমি চলিলাম মা, আমার জন্য চিন্তা করিও না। তোমার ব্যবহার ও পরমার্থ—সমস্ত ভারই আমার রহিল।

বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বারবার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥

শচী বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। জননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া গৌর গৃহত্যাগ করিলেন। আর পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া?—তিনি স্বামীর গৃহত্যাগের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না।

রজনী প্রভাত হইল। প্রিয় ভক্তগণ অভ্যাস মত প্রভুকে দেখিবার জন্য একে একে তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন মৃতার ন্যায় শচীমাতা গৃহদ্বারে পড়িয়া আছেন—তাঁহার নয়নবিগলিত অশ্রুধারায় ভূমিতল সিক্ত হইতেছে। ভক্তগণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলে আকুলস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে গৌরের সংসারত্যাগসংবাদ সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক গৌরের গৃহে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আসিয়া দেখিল—গৃহ শূন্য, গৃহদেবতা অন্তর্হিত। আবালবৃদ্ধবনিতা বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এতদিন যাহারা বৈষ্ণবদিগের প্রতি কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহারাও অনুতাপ ও শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। তাহারা কাতরভাবে বলিতে লাগিল—"পাপিষ্ঠ আমরা, এমন লোক চিনিতে পারি নাই।" নিন্দা থামিল, বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত হইল।

ভাগীরথী ও অজয়নদের সঙ্গমস্থলে কণ্টক নগরী (কাঁটোয়া) অবস্থিত। ক্ষুদ্র নগর, কিন্তু

অদূরে ইন্দ্রাণী বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির গৌরবে দণ্ডায়মান। নগরের জনকোলাহল হইতে দূরে গঙ্গাতীরে এক পর্ণকুটীরে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী কেশব ভারতী অবস্থান করিতেছিলেন। সমস্ত দিন পথ অতিবাহিত করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দ সহ সায়ংকালে গৌর তথায় উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। ভারতী দেখিলেন, গৌরের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারা বহিতেছে। যুক্তকরে গৌর কহিলেন—"প্রভু! আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পাইবার উপায় তুমিই কেবল আমাকে বলিয়া দিতে পার। দয়া করিয়া আমাকে কৃষ্ণপ্রেম দান কর।" বলিতে বলিতে গৌর অধীর হইয়া পড়িলেন। দ্বিগুণ বেগে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সমগ্র শরীর প্লাবিত করিয়া দিল, ভাবের আবেগে তিনি উন্মত্তভাবে নাচিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভারতী বিমুগ্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে এই অদ্ভুত কাহিনী সমগ্র নগরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কাটোয়ার যাবতীয় নরনারী গঙ্গাতীরে ভারতীর কুটীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌর তখনও প্রেমে বিহ্বল। সকলে মুগ্ধনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার প্রেম সেই বিশাল জনসঙ্ঘে সংক্রমিত হইল। মুহুর্মুহুঃ বিপুল হরিধ্বনি উত্থিত হইয়া ভাগীরথী তীর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সমাগত নারীগণ সেই নবীন সন্ন্যাসীর কান্তি দেখিয়া মাতৃহৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হায়! এই তরুণ যুবক সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে, কিরূপে ইহার জননী প্রাণধারণে সক্ষম হইবে?"

ভারতী এতক্ষণ অনিমেষ-লোচনে গৌরের দেহকান্তি ও তাঁহার প্রেমপুলকিত অবস্থা অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি গৌরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার প্রতীতি হইতেছে—তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার গুরু হইবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে মনে হইতেছে, লোকশিক্ষার জন্য তুমি এই অকিঞ্চনকেই গুরুপদে বরণ করিবে।" গৌর কহিলেন—"আমাকে ছলনা করিও না, প্রভু! অবিলম্বে আমাকে দীক্ষা দান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের পন্থা দেখাইয়া দেও।" সমস্ত রজনী কৃষ্ণ-কথালাপে অতিবাহিত হইল। প্রত্যূষে গৌর চন্দ্রশেখরকে সন্ন্যাসের আয়োজন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আয়োজন অচিরেই সম্পন্ন হইল। গৌর শিখা মুণ্ডন করিতে বসিলেন।

তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিলা তখনে॥
খুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
হাত নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারী লোক।
তাহারাও কাঁদিতে লাগিলা করি শোক॥
কেহ বলে কোন্ বিধি সৃজিলা সন্ন্যাস।
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস॥

নাপিত কিছুতেই শিখা মুণ্ডন করিতে

পারে না, সমস্ত দিনের পর সায়ংকালে তাহার ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ হইল। ক্ষৌরান্তে স্নান করিয়া গৌর কহিলেন—"আমি স্বপ্নে কোনও মহাজনের নিকট হইতে এই মন্ত্রটী প্রাপ্ত হইয়াছি।" বলিয়া স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্রটী ভারতীর কাণে কাণে কহিলেন। ভারতী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এই মন্ত্রই ত বটে—তুমি আমার মু দিয়া মন্ত্রটী বাহির করিতে চাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া গৌরের কর্ণমূলে কথিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেন। সমাগত জনগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন অরুণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া গৌরের দেহ স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আপাদমস্তক চন্দনচর্চ্চিত দিব্যমাল্যশোভিত দণ্ডকমণ্ডলু কর প্রেমপুলকিতাশ্রু সেই গৌর সন্ন্যাসীকে যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল। গৌরের বক্ষোদেশে হস্তার্পণ করিয়া ভারতী কহিলেন—"জগৎবাসী জনগণকে কৃষ্ণনাম দিয়া তুমি তাহাদিগের চৈতন্য বিধান করিয়াছ—সেজন্য আজি হইতে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইল।"

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

চলিত ভাষার অপ্রচলিত ব্যাকরণ

কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিচারে এ পৃথিবীটা "সর্ব্বৈব মায়া" তবে এ বেজায় ভুলের মধ্যে পণ্ডিতের "সর্ব্বৈব মায়া" কথাটি অবশ্য খাঁটি সত্য। কোন কোন মুগ্ধবোধওয়ালার বিচারে আমাদের বাঙ্গলা ভাষাটাই ভুল। যদি বৈদিক পিতৃলোক হইতে অঙ্গিরা ঋষি এ কালের কোন mediumএর ঘাড়ে চাপিয়া সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলা পর্য্যন্ত সকল ভাষার সমালোচনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক—সকল যুগের সকল ভাষাকেই ভুল বলিতে পারিতেন। রামী যখন রাগে গর্ গর্ করিয়া নথ-নাড়া দিতে দিতে পাড়ার পোড়ারমুখোদিগকে গোল্লায় যাইতে বলে, তখন যে তাহার গালি খায়, সে যদি বোপদেবের শিষ্যও হয়, তবুও সে-ব্যক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে ঐ গালির তীব্রতা অনুভব করে। কিন্তু বেচারা যদি গাল খাইয়াও ব্যাকরণ খুলিয়া বসে, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে যে, সবটাই ভুল। চণ্ডীদাসের প্রিয় "রামী"ও ভুল, ক্রোধ অর্থে "রাগ" শব্দটাও ভুল, "গর্ গর্"ও ভুল, বৈদিক অবৈদিক সকল অলঙ্কারের পর্য্যায়েই "নথ" ভুল, "পোড়ার" সঙ্গে "মুখোর" সমাস ভুল এবং "গোল্লায়"ও ভুল পণ্ডিতটি ব্যাকরণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার "খোকার মা" একেবারে "নীলাম্বরী" শাড়ীর আঁচলটি "কোমর"এ জড়াইয়া "খেঙ্গরা" হাতে লইয়া "হন্-হন্"-করিয়া ছুটিবেন।

বাঙ্গলা ভাষাটাকে সাধু করিবার চেষ্টায় (সাধ্বী লিখিলাম না) আমাদের খাঁটি বাঙ্গলা-

দেশী "কাণ্ডারী" শব্দটাকে "কাণ্ডারিন্" করিয়া কেহ কেহ উহাকে সংস্কৃত রচনায় জুড়িয়াছেন; সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কশূন্য দেশী "প্রজাপতি"কে কেহ কেহ, কেবল বর্ণের মহিমায় ভাবিয়া, সংস্কৃত পতঙ্গ বলিয়াও ভাবিয়াছেন; তাহা ছাড়া আবার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের মাথায় উহাকে ব্রহ্মার আসনে বসাইয়া নমস্কার করিতেও ছাড়েন না। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত আমরা মেয়েদিগকে দেশী কথায় "আইবুড়" বলিয়া থাকি, এবং বিবাহের পূর্ব্বে "আইবুড়ভাত" দিয়া থাকি। আয়ুর জন্য অন্নের প্রয়োজন হইলেও কোন স্মৃতিপুরাণে আয়ুবৃদ্ধির অনুষ্ঠানে এইরূপ অন্ন দিবার ব্যবস্থা নাই, তবুও টানিয়া হেঁচড়াইয়া "আয়ুর্বৃদ্ধান্ন" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের "এত বড় আইবুড় ঝি"কে সংস্কৃত নাম দিতে গেলে তিনি "আয়ুর্বৃদ্ধা দুহিতা" হইয়া উঠেন। কি চমৎকার অর্থই হয়! একবার একজন লোকের ফোড়া দিয়া "গল্ গল্" করিয়া পূঁয বাহির হইতেছিল দেখিয়া, একজন পণ্ডিত "গল্ গল্" কথাটিকে ভাল ভাষায় ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া যঙন্তপ্রকরণের আশ্রয় লইয়া বলিলেন যে—স্ফোটকটা "জঙ্গল্যতে"।

ব্যাকরণের এ জঙ্গলে মাথা দিবার সাহস আমাদের নাই; কিন্তু আমাদের মাঝখানে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ মহাশয়ের বিলক্ষণ আছে। তিনি এক দিকে টোলের পণ্ডিতদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন; অন্য দিকে আবার বুক ফুলাইয়া সকল পাশ-করা শিক্ষিতেরই পাশে দাঁড়াইতে পারেন। তিনি পরিহাস করিতেছেন না বলিয়াও, যে নিগূঢ় পরিহাসে "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" নাম দিয়া বাঙ্গলা প্রয়োগের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক বোপদেবের শিষ্যকেই সংযত হইতে হইবে। সংস্কৃত না জানিয়া যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত কথা ভুল প্রয়োগে জুড়িয়া থাকেন, তিনি তাঁহাদিগকেও কশাঘাত করিতে ছাড়েন নাই। আমরা ইংরেজি-ওয়ালারা সকলেই পিঠে হাত দিয়া অল্প বিস্তর জ্বালা অনুভব করিতেছি। ললিত বাবুর সমালোচনার সাধারণ রীতি এবং উদ্দেশ্যের কথা লইয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এ প্রবন্ধে মুখ্যতঃ তাঁহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত অবলম্বনে গোটাকতক শব্দের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা এবং ব্যুৎপত্তির বিচার করিব।

(১) পুত্তলিকা, পুত্তলঃ এবং পুত্তলী অন্যান্য অনেক সংস্কৃত শব্দের মত খাঁটি দেশী পুতুল বা পুত্লির (হিন্দী) ঘষা মাজা সংস্করণ হইবারই সম্ভাবনা; কারণ, কোন বৈদিক শব্দেই উহার কোন মূল নাই। কিন্তু আমাদের ঘোড়া যদি "ঘোটক" হইতে পারিয়াছে, এবং বিলেই বা বিল্লী যদি দ্রাবিড়ের গৃহ হইতে আসিয়া "বিড়াল" রূপে বৈদিক মার্জ্জারকে তাড়াইতে পারিয়াছে, মৎস্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাণ্ড্যদিগের "মীন" যখন আমাদের উপভোগ্য হইতে পারিয়াছে, তখন যে "পুত্তলঃ" ও "পুত্তলী" বঙ্গ হইতে বহু দূরদেশেও অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার প্রয়োগ দোষযুক্ত হইবে কেন? কেহ বিদেশে মরিয়া গেলে, স্বদেশে (স্বগৃহে) তাহার "পুত্তল-দহন"-কার্য্যের

ব্যবস্থা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্মৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঠাকুর গড়িবার জন্য পত্তলী-বিধি পাওয়া যায়! বঙ্গভাষার সহিত অপরিচিত মহারাষ্ট্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থ (যথা—আপ্তের কোষ গ্রন্থ) দেখিতে পাবেন। যখন অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের পুত্তল-পূজা শব্দ দ্বারা idolatry বুঝায়, তখন "পৌত্তলিকতা" শব্দের জন্য রাজা রামমোহনকে কেহ দোষী করিতে পারেন না,—কৃষ্ণকমলের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তিও পারেন না। "পুত্তলিকা" এবং "পৌত্তলিকতা" শুদ্ধ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পণ্ডিতকুলগৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয় "উভচর" কথা চালাইয়া বরং পাণ্ডিত্যই দেখাইয়াছেন। "উভ" ধাতু বৈদিক ভাষায় যে ভাবে আছে, তাহা হইতে পরবর্ত্তী সংস্কৃতের "উভৌ" কিংবা "উভয়" বড় সহজে করা যায় না; তবুও সুবিধার জন্য তাহা হইয়াছিল। বৈদিক "উভ" হবাণের ভাষায় বা জেন্দ ভাষায় খাঁটি adverb "উব"-রূপে পাওয়া যায়; উহা প্রাচীন প্রয়োগের উত্তম দৃষ্টান্ত। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক এবং ইরাণী প্রয়োগ দেখিয়া "উভ" এবং "উব"কে গ্রীক amphi এবং লাটিন ambor সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ স্থলে নূতন শব্দ গড়িবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি অতি প্রাচীন ভাষা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে দোষের কথা হয় নাই। প্রাচীন ভাষা হইতে যখন আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, তখন কি কেবল জয়দেবের আমলের কিংবা কালিদাসের আমলের সংস্কৃতকেই শুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া তাহা হইতেই শব্দ সংগ্রহ করিতে হইবে? আমাদের কাছে সকল প্রাচীনই সমান; নূতন ব্যবহারের সময় যাহা অধিক উপযোগী মনে হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বৈদিক ভাষার অনেক শব্দ সুন্দর ভাবপ্রকাশক, অথচ সেরূপ ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দ সংস্কৃতে নাই, সেরূপ স্থলে বৈদিক শব্দ অগ্রাহ্য হইবে কেন?

(৩) অক্ষয়কীর্ত্তি অক্ষয়কুমার দত্ত "সৃজন" কথা ব্যবহার করিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় রচিত প্রাচীন পুঁথি ও ছাপা গ্রন্থে গ্রন্থারম্ভে বন্দনা বা দেবস্তুতিতে অনেক "সৃজন পালন" ব্যবহৃত ছিল। ললিত বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের ভাষায় যে সকল অপভ্রংশ শব্দ প্রচলিত আছে, সেগুলিকে কদাচ অশুদ্ধ বলা চলে না। সকল প্রাচীন প্রাকৃত এবং এ কালের প্রচলিত ভাষাগুলি অপভ্রংশ শব্দ লইয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাজেই অপভ্রংশ দূর করিতে গেলে একেবারে কম্বলের লোম বাছা হইবে। পণ্ডিতেরা এই অসার উৎপাটন-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অপভ্রংশ শব্দগুলিকে রেহাই দিলে বাঁচা যায়।

(৪) বাঙ্গলায় "আত্মা"ই হইল শব্দ,—"আত্মন্" নয়; "পিতা"ই শব্দ,—"পিতৃ" নয়; কাজেই পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক ব্যবহৃত "আত্মাপুরুষ" ও "পিতাস্বরূপ" ভুল বাঙ্গলা নয়। তাঁহার "দুরাচারিণী"র কথা লিঙ্গবিচারের সময় বলিব। বাঙ্গলায় ছেঁচা বা সেঁচা কথা প্রচলিত আছে; উহাকে ভদ্র আকার দিতে গিয়া একেবারে একটা

নূতন শব্দ ব্যবহারের বেলায়, "সিঞ্চন" চালাইতে পারা যায় না। "সক্ষম" শব্দটিও একটা অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি। এ সকল প্রয়োগ বড়লোকের হাতে হইলেও, উহা ভুল প্রয়োগ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইংরেজি ভাষাতেও বড় লোকের ভুল প্রয়োগগুলি ভুল বলিয়াই বালকদিগকে শিখাইয়া দেওয়া হয়, এবং বিদ্যালয়ের বালকেরা ঐ ভুল প্রয়োগ কোথায় আছে, তাহা শিক্ষা করে, কিন্তু ভাষায় ঐ ভুল চালাইতে উপদিষ্ট হয় না। আমাদিগকেও ঠিক তাহাই করিতে হইবে। বায়ু যে পথে আসে, তাহাকে বাতায়ন বলিতে পারি বলিয়া, কোনরূপেই "জালায়ন" ব্যবহার করা চলে না। এরূপ অদ্ভুত প্রয়োগ কিন্তু আমার চোখে পড়ে নাই। জানালায় গবাক্ষ না থাকিলে বরং উহাকে "চোরায়ন" বলা চলে, কিন্তু "জালায়ন" একেবারে উৎকটরূপে মৌলিক, আমাদের খাঁটি বাঙ্গলার "মচ্চিভঙ্গ" কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা ধরিতে না পারিয়া উহাকে উৎকট সংস্কৃত আকারে "মূর্চ্ছাভঙ্গ" করিলে যথার্থই উপহাসাস্পদ হইতে হয়, আমাদের প্রাচীনকালের দেশরীতিতে দেবর ভাসুরে প্রভেদ ছিল না, সম্ভবতঃ প্রতিবেশী কোন আর্য্যেতর জাতির ব্যবহার হইতে ভাসুর-ভাদ্রবধূর নূতন শিষ্টাচারের প্রচলন হইয়া, ঐ দুইটি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে "ভাসুর" শব্দটির যে ব্যুৎপাদক শব্দ আছে, উহা একটি নূতন গড়া শব্দ। "জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য" কথা হইতে "ভ্রাতৃশ্বশুর" শব্দের সৃষ্টি করিয়া উহার অপভ্রংশে "ভাসুর" চালান হইয়াছে। সম্বলপুর অঞ্চলের ভাষায় স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'দেড়শুর' বলে, ঐ শব্দটি "জ্যেষ্ঠ" এবং "শ্বশুর" এই দুই শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন। ঐরূপ 'ভ্রাতৃবধূ' হইতেও "ভাদ্রবধূ" হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। বধূবর্গের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী কল্যাণ-কামনার পাত্রী বলিয়া, হয় ত বধূর পূর্ব্বে "ভদ্র" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই ভাবের সূচনার জন্য অনেক শব্দের পূর্ব্বে "ভদ্র" পদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমানের কথাটা অনুমান বলিয়াই পাঠকেরা গ্রহণ করিবেন।

আমাদের অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে যখন "মমতা" চলিতে পারিয়াছে, তখন উত্তম ভাব প্রকাশক "আমিত্ব" প্রভৃতি শব্দ দোষযুক্ত নহে। যোগশাস্ত্রে "অস্মিতা" ব্যবহৃত আছে। সর্ব্বনাম শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির পদের সহিত সমাস করিয়া, অথবা ঐ পদে নূতন তদ্ধিত যোগ করিয়া শব্দ গড়িবার প্রথা বৈদিক যুগেও যখন ছিল, তখন এ প্রথা সনাতন। "ম-বৎ" (আমার মত), "যুষ্মা-দত্ত" (তোমা কর্ত্তৃক দত্ত), "অস্মৎ-সখি" (আমাদের সহচর), "অস্মে-হিতি" (আমাদের জন্য সংবাদ) প্রভৃতি শব্দ খাঁটি বৈদিক। ক্ষুব্ধ শব্দটির একটা অশ্লীল পারিভাষিক অর্থ আছে বটে, কিন্তু উহাই একমাত্র অর্থ নয় ;" ক্ষুভিত" এবং "ক্ষুব্ধ" তুল্য মূল্যে সমর্থিত হইতে পারে। তাহা নূতন ব্যবহারের "মর্ম্মন্তুদ" কিংবা "সজ্জ" স্থলে 'সজ্জিত" অন্যান্য ভুলের মত নিশ্চয়ই পরিহার করিতে হইবে ; কিন্তু বাঙ্গলার খাঁটি "কৃষক"কে

তাড়াইলে চলিবে না! প্রায় সর্ব্বত্রই ললিত বাবুর বিচারের সহিত আমার একমত বলিয়া, কেবল যে সকল স্থলে অল্পবিস্তর মতভেদ আছে, সেই সকল স্থলেরই উল্লেখ করিলাম।

আমাদের দেশে আমরা যাহাদের নাম না ধরিয়া "ইনি", "উনি" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, তাঁহাদের জাতিবাচী হইলে অনেক স্থলে "ইনী" প্রত্যয়ই চলিয়া থাকে। যে সকল শব্দ একেবারে বাঙ্গলা হইয়া গিয়াছে, তাহারা বংশগৌরবে এই "ইনী" প্রত্যয়কে উপেক্ষা করিতে পারে না। তবে যেখানে সংস্কৃত হইতে আস্ত একটা শব্দ আনিতে হয়, সেখানে বাঙ্গলা প্রত্যয় ব্যবহার করা চলে না; কিন্তু প্রাচীনরূপ বজায় রাখিতে গেলে যেখানে খট-মট হইয়া উঠে, সেখানে সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দও অপভ্রংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য কিন্নরীর পাশে "অপ্সরী" বেশ শোভা পায়। বালা শব্দটি ওড়িয়াতে "বালী" হইয়া গিয়াছে, যথা—"সে 'চতুরী বালী' সার বাছি নেলা হলদি কালি," চাঁড়াল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "চাঁড়ালনী" করিতেই হইবে। কিন্তু সংস্কৃত করিয়া চণ্ডাল লিখিলে, "চণ্ডালনী" চলিবে না।

বাঙ্গলা ছাড়িয়া যেখানেই আমরা সংস্কৃত ধরিতে চাই, আমরা যে কেবল সেখানে অনেক ভুল করিয়া বসি, তাহাই নয়; ভাষাকেও বেজায় জটিল-কুটিল করিয়া তুলি। ভাষা হইল কেবল ব্যাকরণ লইয়া—শব্দ লইয়া নয়; এবং ব্যাকরণের খাঁটি মূল হইল সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদ। কোন প্রকারেই বাঙ্গলা সর্ব্বনামগুলিকে উহার পিতৃপুরুষদের মত চেহারায় খাড়া করা চলে না, এবং খাঁটি বাঙ্গলা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিতে গেলেও মহা বিভ্রাট্ উপস্থিত হয়। আমরা শুইতেছি, চলিতেছি, খাইতেছি বেশ অবাধে এবং সহজ নিয়মে; কিন্তু শোয়ায় খাওয়ায় যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইয়া শয়ন করেন, কিংবা ভোজন করেন, সেখানে করা, হওয়া প্রভৃতি বাঙ্গলা ক্রিয়াপদ লাগাইয়া কোনরূপে তাঁহারা শব্দগুলিকে দাঁড় করাইয়া রাখেন। বাঙ্গলা যখন স্বতন্ত্র ভাষা, তখন উহার প্রাকৃতিক ক্রিয়াপদ পরিত্যাগ করিলে ভাষাকে খোঁড়া করিতে হইবে। অযথা অতিরিক্ত করা 'হওয়া' দিয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা বড়ই জটিল পন্থা; যথা-সাধ্য ঐ পন্থা ছাড়িতেই হইবে। যেখানে শ্রুতিমধুর করিয়া নামধাতু গড়া চলে, সেখানে সংস্কৃতকে বাঙ্গলা করা যায়। আমি শয়ন, ভোজন প্রভৃতি একেবারে তুলিয়া দিতে বলিতেছি না; কেবল উহার পরিমিত ব্যবহার চাই, এই কথাই বলিয়াছি।

ললিত বাবু যেরূপ ক্ষমতা এবং যোগ্যতা দেখাইয়া আমাদের শব্দসিন্ধু মথিতেছেন, এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার ব্যাকরণ এবং কোষ-গ্রন্থে যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রচলিত প্রয়োগ বুঝাইতেছেন, তাহাতে আমাদের এ কালের উচ্ছৃঙ্খলতা বেশী দিন টিকিবে না, মনে হইতেছে। আমার এ সমালোচনা বহু বিলম্বে হইল; কিন্তু অবস্থার বিচারে নিত্যই যাহার প্রয়োজন, সে কার্য্যে বিলম্বের কথা হয় ত বড় উঠিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সান্দ্রচিত্ত

রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরিয়া সে রাত্রিতে মঞ্জুলা আর বিলম্ব করিল না, একেবারে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। মাতা অলোকা আসিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কোনরূপ অসুখ করিয়াছে ?"

মঞ্জুলা মাথা নাড়িয়া অসুখের কথা অস্বীকার করিল।

"তবে আসিয়াই কেন শুইয়া পড়িলে ?"

"বড় পরিশ্রম হইয়াছে।"

অলোকা বুঝিতে পারিলেন, মঞ্জুলা অধিক কথা বলিতে চাহে না, তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। বলিলেন,—

"মহাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে ?"

"হইয়াছে।"

"ভিক্ষু মুক্ত হইবেন ?"

"দেবী আশা দিয়াছেন।"

"কবে মুক্ত হইবেন ?"

"রাজাধিরাজ ফিরিয়া আসিলে দেবী তাহার নিকট ভিক্ষুদেবের জন্য অনুরোধ করিবেন। রাজাধিরাজ অবশ্যই দেবীর কথা রাখিবেন।"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

"চিত্রা আসিয়া তোমার গা টিপিয়া দিবে ?"

"না, মা; একবার চঞ্চলাকে ডাকিয়া দিও।"

অলোকা উঠিলেন, কি ভাবিয়া পুনরায় বসিলেন বলিলেন—

"তুমি চলিয়া গেলে সোমদত্ত আসিয়াছিলেন তোমার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।"

মঞ্জুলা কোন কথা বলিল না।

"তিনি তোমার জন্য মুক্তা বসান একটি কেয়ূর রাখিয়া গিয়াছেন।"

মঞ্জুলা অতি বিরক্তির সহিত বলিল,—

"মা, আমি তোমাকে একদিন বলিয়াছি, কাহারও কোন উপহার গ্রহণ করিব না।"

অলোকা অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন,—

"তিনি কোন মতেই ছাড়িলেন না, রাখিয়া গিয়াছেন।"

"কালই তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিও।"

"তিনি কি মনে করিবেন ? অসম্মান বোধ করিবেন না ?"

"কেয়ূর গ্রহণ করিলে আমাদের সম্মান বাড়িবে ?"

"হয়ত তিনি আর এখানে আসিবেন না।"

"মা আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি।"

অলোকা কন্যাকে চিনিতেন, সোমদত্তের কথা ছাড়িয়া দিলেন, কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—

"তাহার পর অসঙ্গ সেন আসিয়াছিলেন।"

মঞ্জুলা মুখ উঁচু করিয়া চাহিল।

"প্রমীত সেনের বন্ধু অসঙ্গ সেন ?—কেন আসিয়াছিলেন ? কিছু বলিলেন ?"

"তাঁহাদের ভারী বিপদ। প্রমীত সেন আজও ফিরিয়া আসেন নাই। শুনা যায়, তাঁহারও দণ্ড হইবে। তাঁহার স্ত্রী চিন্তায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসঙ্গ সেন আরও অনেক কথা বলিলেন।"

মঞ্জুলা শয্যায় উঠিয়া বসিল, একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল ;—

"দেবীকে তাঁহার কথাও বলিয়াছি।"

"কোন ফল হয় নাই ?"

"দেবী অভয় দিয়াছেন, প্রমীতসেন মহাশয় রাত্রি প্রভাতে মুক্ত হইবেন। কিন্তু—"

"কি মঞ্জুলা ?"

মঞ্জুলার মুখ আরক্ত হইল। মঞ্জুলা বলিল ;—

"কোন দিন তাঁহার সহিত পরিচয় নাই ; এক দিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার জন্য অনুরোধ করাতে দেবী যেন কেমন বিস্মিত হইলেন।"

"বটে ? এক কথা, সেদিন তিনি অমন বিপদ হইতে তোমাকে রক্ষা করিলেন, কত কষ্টে শিবিকা সংগ্রহ করিয়া তোমাকে গৃহে পাঠাইলেন ; কিন্তু তুমি একটী দিনও তাঁহাকে গৃহে আমন্ত্রণ কর নাই ! অমন উপকারীর সঙ্গে আর একটী দিন ও দেখা কর নাই ! তিনি কি মনে করিতেছেন ?"

"সে দিনের কথা কি, মা, তুমি কাহাকেও বলিয়াছ ?

"না··· তুমি ত নিষেধ করিয়াছিলে।"

"সে ঘটনা কাহাকেও জানাইও না। কয়েকটা দিন যাক্, তাঁহাকে একবার সংবাদ দিব।—তিনি আসিবেন কি ?"

"কেন আসিবেন না ?"

"কি করিয়া বলিব ?"

"সংবাদ পাইলে তিনি অবশ্যই আসিবেন। আজ তোমার শরীর অসুস্থ ; আমি এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।"

অলোকা সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

প্রমীত সেনের বন্ধু অসঙ্গ সেন কোন কোন দিন মঞ্জুলার গৃহে আসিয়া থাকেন। তিনি অবশ্যই মঞ্জুলার কথা তাঁহার নিকট বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রমীত সেন ত মঞ্জুলার গৃহে আসেন নাই। মঞ্জুলার নাম নগরে সম্ভ্রান্ত-সমাজে একেবারে অপরিচিত নহে। মঞ্জুলা প্রসিদ্ধ গায়িকা, ব্যবসায়ী গায়িকা নহে। পরিচিত সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রী-গৃহে সাদর আমন্ত্রণে মঞ্জুলা কখনো কখনো গীত শুনাইয়া থাকে। কোন কোন বিশেষ দিনে তাহার নিজগৃহে সমাগত আত্মীয় সুহৃদ্ বন্ধু-বান্ধবকে মঞ্জুলা গীতবাদ্যে আপ্যায়িত করিত। মঞ্জুলা ধনশালিনী, অপূর্ব্ব রূপবতী, বিদূষী যুবতী। তাহার সঙ্গে দেখা এবং বাক্যালাপের জন্য নগরের ধনী মানী বিদ্বান্ অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু প্রমীত সেন ত কোন দিন তার গৃহে যান নাই !

শয্যায় শুইয়া পড়িয়া মঞ্জুলা ভাবিতে লাগিল, আসিবেন কি ? তাঁহার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ? কিছু না !

চঞ্চলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া মঞ্জুলার পায়ের কাছে বসিল এবং ধীরে ধীরে তাহার পা টিপিয়া দিতে লাগিল। মঞ্জুলাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন, আজ তোমার কি হইয়াছে ?"

"কিছুই ত হয় নাই।"

"রাজপুরী হইতে আসিবার সময় তুমি একটী কথাও বল নাই, ঘরে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছ, তোমার সে স্ফূর্ত্তি নাই। ঠাকরুণ বলিলেন, তোমার অসুখ হইয়াছে।"

"অসুখ কিছুই না, পরিশ্রমে গা-টা অলস বোধ হইতেছে।"

"ভাল, তুমি বলিলে, দেবী ভরসা দিয়াছেন, ভিক্ষু মুক্তি পাইবেন। প্রমীত সেন মহাশয়ের কি হইবে ?"

"তাঁহার জন্যও কি আমরা ভাবিব ? তিনি আমাদের কে ?"

"তোমার কেহ নহেন, কিন্তু তিনি দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের আশ্রয়। তুমি কোন দিন তাঁহাকে দেখ নাই, কিন্তু নগরের দীন দরিদ্র, অন্ধ আতুর সকলে তাঁহাকে চিনে। পরের জন্য প্রাণ দিতে যাইয়া এমন লোকের প্রাণদণ্ড হইবে ?"

ক্ষণকালের জন্য মঞ্জুলা নীরব হইয়া রহিল, শেষে বলিল,—

"এমন পুণ্যাত্মাকে দেবতা রক্ষা করিবেন। আচ্ছা, আজ দেবীর সঙ্গে যে যে কথা হইল, তুই কি তাহা শুনিতে পাস্ নাই ?"

"আমি কেমন করিয়া শুনিব ? আমি ত কক্ষের বাহিরে ছিলাম।"

"চঞ্চল, প্রমীত সেন মহাশয়ের গৃহসংসারের কথা তুই কিছু জানিস্ ? তাঁহার স্ত্রীকে তুই দেখিয়াছিস্ ?"

"প্রমীত সেন মহাশয়ের স্ত্রী উৎপলা দেবীর পিত্রালয় আমাদের গ্রামের নিকট। ছেলেবেলায় অনেকবার তাঁহাকে দেখিয়াছি! তাঁহার বিবাহের পরও তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

"দেখিতে কেমন ?"

"পরমা সুন্দরী, অমন সুন্দরী আমার চক্ষে—"

"কি বল্‌লি ?"

"অমন সুন্দরী আমি কমই দেখিয়াছি।"

"তবে অমন সুন্দরী আরও দেখিয়াছিস্!"

চঞ্চলা হাসিয়া বলিল,—"প্রতিদিনই দেখি।"

"প্রতিদিনই দেখিস ? তবে ত অমন সুন্দরী বড় দুর্লভ!—তোষামোদ রাখ্। কত বয়স ?"

"তোমার চেয়ে দু এক বৎসর বড় হইতে পারেন।"

"ভালবাসা কেমন ?"

"অতি বেশী।"

"অতি বেশী কিরে ?"

"বন্ধন বড়ই দৃঢ়। গণ্ডীর বাহিরে এক পা বাড়াইবার সাধ্য প্রমীত সেন মহাশয়ের নাই। এত লোক তোমার এখানে আসেন, তিনি ত কোনদিন আসেন নাই!"

"কেন আসেন না, কি করিয়া জানিব ?"

"তুমি জান না, আমরা জানি।"

"কি জানিস্ ?"

"দৃঢ় বন্ধন। উৎপলা দেবীর অনুমতি না পাইলে তাঁহার এক পা চলা কঠিন।"

"এখানে আসিতে কিসের ভয় ?"

"সন্দেহের নিকট কোন্ স্থান নিরাপদ ?"

"কিসের সন্দেহ ?"

"বলিব ?—তোমার রূপগুণের খ্যাতি

নগরময় রাষ্ট্র ; বোধ করি, উৎপলা দেবীও তাহা শুনিয়াছেন ; তাই তাঁহার ভয়—"

"দূর্, অভাগী ! তবে উৎপলা দেবী ভাল বাসে না। ভাল বাসিলে কি সন্দেহ আসিতে পারে ?"

"তুমি তা কি করিয়া জানিবে ? তুমি ত কোন দিন ভালবাস নাই ?"

'বেশ আছি , পরের অধীন হইব ?"

' উৎপলা দেবী কি পরের অধীন ?"

"তাঁহার মত দিবারাত্রি সন্দেহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব ?"

"তা উৎপলা দেবীর বাড়াবাড়ি বড় বেশী।"

"ছেলে মেয়ে ক'টি ?"

"তাঁহার সন্তান হয় নাই।"

"সন্তান হয় নাই ?"

"না। তাঁহার সুখের রাজ্যে সেই এক অভাব।"

"এ অভাবে কার দুঃখ অধিক ?— স্বামীর, না স্ত্রীর ?"

"আশা আছে, সুতরাং দুঃখের অবস্থা এখনো আসে নাই। কিন্তু উৎপলা দেবীর চিত্তে চিন্তার ছায়া দেখা দিয়াছে।"

"তা বুঝিলি কিসে ?"

"যাগ যজ্ঞ পূজা বলির বাহুল্য হইয়াছে। শুনিয়াছি, কাশী হইতে এক মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সিদ্ধ মাদুলী গোপনে আনান হইয়াছে !"

"তুই এত কথা কেমন করিয়া জানিস্ ?"

"ও পাড়ায় আমার জানা শুনা লোক আছে, তাহাদের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছি।"

"কি কি কথা ?"

"সে অনেক কথা, আর একদিন বলিব। অনেক রাত হইল, তুমি আহার করিবে না ? আমি এখন যাই, তাহার ব্যবস্থা করি গিয়া।"

চঞ্চলা সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। মঞ্জুলা পুনর্বার শয্যায় শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, আসিবেন কি ? আমি যে কে, তাহা ত তিনি জানেন না! উপকৃতার আমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করিবেন ? তখন সেইঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগময় রাত্রিকালে অস্পষ্টালোকে দৃষ্ট প্রমীতসেনের তেজোময় দীপ্ত চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট, বলশালী শৌর্যলাবণ্যময় বাহু এবং বিশাল বক্ষের চিত্র বারংবার মঞ্জুলার চিত্তপটে উদিত হইতে লাগিল।

আর, দেবী আজ এ কি কথা বলিলেন ?— বালিকা নও, ভিক্ষুণী নও, সংসারী হও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রমীতের মুক্তি।

ধর্ম্মপাল মহাশয় প্রমীত সেনকে চিনিতেন সামান্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে প্রমীত সেন অতি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। কিন্তু ভিক্ষুর অপরাধ অতি গুরুতর, প্রমীত সেনও তাহাতে সংস্পৃষ্ট। বিশেষতঃ রাজাধিরাজ স্বয়ং বিচার করিবেন,বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় অনেক ইতস্ততের পর প্রমীত সেনকে গৃহে ফিরিবার অনুমতি ধর্ম্মপাল দেন নাই। কিন্তু প্রমীত সেন রাজাধিরাজের অনুগৃহীত, ধর্ম্মপাল তাহা জানিতেন। সেইজন্যই তাঁহাকে রীতিমত কারারুদ্ধ হইতে হয় নাই। কারাগারের যে অংশে কারাধ্যক্ষের বাস, প্রমীত সেন দুই দিন সসম্মানে সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

তৃতীয় দিন প্রভাতে কারাধ্যক্ষ প্রমীত সেনকে বলিলেন,—

"আপনার মুক্তির আদেশ আসিয়াছে, আপনি যথাস্থানে যাইতে পারেন।"

প্রমীত সেন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন ;—

"রাজাধিরাজ মৃগয়া হইতে ফিরিয়াছেন কি ?"

"না।"

"তবে বিচারের পূর্ব্বে কেমন করিয়া আমার মুক্তিলাভ হইল ?"

"তাহা আমি জানি না। আমি আদেশ পাইয়াছি, আপনি স্বচ্ছন্দে গৃহে যাইতে পারেন।"

"কাহার আদেশে মুক্তি পাইলাম ?"

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের আদেশে।"

প্রমীত সেন আরও বিস্মিত হইলেন। অনেক অনুরোধেও প্রথম দিন ধর্ম্মপাল মহাশয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন নাই; রাজাধিরাজও নগরে ফিরিয়া আসেন নাই; তবে কেমন করিয়া কাহার অনুরোধে এই অকস্মাৎ মুক্তি ?

কারাধ্যক্ষ হাসিয়া বলিলেন—

"গৃহে ফিরিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে নাকি ?"

"আপনার অনুগ্রহে এরূপ কারাবাসে আমার কোন কষ্ট হয় নাই; তবে গৃহে ফিরিয়া যাইতে কাহার সাধ না হয় ? আমার মুক্তির আদেশ কখন আসিয়াছে ?"

"রাত্রি-শেষে।"

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের আদেশ ?"

"হাঁ।"

"রহস্য কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি ?"

"না।"

"ভিক্ষু মহাশয়েরও মুক্তির আদেশ আসিয়াছে ?"

"না, তেমন কোন আদেশ পাই নাই।"

"তিনি কি অবস্থায় আছেন ?"

"নিভৃত কারাগারে।"

"তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে পারি ?"

"ক্ষমা করিবেন। সেখানে অন্য লোকের যাওয়া নিষেধ, নাস্তিক বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণগণের সম্বন্ধে রাজাধিরাজের নির্ম্মম শাসন। সহজে তাহাদের অব্যাহতি নাই,—আপনি তাহা জানেন।"

"তাঁহাকে রক্ষার কি উপায় ?"

"দেবতার অনুগ্রহ।"

"দেবতা প্রসন্ন হউন; ভিক্ষু নিরপরাধী। তিনি যেন মুক্তি লাভ করেন।"

প্রমীত সেন বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন বেলা হইয়াছে। রাজ-পথে লোক-চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। প্রমীত সেন কতকদূর অগ্রসর হইলে, ভিক্ষুকবেশধারী এক-জন লোকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। লোকটী ভিখারী বটে, সম্ভবতঃ অন্ধ,—যষ্টি অবলম্বনে ধীরে ধীরে পথ নির্ণয় করিয়া চলিতেছিল। প্রমীতের পদশব্দ পাইয়া বলিল ;—

"মহাশয়, কুমুদনিবাস কতদূর ?"

প্রমীত বলিলেন—

"অনেক দূর। তুমি সেখানে যাইবে ?"

"হাঁ।"

"তুমি কি অন্ধ ? চোখে দেখিতে পাও না ?"

"দৃষ্টি প্রায় নাই।"

"সেখানে তোমার আত্মীয়, আপনা কেহ আছে ?"

"সংসারে এক ভগ্নী ব্যতীত আমার আর কেহ নাই ; কিন্তু দুই জনের অন্নের সংস্থান নাই। শুনিয়াছি, কুমুদনিবাসে প্রমীত সেন মহাশয় আছেন।"

"প্রমীত সেনের নিকট কেন যাইতেছ ?"

"আপনি এই নগরে বাস করেন ?"

"হাঁ, এই নগরেই আমার বাস।"

"তবে কি আপনি জানেন না যে, প্রমীত সেন দীন-দরিদ্রের বন্ধু। আমি ত বহুদূর হইতে তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

প্রমীত সেনের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"তুমি এ নগরে এই নূতন আসিয়াছ ?"

"গত সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়াছি।"

"রাত্রিকালে কোথায় ছিলে ?"

"পথের নিকটেই এক গাছের তলায়।"

"প্রমীত সেনের নাম কোথায় শুনিলে ?"

"গ্রামে থাকিতেই শুনিয়াছি।"

"তোমার কি নাম ?"

"বাদল।"

"তোমাদের গ্রাম কতদুর ?"

"তিন দিনে আমি সেখান হইতে আসিয়াছি ; আমি চোখে ভাল দেখিতে পাই না।"

"আমার সঙ্গে চল, আমি সেই দিকেই যাইতেছি।"

প্রমীত ধীরে ধীরে চলিলেন। ভিখারী তাঁহার পদশব্দানুসরণ করিয়া চলিল।

কিছু দূর চলিতেই প্রমীত দেখিতে পাইলেন, অশ্বারোহণে সোমদত্ত সেই দিকেই আসিতেছেন। রাজধানীতে সোমদত্ত একজন প্রসিদ্ধ লোক। ধনী মানী বিলাসী সমাজে তাঁহার বিশেষ নাম। অমন সৌখীন, অমন ব্যয়ী লোক নগরে আর ছিল না। কিন্তু অতিব্যয়ে পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত প্রভূত সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল ; তথাপি ব্যয়ের লাঘব ছিল না। কেহ কেহ বলিত, দ্যূতগৃহে উপার্জ্জিত অর্থসাহায্যে সোমদত্ত এখন ব্যয়-লালসা চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রমীতের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। প্রমীত বলিলেন—

"নমস্কার, মহাশয়, এত সকালে কোথায় যাইতেছেন ?"

"সে কি। আপনি যে ! কখন মুক্ত হইলেন ?"

"এই কিছু কাল হইল।"

"রাজাধিরাজ ত এখনো নগরে ফিরেন নাই। কেমন করিয়া আপনার মুক্তিলাভ হইল ?"

"আমিও তাহা জানিতে পারি নাই। অবশ্যই কেহ আমার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া থাকিবেন।"

"কে ?"

"বলিতে পারি না।"

"আপনার মুক্তিতে নগরবাসী সকলেই আনন্দিত হইবে। ভিক্ষু উপগুপ্তও মুক্তিলাভ করিয়াছেন ?"

"না, এখনো সেরূপ কোন আদেশ হয় নাই। আপনি কোথায় যাইতেছেন ?"

"গ্রামে, বিশেষ প্রয়োজনে যাইতেছি। ক্ষমা করিবেন ; আপনার সঙ্গে কুমুদনিবাসে

যাইয়া আনন্দোৎসব করিতে পারিলাম না। শীঘ্রই দেখা হইবে।”

পরস্পর বিদায়সূচক অভিবাদন করিয়া যে যাঁহার গন্তব্য পথে চলিলেন। নগরে সকলেই প্রমীত সেনকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার মুক্তিতে সোমদত্ত যে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কে এমন অনুরোধ করিল! প্রথম দিনেই ত বহুলোকে ধর্ম্মপালকে ধরিয়াছিল, তিনি কাহারও কথা রাখেন নাই। তখন সোমদত্তের মনে পড়িল, গত পরশ্ব মৃগয়া যাত্রার দিনেই ত ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং প্রমীতসেন কারাগারে নীত হইয়াছিলেন। তাহার পরদিন—গত কল্যই ত তিনি মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কমলপুরে গিয়াছিলেন। দেখা হয় নাই, মঞ্জুলা রাজ্ঞী কারুবকীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। মঞ্জুলাই কি দেবীকে অনুরোধ করিয়াছিল? যাহার তাহার কথায় ধর্ম্মপাল কখনই প্রমীত সেনকে ছাড়িয়া দেন নাই। সোমদত্ত পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন, মঞ্জুলাই কি রাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল? রাজ্ঞীই কি ধর্ম্মপালকে বলিয়া দিয়াছেন? মঞ্জুলা কি প্রমীত সেনকে চিনে? কবে, কোথায় দেখা হইল? প্রমীত ত কোন দিন মঞ্জুলার গৃহে যান নাই। মঞ্জুলা কেয়ূর ফিরাইয়া দিয়াছে, উপহার গ্রহণ করে নাই। সোমদত্তের চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি অশ্ব চালাইয়া গ্রামাভিমুখে দ্রুতবেগে চলিলেন।

এদিকে প্রমীত সেনও কুমুদনিবাসে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। আত্মীয় কুটুম্ব দাস দাসী পরিজনবর্গের আনন্দ-কোলাহলে, হুলুধ্বনি ও মঙ্গল শঙ্খরবে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। কি সুযোগে, কি উপায়ে, কাহার অনুরোধে তাঁহার মুক্তিলাভ হইল, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল, কিন্তু তাহার মীমাংসা হইল না। প্রমীত অন্তঃপুরে পৌঁছিলে উৎপলা সহর্ষ-গদগদ-নেত্রে স্বামীকে প্রণাম করিয়া এবং আলিঙ্গিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“কি উপায়ে আসিলে?”

“তোমার পুণ্যবলে!”

“আমার পুণ্যবল ত আছেই, নতুবা তোমার দাসী হইতে পারিয়াছি কেমন করিয়া?”

“দাসী? আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গলময়ী দেবী তুমি! আজ কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, সে কি বড় বেশী কথা?”

“তুমি কি বলিতেছ?”

“বলিতেছি—সুকৃতিবলে যদি কোন দিন স্বর্গবাসের অনুমতি পাইয়া প্রবেশপথেও উপস্থিত হই, আর তোমার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি আমাকে ইঙ্গিত করে, আমি স্বর্গবাস তুচ্ছ করিয়া তোমার কাছে ফিরিয়া আসি! তুমি যে শত স্বর্গ হইতেও আমার প্রিয়; আর এমনই তোমার শক্তি!”

কম্পিত-কলেবরা উৎপলার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। একান্ত নির্ভরে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন;—

“মাধবী, জল আন্, পা ধুইয়া দিব। কাপড় আন্, পাখা আন্। মালতীকে ডাক্, পূজার ঘরে ষোড়শ উপচারের আয়োজন করিতে হইবে।”

অন্ধ বাদল প্রমীতের সঙ্গে সঙ্গেই সেই

পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সে কতকক্ষণ বিস্মিত হত-বুদ্ধি হইয়া রহিল ; শেষে একজন দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"এ কাহার বাড়ী ?"

"কাহার বাড়ী তুমি জান না ?"

"না। আমি আজ এই প্রথম নগরে আসিয়াছি।"

"তুমি কোন্ বাড়ী খুঁজিতেছ ?"

"প্রমীত সেন মহাশয়ের বাড়ী।"

"তুমি কি অন্ধ ?"

"প্রায় অন্ধই বটে, দৃষ্টি খুব কম।"

"বধির ?"

"না।"

"এই ত প্রমীতসেন মহাশয়ের বাড়ী !"

"এই বাড়ী ! তিনি কোথায় ?"

"এই মাত্র অন্তঃপুরে গেলেন।"

"অন্ধ আতুরে কি তাঁহার দেখা পায় ?"

"তোমাকে ত তাঁহার সঙ্গেই আসিতে দেখিয়াছি !"

"তিনি প্রমীত সেন ?"

"হাঁ, তিনিই ত হাত ধরিয়া তোমাকে এখানে আনিয়া বসাইয়াছেন !"

বাদলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মস্তক নত করিয়া বাদল ভূমিতে প্রণাম করিল। যে প্রমীত সেনের নাম শুনিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর নগরে যাত্রা করিয়াছিল, তিনি স্বয়ং পথ দেখাইয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে নিজ গৃহে আনিয়াছেন !

কিছুকাল পরেই ভৃত্য দারুক আসিয়া বাদলকে ভিতরে লইয়া গেল এবং তাহার স্নান পরিধান, আহার অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিল। [ক্রমশ।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

কলিকাতা কায়স্থ-প্রধান স্থান হইলেও স্থানীয় আদিমবাসীদিগের বিবরণে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ইংরাজের ব্যবসায়-সূত্রে স্থানীয় তন্তুবায়-সমাজই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় প্রাধান্য লাভ করেন। ইংরাজ বণিক্‌গণের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ ইঁহারাই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ দেশের প্রস্তুত সূতার ক্রয়-বিক্রয় সূত্রেই ব্যবসায় হিসাবে বঙ্গের নানাস্থানের তন্তুবায়-পরিবার পল্লীবাস উঠাইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন ; সে আজ দেড়শত বৎসরের কথা। এই দেড় শত বৎসরে কলিকাতা তন্তুবায়-প্রধান স্থান হইয়া উঠে, এবং এখনও এই কলিকাতা রাজধানীর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রাধান্যের মাঝখানেও শিক্ষা, সম্পদ, পদমর্য্যাদা হিসাবে ইঁহাদের স্থান প্রধান জাতি সকলের মধ্যে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে।

খৃঃ ১৮৩৮ অব্দে কলিকাতায় হরীতকী-বাগানে স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ শীল জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ের ছাত্র-মণ্ডলী মধ্যে মহেন্দ্রনাথ প্রধানগণের অন্যতম ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এম্ এ, ও বি-এল্ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণীরূপে মহেন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি, অধুনা লোকান্তরিত চন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়গণের সমসাময়িক ও ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সতীর্থ; বিদ্যাবত্তায় ও আচার-আচরণে তিনি কোম্‌টের শিষ্য ছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিচারকগণের নিকট তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্র-বিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পায়। সে সময়ের উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ তাঁহাকে দার্শনিক ব্যবহারজীব (Philosopher Pleader) বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। তাহার অনেকগুলি কারণও বর্ত্তমান ছিল; তিনি যে কেবল ইংরাজী-সাহিত্যে উত্তম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, ফরাসি, জার্ম্মান্ ও আরও কোন কোন পাশ্চাত্য-ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। এরূপ বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞতার কারণ এই যে, তিনি অতিশয় জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন। ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেও তিনি কখনই যে সে মাম্‌লা গ্রহণ করিতেন না। আদালতের ন্যায়-বিচারে যাহা টিকিবে, কেবল সেইগুলি লইতেন। উকীল বলিয়া নিজের বুদ্ধিবলে বিচারালয়ে “হয় কে নয়” ও “নয় কে হয়” করিতে কখনও প্রয়াস পাইতেন না; এজন্য বিচারকগণ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একদা আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, এত অল্প বয়সে মহেন্দ্রনাথের জীবনলীলা শেষ হওয়াতে দেশের আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে আইনের মর্য্যাদা-জ্ঞান অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু এক আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। যে মহাত্মার কেবল ৩২ বৎসর বয়সের সময়ে এরূপ উচ্চ প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হইয়াছিল, জানি না, তিনি দীর্ঘজীবী হইলে, বঙ্গদেশ কতই না অমৃতফলের অধিকারী হইত।

ব্রজেন্দ্রনাথ এমনই উচ্চ-স্বভাব-সম্পন্ন পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নয় বৎসর বয়সে সাত বৎসর বয়সের কনিষ্ঠ সহোদর ব্রজেন্দ্রনাথকে লইয়া পিতৃহীন হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইঁহাদের জননীর লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এক্ষণে এই উভয় ভ্রাতা মায়ের এক স্বজাতীয়া পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মায়ের ‘পরিচারিকা’ কথাটা ব্যবহার করা অন্যায় হইল; এই মহিলাই জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা মায়ের স্থান অধিকার করিয়া বালকদ্বয়ের বাল্য-সুখ-সুবিধা ও আরাম-বিরামের এক মাত্র অবলম্বন হইয়া রহিলেন। এই বৃদ্ধা আজিও জীবিত থাকিয়া গৃহের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ত্তমান।

মাতুলালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক দুই ভ্রাতার লেখাপড়া চলিতে লাগিল। সেখানে অবস্থানকালে, ইঁহাদের ক্লেশে দিনপাত ও বিদ্যার্জ্জন করিতে হইত। অবশ্য সে অসুবিধার জন্য কাহাকেও কোন দোষ দিবার কারণ ঘটে নাই, সে বাটীর তখনকার সাংসারিক অবস্থা-নিবন্ধনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন, “ছোট ভাইটিকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্যই সেই অল্পবয়সে আমাকে বাধ্য হইয়া সজ্জনের পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; আমি বেশ জানিতাম যে, আমার

আচার-আচরণ ও ব্যবহার-দোষে ছোট ভাইটির অনিষ্ট হইতে পারে।" আশ্চর্য্য, একজনকে বাচাইতে ও 'মানুষ' করিতে আর একজন—কেবলমাত্র দুই বৎসরের বড় বালক—আত্ম-সংযম ও আত্মরক্ষার পথে ধীর ও স্থির পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দুটি ভাই, উভয়ে উভয়ের সখা, সুহৃদ্, মা-বাপ হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুঃখদারিদ্র্য ও অসুবিধা নিবারণ জন্য বড় ভাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু উপাধিলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া চাকরি গ্রহণ করিলেন, বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন করিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স্, এল্.এ ও বি-এ পরীক্ষাগুলি এক এক করিয়া শেষ করিলেন। এম্.এ পরীক্ষার সময়ে অধুনা লোকান্তরিত গৌরী-শঙ্কর ও অসাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত হেষ্টি সাহেবের মধ্যে ছাত্র ব্রজেন্দ্রনাথকে লইয়া একটু ছোটখাট বিবাদ বাধিয়া গেল। গৌরী শঙ্করের ইচ্ছা—ব্রজেন্দ্রনাথ গণিতশাস্ত্রে এম্.এ পরীক্ষা দেন, হেষ্টির ইচ্ছা· ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শন-শাস্ত্রে এম্.এ পরীক্ষা দেন। এই ছাত্র যুদ্ধে শেষে হেষ্টি সাহেবেরই জয় হয়, গৌরী-শঙ্করের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তবে উত্তরকালে ব্রজেন্দ্রনাথ, গৌরীশঙ্কর ও হেষ্টি সাহেব উভয়েরই যে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই গৌরবের বিষয়। তাঁহার গণিতের গবেষণা দর্শনশাস্ত্র হইতে কোন অংশে অল্প নহে; গৌরীশঙ্কর এই আনন্দ সম্ভোগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয়ে চতুর্থ-শ্রেণীর বালক, তখনই তিনি বীজগণিত (Algebra) ও জ্যামিতি অধ্যয়নে উচ্চ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বীজগণিতের বাইনোমিয়াল্ থিয়োরেম্ ও সংখ্যাতত্ত্ব (Theory of Numbers) শিখিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে এই সকল উচ্চ গণিত-তত্ত্বের আলোচনায় অসামান্য দক্ষতা-দর্শনে গৌরীশঙ্কর বালকের উচ্চ পরীক্ষাদানের সময়ের অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। আর জেনারেল এসেম্বিলীর অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবও আর একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় বালক ব্রজেন্দ্রনাথের উপর নিয়ত স্নেহ-দৃষ্টি রাখিতেন। সে ঘটনাটি এই:—একদা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে, ব্রজেন্দ্র-নাথ অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের নিকট পাঠের জন্য তর্কশাস্ত্রের একখানি অতি কঠিন পুস্তক চাহিয়া বসিলেন। সাহেবশিক্ষক সে পুস্তক দুর্ব্বোধ্য বলিয়া দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ছাত্রের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া পুস্তক দিয়া বলিয়াছিলেন, "নাও, কিন্তু কিছুই বুঝিবে না।" ছাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ তৃতীয় কি চতুর্থ দিবসে পুস্তক ফিরাইয়া দিবার সময়ে শিক্ষক বলেন, "কেমন, যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ঠিক ত?" ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি।" শিক্ষকসাহেব দর্শন-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি বালক ব্রজেন্দ্রনাথের এই উত্তর শুনিয়া অসম্ভববোধে একটু অপ্রস্তুত হইয়া, পুস্তকান্তর্গত বহু তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া উপযুক্ত উত্তর পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া অপরিমেয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই ব্রজেন্দ্রনাথকে লইয়া

গৌরীশঙ্করে ও সাহেব অধ্যক্ষে ছাত্রযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এরূপ দ্বন্দ্ব যে ছাত্রের পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এরূপ ঘটনা ঘটেও অল্প।

ব্রজেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের বিবরণ আমাদের দেশে অধুনা লোক-বিরল ঘটনা বলিয়া মনে হয়। বিশ্বসংসারের সকল বিভাগের জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ একাধারে একটি মানুষে মেলে ইহা কল্পনা করা সহজ হইতে পারে; কিন্তু কোন দিন কোন কালে সহজসাধ্য বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগৃহীত হয় নাই। জগতের জ্ঞানচর্চ্চাপ্রিয় বিদ্বজ্জন-সমাজেও ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায় অসামান্য পণ্ডিত ও মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি বিরল বলিয়া মনে হয় এ বিষয়ে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠক মণ্ডলীর কৌতূহল কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, তাই আমরা অতি অল্প কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। নিম্নলিখিত ঘটনার অনেকগুলিই আমাদের বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের যে গ্রন্থে জগদ্ব্যাপী যশোপার্জ্জন, সেই গ্রন্থের মূল উপকরণগুলির অধিকাংশ ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণাজাত সংগ্রহের ফল। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক সংবাদ, তথ্য ও মীমাংসা, ব্রজেন্দ্রনাথের করতলগত আমলকের ন্যায় বিরাজ করে। ইঁহার পাঠ শক্তি এত অল্পবয়সে এরূপ অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল যে, ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময়ের মধ্যে ইংরাজী গদ্য-সাহিত্য পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। এল্‌ এ পরীক্ষার পাঠ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের পদ্যাংশ কাব্য-গ্রন্থ সকল শেষ করেন। কোন্ গ্রন্থে কি কি বিষয়ের আলোচনা আছে, সে সকলের উদ্দেশ্য ও মীমাংসা সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। কোন্ বিষয়ের আলোচনা সম্বন্ধে কোন্ কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে, সে বিষয় পরামর্শ-প্রার্থীকে তৎক্ষণাৎ গ্রন্থ ও গ্রন্থাংশ এক এক করিয়া বলিয়া দেন, সে বিষয়ে একটুও ভাবিবার প্রয়োজন হয় না।

পল্লব-গ্রাহিতা দোষে, দীর্ঘকাল হইতে এ দেশের শিক্ষিত-সমাজ হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কোনও বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করিলেই, তিনি পণ্ডিত-পদ-বাচ্য হইয়া উঠেন। তাই আজ কাল অনেক উপাধি-শোভিত বিদ্যাশূন্য ব্যক্তির স্বাধীন বিচরণ সহজ হইয়াছে। এমন দিনে একটি বহুবিদ্যার, প্রভূত জ্ঞানের ও সারতত্ত্বের উপাসক দেখিলে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। বঙ্গজননীর তপস্যার ফলে, ভারতের ভাগ্যবলে আমরা ব্রজেন্দ্রনাথে সেই উচ্চ আদর্শের আভাস পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ব্রজেন্দ্রনাথ একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক।

অধ্যাপক মহালানবিশ শারীরতত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্যক্তি। একদা তিনি দার্জ্জিলিং যাত্রা কালে কুচবিহার যাত্রী অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত শিয়ালদহ হইতে একত্র এক গাড়ীতে যাত্রা করেন। প্রফেসর মহালানবিশ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে শারীর তত্ত্বের মূল বিষয়গুলি অবশ্যই উচ্চ দার্শনিকের জানা আবশ্যক; কিন্তু যে সকল খুঁটিনাটি সংবাদ কেবল শারীর-তত্ত্ববিদেরই জানা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়, অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্র নাথ সেগুলিরও পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিয়া

থাকেন। এটা তাঁহার পক্ষে অসামান্য গুণপণার পরিচয় বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। এরূপ পূর্ণাঙ্গ সংবাদ সংগ্রহ অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমরা ব্রজেন্দ্রনাথকে সিটী-কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে আসীন দেখিতে পাই। তিনি তথা হইতে মধ্য-প্রদেশের নাগপুর মরিস কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। সেখান হইতে তিনি পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-নাথ কলেজে অধ্যক্ষ হইয়া স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। তৎপরে মহারাজ কুচবিহারাধি-পতি-প্রতিষ্ঠিত কলেজে অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিয়া এতাবৎকাল কার্য্য করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ নামীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে ব্রতী হইলেন।

বহরমপুরে অবস্থানকালে স্থানীয় পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়ের নিকট ব্রজেন্দ্র-নাথ উচ্চ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র-শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই পণ্ডিত মহাশয়কে আমরা দেখিয়াছি। ইনি ভারতবিখ্যাত কাশীপ্রবাসী অসামান্য পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন; আর সে সময়ে কাশীপ্রবাসী বঙ্গীয় পণ্ডিতকুলের শিরোভূষণ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয় বলিয়াছেন,—"ছাত্র অনেক দেখিয়াছি ও পড়াইয়াছি, কিন্তু ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ও ছাত্রের নিকট পদে পদে ভ্রম-সংশোধনের প্রয়োজন ইতিপূর্ব্বে আর কখন ঘটে নাই। ব্রজেন্দ্রনাথকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি ও তজ্জাত শ্লাঘাই আমার পরম পুরস্কার।" অধুনা-স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে অতি আগ্রহের সহিত বেদবিষয়ে ও উপনিষদের অতি উচ্চ-তত্ত্ব সকলের আলোচনায় ব্রজেন্দ্রবাবুর গৃহে নিবিষ্টচিত্তে নিরত দেখিয়াছি। বেদপাঠের শিক্ষা স্বতন্ত্র। আমরা ভাগ্যবশে সময়ে সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে বেদপাঠ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু বলিতে কি, ব্রজেন্দ্রবাবুর মন্ত্রোচ্চারণ ও পাঠ-সৌন্দর্য্য এতই হৃদয়কে মাতাইয়া তুলে, সে পাঠের স্বরলহরী এতই মত্ততা আনয়ন করে, যে, তাহা না শুনিলে, বর্ণনায় ব্যাখ্যাত হইবে না। কেহ যদি কোন সুযোগে তাঁহার বেদপাঠ শ্রবণের ব্যবস্থা করিতে ও দশজনকে শুনাইতে পারেন, তাহা হইলেই কেবল আমাদের এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইঁহাকে বিদ্যার জাহাজ বলিলে, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ পায় না; সাগর বলিলেও, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ পাইল বলিয়া অনুভব করি না। দৈবক্রমে বিদ্যার একটা অনন্ত পারাবারের সম্মুখে পড়িয়াছি বলিয়া অনুভব করিলেই, যেন ঠিক মনের ভাব প্রকাশ পাইল বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানের অনন্ত পারাবার কেন বলি, তাহা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। ব্রজেন্দ্রনাথ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেও তিনি বোডলিয়ান লাইব্রেরী (Bodleian Library) মাত্র নহেন, তিনি বিদ্যা ও জ্ঞানের রত্নাকর। পাকা ডুবুরিরা রত্নাকরে রত্নলাভ করে, সমুদ্রবারিই

মানব-সংসারের ধনধান্য বৃদ্ধির হেতুরূপে বর্ত্তমান। ব্রজেন্দ্রনাথও বহু বহু বিদ্বান্ ব্যক্তির জ্ঞান-ভাণ্ডার নিত্য পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। তিনি বিদ্যাবিতরণে কল্পতরু। আর তাঁহার জ্ঞানালোচনার পদ্ধতি তাঁহার ব্যক্তিগত উচ্চ জ্ঞানের পোষণকার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত, এই বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান সঞ্চয়ের ফলে তিনি নিজে পরিপুষ্ট ও প্রবল। তিনি প্রশ্ন-জিজ্ঞাসুকে কেবল হিগেল বা ক্যাণ্ট, মিল বা হ্যামিল্টন্ কি বলিয়াছেন, কিংবা সাংখ্য কি বলেন, পাতঞ্জল মীমাংসার সমাধান কি, ইহাই বলিয়া দিয়া প্রশ্ন শেষ করেন না। সে বিষয়ে নিজের বক্তব্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন, শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও অর্জ্জনের বিশেষত্ব ইহাই। এই বিশেষত্বে ব্রজেন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ।

ব্রজেন্দ্রনাথের সবই ভাল। এক এক করিয়া তিন চারি বার তাঁহার পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতার্জ্জন ঘটিয়াছে, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ যে নিরীহ বাঙ্গালী, সেই নিরীহ বাঙ্গালাই আছেন, জীবনের চাল-চলন, রীতি-নীতি, আচার আচরণ দেশের লোকের সঙ্গে বেশ খাপ্ খায়। কেবল তাই কি? কিছু দিন একত্র বাস করিলে দেখা যাইবে, স্বভাব-সারল্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বালক সদৃশ, নিতান্ত ভাল মানুষ। আজ কাল ভাল মানুষ বলিলে গালাগালি হয়। হয় হউক, তবুও ব্রজেন্দ্রনাথ নিরীহ ভাল মানুষ। চরিত্র, বিদ্যা, পদমর্য্যাদা, আত্মসম্মান-বোধে জাতি হিসাবে কেহ কোন প্রকারে আক্রমণ করিলেই কেবল বাঞ্ছনীয় মর্য্যাদা-রক্ষায় ব্রজেন্দ্রনাথ বিনয়-শিষ্টাচার কিঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে বাধ্য হন, নতুবা সর্ব্বত্র তিনি সে কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের ন্যায় শান্ত ও আত্মস্থ ব্যক্তি, কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে, কখনও নিজ হইতে পঠিত ও অর্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন না। সহজ কথায় সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ করিবেন, কিন্তু অকারণ কখনও কোন প্রশ্ন উঠাইবেন না। কিন্তু তাঁহার স্বভাব সারল্য তাঁহাকে সকল সময় নীরব থাকিতে দেয় না। যখনই তাঁহার গৃহে গিয়াছি, কেহ না কেহ তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সে সময় তাঁহার স্নানাহারের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান থাকে না। আর মাতৃ-দেবী-সদৃশ জ্যেষ্ঠ সহোদর ক্ষুণ্ণ ও কাতর হইয়া অধীর পাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন রোম নগরীতে প্রাচ্য সাহিত্য, শাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা-সভা (Oriental Congress) আহূত হইয়াছিল। কুচবিহারাধিপতির প্রতিনিধি-রূপে তদীয় কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রাজব্যয়ে রোমের প্রাচ্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভার জন্য তাঁহার লিখিত "বৈষ্ণবধর্ম্ম বনাম খৃষ্টীয় ধর্ম্ম" নামক নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও তথায় পঠিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের মৌলিকতা, গবেষণা ও তুলনায় বিচার-পদ্ধতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। রোমের বৈঠকে যে সকল পণ্ডিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ডাক্তার শীলের বিষয়সকলের আলোচনা-পদ্ধতি, গভীরতা, সারবত্তা ইত্যাদির ভূরি ভূরি পরিচয় পাইয়া এরূপ চমৎকৃত হইয়া-

ছিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে নানা আকারে তাঁহার বহু প্রশংসা প্রকাশিত হয় এবং সেইজন্য বহু লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সমক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার বিস্তৃতি বহুদূরব্যাপী হইতেছে বলিয়া রাজা প্রজা উভয়েরই বিশ্বাস হইলেও, তাহা ভ্রান্ত-ধারণা-প্রসূত। তিনি সেই কমিটির সম্মুখে লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মুসলমান আমলে ও তৎপূর্ব্বে এদেশে শিক্ষার প্রসারতা ও গভীরতা—উভয় বিষয়ই শ্রেষ্ঠ ছিল। তুলনায় এখনকার শিক্ষা এখনও অনেক অল্প।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-বিধি বিধিবদ্ধ হইলে পর, লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের গভর্ণমেণ্ট ইহার পরিস্ফুটন ও পোষণ জন্য অপর এক কমিটি নিযুক্ত করেন। সে কমিটিতে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই তিন জন বাঙ্গালী সদস্য ও অপর তিন জন ইংরাজ সদস্যের স্থান হইয়াছিল। সিমলা শৈলে সে কমিটির অধিবেশন হয়। সেখানে এই ছয়জনে মিলিত হইয়া বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলে পর, গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ ও মঞ্জুর করেন। স্যর আশুতোষ ও ডাঃ শীলের মধ্যে বিশিষ্ট পরিচয় পূর্ব্ব হইতে সূচিত ও পরিপুষ্ট হইলেও, এই সিমলা শৈলেই একত্র কর্ম্মসূত্রে উভয়ে উভয়ের অত্যধিক গুণানুরাগী হইয়া পড়েন। এই ক্ষেত্রেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির এক প্রশস্ততর দ্বার উদ্ঘাটনের সুযোগ ও সুবিধা-সাধনে ঐ দুই মহাত্মা মিলিত হইয়াছিলেন। আজ সেই মণিকাঞ্চনযোগের শুভ ফল দেশবাসী নানা আকারে উপভোগ করিতেছে। ইহা আমাদের উচ্চ শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লণ্ডন নগরীতে এক বিশ্বমানব-সভা আহূত হইয়াছিল। সে সভায় ডাঃ শীলের আসন অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুটি কারণে তাঁহার প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। প্রথম কারণ—তাঁহার উপর মর্ত্ত্যজগতের মানবসমষ্টির দৈহিক গঠনগত জাতীয়তার আলোচনার ভার অর্পিত হয়। অপরাপর অংশ ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রবন্ধ একত্র করিয়া যে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতেছে, সেই গ্রন্থের মূলাংশ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গভীর গবেষণার ফলরূপে গ্রন্থের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। তাহার পর প্রথম দিন সভাধিবেশনের সময়ে সভার দ্বারোদ্ঘাটনভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। যে সভার অনুষ্ঠান পাশ্চাত্য জগতের শক্তিপুঞ্জের পৃষ্ঠপোষিত, এবং যে সভার পরিচালকদলে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন, লর্ড মর্লি সদৃশ অসংখ্য পদস্থ ব্যক্তি, সেই সভার প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন-ভার আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত, ইহা কি জাতীয় হিসাবে আমাদের অল্প শ্লাঘার বিষয়? এই অনুষ্ঠানক্ষেত্রে

তিনি আমাদের জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ডাক্তার শীল বোমের প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে এবং লণ্ডনের বিশ্বমানব-মিলনকেন্দ্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর নানা মতের খণ্ডন-প্রয়াসে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার মতের অনুমোদন ও পোষণ করিয়াছেন, ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের অনেক বিষয়ে পূর্ব্ব পোষিত মত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ কাণ্ট্, হিগেল্, মিল্, স্পেন্সার্, মার্টিনিউ যাহা বলেন, তাহাই বেদবাক্য বলিয়া ধরিয়া রাখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদেরই স্বদেশীয় একজনের সাধনার ফলে সেই সকল মত অনেক স্থলে সংশোধনোপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সে বিষয়ের সংবাদ অল্প লোকই রাখেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় কথা যে বিধাতা কৃপা করিয়া এই মহাত্মাকে দীর্ঘজীবী করিলে, এতাদৃশ অসাধারণ-শক্তিশালী পুরুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চায় এখনকার সভ্য জগৎ যে অতীত ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, শ্রদ্ধাবনত-দৃষ্টিতে ভারত-রত্নাকরে দৃষ্টিপাত করিবে, এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে উচ্চ জ্ঞান-তত্ত্বের আশ্রয়স্থল বলিয়া স্বীকার করিবে, ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের এক ব্রজেন্দ্রনাথে এক জগদীশচন্দ্রে, এক প্রফুল্লচন্দ্রে ও এক রবীন্দ্রনাথে তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। পারস্পর্য্য রক্ষা করিবার লোক চাই। উপযুক্ত উত্তর-সাধকের অভাবে দেশ সর্ব্বদাই উঠিতে গিয়া পড়িয়া যায়। আর আমরা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" নিমজ্জিত হই। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, এই সকল অধীত বিদ্যার প্রবল বন্যার বারিপ্রবাহ ধরিয়া রাখিবার উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন। আক্ষেপের বিষয়, পল্লবগ্রাহিতা দোষ নিবন্ধন কেহ এক বাতি, কেহ এক কণা লইয়া, তাহাকেই মূল-ধন করিয়া নানা আকারে প্রলাপের ন্যায় প্রচার করিতে ব্যস্ত হন। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞান ও শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা ও উপদেশ দুর্ব্বোধ্য, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। এই কথা যে একেবারে ভুল, ইহার যে কোন অর্থ নাই, তাহা নহে, অর্থ আছে। তাঁহার আলোচনা ও মীমাংসা বুঝিবার প্রয়োজন-বোধই বড় অল্প। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, সহরের ও দেশ-দেশান্তরের জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি-গণ সর্ব্বদাই তাঁহার ভবনে, তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। তবে যাঁহারা কথায় তুষ্ট, রঙ্গিতেই রতি মতি রাখিয়া আনন্দিত, তাঁহাদের নিকট ডাঃ শীল দুর্ব্বোধ্য সন্দেহ নাই। তবে কলেজে ছাত্র পড়াইতে তিনি দুর্ব্বোধ্য নহেন। এ দেশের ও পাশ্চাত্য-দেশের সুধী-মণ্ডলীর সমক্ষেও তিনি দুর্ব্বোধ্য নহেন। আর আমরা মূর্খ হইলেও এবং তাঁহার সকল কথা সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিলেও যে একেবারে বুঝি না, তাহাও নহে; তাঁহার অভিব্যক্ত অনেক তত্ত্ব—অনেক আলোচনা বেশ বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি বলিয়াই তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও

সাধু ব্যক্তির সঙ্গলাভ মহামূল্য সম্পদ্ বলিয়াই মনে করি।

দীর্ঘ-সুদীর্ঘ কালের পরিচয় ও সঙ্গ-সূত্রে এই মহাত্মার বিষয়ে এত কথাই আজ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টার আলোচনা অগ্রে করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মানুষটিকে জ্ঞান ও বিদ্যার এক অনন্ত পারাবার বলিয়া মনে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হইয়া ঐ সজীব জ্ঞান-রত্নাকরে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুঃখ এই যে, শক্তি ও সময় এই উভয় শত্রুর বিপক্ষতায় আমাদের ভাগ্যে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ জুটিল না। অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায় কেবল আংশিক ভোগ করিলাম মাত্র। এই অসামান্য গুণবান্ মানব সন্তানের বিষয়ে বহু তথ্যের আলোচনা করিবার আছে। ইঁহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-যাপন এরূপ ভাবে তাঁহার কর্ম্মগত জীবনের সহিত মিলিত মিশ্রিত যে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা অতি কঠিন। তাঁহার চরিত্রশোভা, তাঁহার কর্ম্মশীলতাকে এরূপ সুন্দরভাবে আশ্রয় করিয়াছে যে, কোন্‌টা ব্যক্তিগত আর কোনটা সমাজগত, কোনটা চরিত্রগত, আর কোনটা কর্ম্মগত, তাহার বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। তাঁহার ব্যক্তি ও সমাজ, তাঁহার চরিত্র ও কর্ম্ম—একস্থানে একীভূত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, সেইটাই ফুটাইয়া দেখাইবার বস্তু। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এক্ষণে একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কথায় বলে "টাকায় টাকা আনে, জলেই জল মিশিয়া থাকে, জ্ঞানই জ্ঞানের সমাদর করে।" স্যর আশুতোষ জ্ঞানী ও গুণী, শুনিতে পাই বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সমকক্ষ বাঙ্গালী নাই, সত্যমিথ্যা ভগবানই জানেন, আমরা সামান্য বুদ্ধিতে আশুতোষকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি; কেন করি, সুযোগ সুবিধা হইলে পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। এখনকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার হাতে এক অত্যাশ্চর্য্য শ্রীসম্পদে সুশোভিত হইয়াছে। যেন বাজীকরের যাদু-বিদ্যাবলে, দেখিতে দেখিতে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশাল শক্তি-কেন্দ্রে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে; এমনই একটা অবস্থার সংঘটন হইয়াছে যে, ভারতীয় অন্যান্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই স্যর্ আশুতোষের সাধিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষতায় সক্ষম নহে। আর তিনি যেরূপ ভাবে ইহার পরিস্ফুটন প্রয়াসী, আজ অন্য কোনও বাঙ্গালী বা ইংরাজ সেই উচ্চ-প্রয়াসের উপযুক্ত উত্তরসাধক হইয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। সেই আশুতোষের বুদ্ধিপ্রসূত বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ঠাভরণরূপ কয়েকটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাভাবে ও আয়োজনের শক্তির অভাবে একাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী যাহা কল্পনাও করিতে সাহসী হয় নাই, আশুতোষের অসাধ্য সাধনার ফলে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল আচার্য্য পদের শ্রেষ্ঠ আসন আজ আশু-তোষ এই স্বদেশীয় সুধী ও বিদ্যাবিশারদকে (Sauant) অর্পণ করিয়া অসামান্য গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; এজন্য আজ বঙ্গদেশ—কেবল বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র

ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ অনুভব করিবে। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন এবং সে মর্য্যাদার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেশে অক্ষয়-কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। কারণ এই উচ্চপদের উপযুক্ত সুফল যখন দেশ বিদেশের শিক্ষিত সমাজের নয়নে অঞ্জনরূপে পরিগৃহীত হইবে, তখন তাঁহার এই মহানির্ব্বাচনের মূল্য তাঁহার স্বদেশবাসী উত্তমরূপে অনুভব করিবে। আজ ব্রজেন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তা ও আশুতোষের গুণ-গ্রাহিতার যে মিলন সাধিত হইল, অতি ত্বরায় আমাদের দেশ তাহার অমৃতফল ভোগ করিয়া গৌরবান্বিত হইবে। অন্যকথা বারান্তরে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লণ্ডনে নন্দনলাল।

নন্দনলাল যখন লণ্ডনে গিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ ছাইয়া আছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। ষ্টেশন ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথম পরিচয়ে বিলাতটা তার আদৌ ভাল লাগিল না।

সে ভাবিয়াছিল কেউ না কেউ আসিয়া তাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবে। তার বাবা বড় চাকু'রে। লাট বেলাটের দরবার করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে খুব খাতির। সাহেব তাঁর অনেক বিলাতী বন্ধুকে চিঠি লিখিয়াছেন। একজন বৃদ্ধ পেন্সনপ্রাপ্ত সিভিলিয়নকে তিনি নন্দনের অভিভাবক পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছেন। নন্দন ভাবিয়া ছিল অন্ততঃ তিনি তাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবেন। কিন্তু কেহই আসে নাই, সেই লোকারণ্যের ভিতর, সেই কোলাহল ও ব্যস্ততার মধ্যে, নন্দন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রাণটা তার কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিধাতা যদি পাখা দিতেন, তবে তখনি উড়িয়া আবার আপনার জনের মাঝ-খানে যাইয়া পড়ে।

"গুড্ ইভনিং। আপনি কি এই এই গাড়ীতে, এই মাত্র দেশ হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন?"—সুললিত বামাকণ্ঠনিঃসৃত স্বাগত সম্ভাষণ নন্দনের নিস্পন্দ ধমনীতে প্রবলবেগে রক্তস্রোত ছুটাইয়া দিল। সে চাহিয়া দেখিল এক অনিন্দ্যরূপবতী উদ্ভিন্ন-যৌবনা রমণী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। রমণী তাহারই প্রতি চাহিয়া তাহাকেই সম্ভাষণ করিতেছেন। কিন্তু নন্দন তো তাকে চিনে না। নন্দনকে সে চিনিল কেমন করিয়া? এ স্বপ্ন না সত্য? নন্দনকে নির্ব্বাকে দেখিয়া রমণী বলিল—"আপনার জিনিষ পত্র কোথায়? গাড়ীর ভিতরে তো কিছু প'ড়ে নাই?" এই বলিয়া গাড়ীটা খুঁজিতে গেল। নন্দন আপনার ছোট হাত ব্যাগটা গাড়ীতেই ফেলিয়া আসিয়াছিল। রমণী সেটী আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ ব্যাগ তো আপনারই?"

তখন নন্দনের চমক ভাঙ্গিল। অস্ফুট স্বরে সে বলিল—"এ্যাঁ—এ্যাঁ—আপনি আমায় চিন্‌লেন কেমন করিয়া ?"

"তা কি বড একটা আশ্চর্য্যের কথা ? আমি আপনার দেশের অনেক লোককে চিনি। অনেকেই আমার বন্ধু। আপনাকে কেউ নিতে আসে নি দেখে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।" রমণী ঈষৎ হাসিয়া দন্তরুচি-কৌমুদী বিস্তার করিয়া, নন্দনের মনের ধোঁকা দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন।

'আপনার আরো বাক্সটাক্স তো আছে ? এদিকে আসুন, সেগুলি কষ্টম্ থেকে খালাস করে নেওয়া যাক্ গে।"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নন্দন তাঁহার পশ্চাতে চলিল। রমণী বলিলেন—"বাক্সের চাবি গুলো তো চাই, ডিউটিএব্‌ল্ (Dutiable) কোনও কিছু বাক্সে নাই তো ?"

"তা তো জানি না।"

"সোণারূপার অলঙ্কার বা প্লেট, তামাক কি চা"—এ সকল থাকলেই খুলে দেখাতে হবে।"

"না—ও সব আমার বাক্সে কিছুই নাই।" এই বলিয়া নন্দন রমণীর হাতে চাবির গোছা তুলিয়া দিল।

"তা হ'লে আর চাবির দরকার হবে না। আমাদের এখানে কষ্টমের এমন কড়াকড়ি নাই।" রমণী ক্রমে নন্দনের তৈজসপত্র সংগ্রহ করিয়া, মুটের জিম্মা করিয়া, গাড়ী ডাকিতে লাগিলেন। জিনিষগুলো গাড়ীতে তোলা হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাবেন কোথায়, ঠিক আছে কি ? কেউ তো আপনাকে নিতে আসে নি দেখ্‌ছি।"

"তাইতো দেখ্‌ছি। কোথায় যাব বুঝতে পাচ্ছি না।"

"তবে আমাদের ওখানে আসুন। সেখানে আপনার স্বদেশী লোক অনেক আছেন নিজের বাড়ীর মতন থাকতে পাবেন।"

নন্দন কি জানি, কি হয়, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"এই যে মিঃ দাস আস্‌ছেন ?" বলিয়া রমণী একজন আগন্তুক ভারতবাসীকে ডাকিলেন।

"হাঁ গো। দাস, তুমি তো আচ্ছা লোক। তোমার দেশের একটী ভদ্রলোক এই লণ্ডনের মরুভূমে একা পড়েছিল, কোথায় যাবেন জানেন না, কেউ তাঁকে নিতে আসে নি। আর তুমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছ।" আগন্তুক টুপি খুলিয়া রমণীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"মাপ করবেন। আমি আনমনে যাচ্ছিলাম। তা, আপনি কি এই গাড়ীথেকে নামলেন ?"

স্বদেশীর মুখ দেখিয়া নন্দনের ধড়ে প্রাণ আসিল। বলিল—"হাঁ, এই আজকের বোট্‌ট্রেণে এসে পৌঁছেছি।"

কোথাও যাবার ঠিকানা আছে কি ?"

"আপাততঃ তো দেখছি নাই, স্যার জেমস্ ম্যাকিন্টসের নিকট চিঠি লেখা হয়েছিল। টেলিগ্রামও করেছিলাম। ভাব ছিলাম তিনি বুঝি কোনও ব্যবস্থা করিবেন।"

দাস একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"তা বৃষ্টি তো এত পড়ছে না যে ম্যাকিন্টসের দরকার হবে। আপনি আমার সঙ্গেই চলুন। আমার বাড়ীতেই থাকবেন।"

রমণী বলিল—"দাস, তুমি পাগ্‌লামো করো না। তোমার ওখানে নিয়ে গিয়ে বেচারীর পেছুনে এখন থেকেই পুলিশ লাগাবে কেন? দুদিন সবুর কর, পরে তোমাদের দলে তো মিশবেই। তবে স্যার জেমস্ ম্যাকিণ্টস কি ব্যবস্থা করেন, তাই দেখ না?" তারপর নন্দনের দিকে চাহিয়া বলিল—"স্যার জেমস ম্যাকিণ্ট'সের সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'ল কি করে?"

"আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, আমার বাবার সঙ্গে খুব আছে।"

"আপনার বাবা করেন কি?"

"সদরালার কাজ করেন।"

"সদরালা!—দাস, সদরালা কাকে বলে?"

"সদরালা একজন বড় জুডিসিয়াল অফিসার।"

"আর তুমি তাঁর ছেলেকে তোমার ওখানে নিতে চাও? বাপ বেটা দুজনা'র সর্ব্বনাশটা কেন কর্ব্বে, দাস?"

"আপনি কোথায় থাকেন, দাস মহাশয়?"

"হাইগেটে ইণ্ডিয়া হাউসে—শ্যামাজি কৃষ্ণবর্ম্মার আড্ডা—কথাটা খুলেই বল না কেন, দাস!"

নন্দনের বাবা তাহাকে ইণ্ডিয়া হাউসের ছায়া মাড়াইতে দু'শ বার বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তার মুখ শুকাইয়া গেল। দাসও বেচারীর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন; ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তা আপনি এঁরই সঙ্গে যান। সেখানেও অনেক বাঙালী, বেহারী, পঞ্জাবী ছেলে আছে। তার পরে যা' পাকা বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়, করিয়া লইবেন। আবার দেখা হবে।"

দাসের কথায় নন্দনের ভয় কমিয়া গেল। রমণীর সঙ্গে যাইয়া "ভারতকুঞ্জে" লণ্ডন প্রবাসের প্রথম রাত্রি কাটাইলেন।

২

"মেরী, আমায় এখান থেকে যেতে হলো দেখ্‌ছি।"

"কেন নন্দন, এখানে কি তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে?"—নন্দনের দুই কাঁধে হাত দু'খানি রাখিয়া মেরী কাতর নয়নে জিজ্ঞাসা করিল।

"তা নয়, মেরী। লণ্ডনে পৌঁছিয়া অবধি তুমি যে স্নেহমমতা দিয়াছ, তাতে আমার এ প্রবাস তো একদিনও প্রবাস বলে ঠেকে নি কিন্তু কি করি বাবা যে তাড়া দিচ্ছেন।"

"এটা তো আর ইণ্ডিয়া হাউস নয়, এখানে সব বড় বড় সাহেব সুবোরা আসেন, এখানে থাক্‌তে তোমার বাবার এত আপত্তি হবে কেন? স্যার জেমস্‌ও তো তোমাকে এখানে দেখে গেছেন।"

"কথাটা তা ত নয়। বাবা বলছেন একটা ফ্যামিলিতে গিয়ে থাক্‌তে। আর স্যার জেমস্ সে পরিবারটা ঠিক করে দিবেন।"

"যদি তুমি তাতে রাজি না হও?"

"রসদ বন্ধ হবে।"

মেরীর মুখখানি ভারি হইয়া গেল! এই ক'মাসে নন্দনের সঙ্গে তার কি যেন একটা কেমনতর সম্বন্ধ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। আজ থিয়েটার, কাল মিউজিক হ'ল, পরশু আর্লস্ কোর্টের একজিবিষণ, আর এক দিন

সেপার্ডসবুশের জাপানী মেলা, এই রকমে আমোদ আহ্লাদে, খাইয়া দাইয়া, ঘুরিয়া বেড়াইয়া, দু'জনার দিনটা কাটিয়া যাইতেছিল। নন্দন এক আধ খানি অলঙ্কারও মেরীকে উপহার দিয়াছে। একদিন হয়ত নন্দনের সঙ্গে একটা পাকাপাকি সম্বন্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, মেরী এ কথাটাও কখনও কখনও হয়ত ভাবিতেছিল, মেরীর মা বাপেরও তাহাতে আপত্তি হইত না। তারা বড় গরিব। অনেক গুলি ছেলেপিলে, ডাইনে আনিতে বাঁয়ে কুলাইত না; আর ভারতবাসীরা তাদের কল্পনায় এক একটী ছোট বড় ধনকুবের। নন্দনকে মেরী দু'চার দিন তার নিজের বাড়ীতেও লইয়া গিয়াছে। নন্দনের বড় মানুষী চালচলন দেখিয়া বুড়াবুড়ির একটু চটকও লাগিয়াছিল। মেরীর সকল আশা গড়িতে না গড়িতে যেন সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

নন্দন মেরীর ডান হাতখানি আপনার হাতে লইয়া আপনার আঙ্গুল দিয়া তার তর্জ্জনীর অগ্রভাগ ধীরে ধীরে খুঁটিতে খুঁটিতে মাথা নীচু করিয়া বলিল—"মেরী, আমায় কালই যেতে হবে যে। ম্যানেজারকে নোটিস দিই নাই বলিয়া, এক সপ্তাহের বিল আগাম চুকাইয়া দিয়াছি। আমি চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে মেরী?" নন্দন একটু আদর বাড়াইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল।

মেরী আর আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না। নন্দনের বুকে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নন্দনও আপনাকে সামলাইতে পারিল না! এই দু' মাস কাজ যা করে নাই, আজ তাই করিয়া ফেলিল। মেরীকে বুকে টানিয়া ধরিয়া তার ঠোঁটে, চোখে, কপোলে ঘন ঘন চুম্বন-বৃষ্টি করিতে লাগিল।

সহসা নন্দনের ঘরের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল। স্যার জেমস ম্যাকিণ্টস ঘরে ঢুকিয়া এই উন্মাদ অভিনয় দেখিলেন।

নন্দন ও মেরী সন্ত্রস্ত হইয়া উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া অধোমুখে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণিক পরে স্যার জেমস্ বলিলেন—"নন্দন, তুমি কি আমায় বসতে বলবে না?" "বসবেন বৈ কি? বসতে আজ্ঞে হয়, আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন, স্যার জেমস। বড় অপরাধ হয়েছে!" "তুমিও বস। আমার কথা আছে।" এই বলিয়া স্যার জেমস্ মেরীর দিকে চাহিলেন। মেরী তাঁহার চাহনির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না, স্যার জেমস্ অগত্যা মুখ ফুটিয়া বলিলেন—"মিস্, নন্দনের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" তথাপি মেরীর মুখে কথা নাই। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্যার জেমস তখন মেরীর কাছে যাইয়া, তাহার দুই বাহু ধরিয়া খুব জোরে তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া, মুখের কাছে মুখ দিয়া বলিলেন—"ইয়ং উওম্যান" (young woman!) শুনতে পাচ্ছ না? নন্দনের সঙ্গে আমার কথা আছে! তোমার এখন এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।"

মেরী পূর্ব্বের ন্যায় নির্নিমেষ শূন্য দৃষ্টিতে স্যার জেমসের মুখের দিকে তাকাইয়া ক্ষণিক হঠাৎ হোঃ হোঃ করিয়া অট্ট হাসি হাসিয়া হাততালি দিয়া দ্রুতবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

স্যার জেমস্ দরজা বন্ধ করিয়া আপনার আসনে আসিয়া বসিলেন। একটু পরে বলিলেন—"নন্দন, ব্যাপারখানা কি বল দেখি? এ সবের জন্যই কি তোমার বাপ তোমায় বিলাত পাঠিয়েছে। লণ্ডন সহরের অনেক কুলটা বাসাড়ে বাড়ীতে বাড়ীওয়ালী ও চাকরাণী বেশে বাস করে। তুমি শেষটা তাদেরই খপ্পরে পড়লে?"

নন্দনের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল! একটু উত্তেজিত হইয়া সে উত্তর করিল—"অমন কথা বলবেন না, স্যার জেমস্। আপনি আমার বাবার বন্ধু, পিতৃ-স্থানীয়। কিন্তু আপনার মুখেও আমি এই ভদ্রমহিলার অযথা নিন্দাবাদ সহিতে পারিব না।"

স্যার জেমস্ একটু নরম হইলেন। "তবে কি তুমি তার নিকটে বিবাহ প্রস্তাব করেছ?"

"করিনি। কিন্তু ভবিষ্যতে করিতে পারি।"

"তোমার নিজের স্থান ভুলে যেও না, নন্দন। যেখানকার লোক তুমি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য। ভু'ল না তুমি নেটিভ্, সে ইংরেজ।"

"আপনিও ভুলে যাচ্ছেন, স্যার জেমস্ এটা বেহার নয় বিলাত। আপনাকে আমার এ সব কথা বলা সাজে না। কিন্তু আপনি বল্ছেন। আমি ইংরেজ কুলটার খপ্পরে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হই, ইয়ং রাস্কেল বলে তা উপেক্ষা কর্ত্তে পারেন, কিন্তু ইংরেজ ভদ্র কন্যার পাণি গ্রহণ করি ইহা সহ্য কর্ত্তে পারেন না! আর আমরাই কেবল জাত মানি!"

স্যার জেমসের কর্ণমূল পর্য্যন্ত সান্ধ্যগগনের সিন্দূরে মেঘের মত আরক্তিম হইয়া উঠিল।

"ছদিনেই তুমি এতটা বেয়াদব হয়ে উঠেছ. তা ভাবি নাই। ভাব্লে তোমার এখানে আসতাম না; তুমি গোল্লায় যাবে, যদি পণ করে থাক, তবে তোমাকে বাঁচানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।"

"বেয়াদবি হয়ে থাক্লে মাপ কর্ব্বেন, স্যার জেমস্, বেয়াদব হতে চাইনি, বিশেষ আপনি আমার ঘরে এসেছেন। একে গুরু স্থানীয়, তায় অতিথি। আমার ক্রটী মার্জ্জনা করুন।"

স্যার জেমস্ একটু ঠাণ্ডা হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"ইহার সঙ্গে তোমার বিয়ে যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তবে এরূপ স্বাধীনতা নেওয়া তো ভদ্রলোকের রীতি নয়। তুমিই নেও কি করিয়া, সেই বা নিতে দেয় কেমন করিয়া, বুঝি না।"

"ভুল বুঝবেন না, মহাশয়; আমি বাবার কাছে একদিনও একটা মিছা কথা কইনি। আপনার কাছেও বলব না। যা দেখলেন, তা একটা আকস্মিক উন্মাদলক্ষণ মাত্র। আমি এর আগে কখনও তাঁর গা ছুঁই নাই। কাল আমি এ বাড়ী থেকে চলে যাব, তার কথা হচ্ছিল। তার পর কি করিয়া কি যে হইল বলিতে পারি না। জেনে শুনে, ভেবে চিন্তে, কোনও অভদ্রতা করি নাই। তবে মুখ ফুটে আমরা একে অন্যকে কোনও কথা না বল্লেও, দু'জনার প্রাণটা আপনা হতেই দু'জনার কাছে আজ খুলে গেছে। আমি মেরীকে বিয়ে কর্ব্বো স্যার জেমস্! আমাদের সুখের অন্তরায় হবেন না।

"সে যা হয় পরে হবে। তার ঢের সময় আছে। আমি তোমায় তোমার নূতন বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি। এক্ষণি তোমায় তল্পি তাল্পা নিয়ে যেতে হবে।"

"এই রাত্রে? কাল দুপুরের পরে গেলে হয় না? বাড়ী তো আমি দেখে এসেছি, নিজেই যেতে পার্ব্বো এখন।"

কিন্তু স্যার জেমস্ ছাড়িলেন না। সেই রাত্রেই নন্দনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে বলিলেন—"তোমার জন্য যে বাড়ী ঠিক করেছিলাম সেখানে আপাততঃ যাওয়া হবে না। কিছু দিন তোমাকে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে। এখন তিন মাস তো কলেজ বন্ধ। তার পর নূতন ব্যবস্থা করা যাবে। আমি 'সাউথ সিতে' সমুদ্রের ধারে বাড়ী করেছি। সেখানেই যাওয়া যাক।" স্যার জেমসের সঙ্গে নন্দন সেই রাত্রেই চলিয়া গেল।

৩

'হাগো, নন্দন! তুমি কোথায় এমন করে ডুব মেরেছিলে বল দিকি? আমরা ভাবছিলাম তুমি হয় মরেছ, নয় দেশে ফিরে গেছ?"

"কেন বল দেখি? ছুটিতে তো সবাই বাহিরে যায়। আমি সাউথ সিতে ছিলাম।"

"কিন্তু সবাই কি চিঠি-পত্র বন্ধ করে?"

"কেন? আমি তো কত চিঠি কত লোককে দিয়েছি। দু'এক জন ছাড়া কেউ তার খবরও নেয় নাই। আমি ভাবছিলাম তারাও বুঝি লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছে। কেন, তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকেও তো ক'খানা চিঠি লিখেছি। এক খানারও উত্তর পাই নাই।"

"ছেড়ে দাও তোমার ও সব কারাসৃষ্টি। আমি লণ্ডন ছেড়ে এক পা যাই নি। আমি তোমার চিঠি পেলে তার জবাব দেই নি, এও কি কথা?"

"সত্য বলছি, তোমায় অনেক চিঠি লিখেছি।"

"আমিও তোমায় বড় জরুরি দু'খানা চিঠি দেই। একখানারও জবাব পাইনি।"

"বল কি?" জরুরি ব্যাপারটা কি ছিল বলই না।"

"আর কিছু নয়, 'ভারতকুঞ্জে'র লোকেরা তোমার খোঁজ নিবার জন্য আমায় বড় ধরেছিল। আমি শুনেছিলাম তুমি স্যার জেমসের ওখানে আছ, তাই তোমায় দু'বার লিখি?"

"যাক্, লণ্ডনের খবর কি বল দেখি।"

"দুনিয়ার তো চিরন্তন খবর কেবল তিন —জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু। লণ্ডনেরও খবর তাই।"

"তোমার ফিলজফি রাখ। সোজা সত্যি কথাটা বল না।'

"যা বলছি সবই সত্যি। এক জন্ম, এক বিবাহ, এক মৃত্যু। সবই সত্যি। এক বাড়ীতে। তবে বিয়েটা জন্মের একটু আগে, পরে নয়। আর মৃত্যু সকলের শেষে।"

"এক বাড়ীতে? কোথায়?"

"ভারতকুঞ্জে।"

"জন্মটা কার?"

"কিষণের ছেলের।"

"দূর হও। তামাসা রাখ না। কিষণের বিয়ে হলো কবে যে এর মধ্যেই ছেলে হবে।"

"বিয়ে হ'লো আগষ্টে। ছেলে হলো সেপ্টেম্বরে।

"কিষণ সত্যি না কি বে' করেছে ; কাকে কল্লে ?"

"লিজিকে– সাধুভাষায় যাঁকে এলিজেবেথ বলা হয়, বুনেদি নামটা বটে, সবটা যাই হোক্ না কেন ? লিজিকে তুমি চিন্‌তে না ? 'ভাবতকুঞ্জে'ব চাকবাণী ছুডিটাকে এব মধ্যেই ভুলে গেছ '

"মলো কে ?"

"তাও জান না ? বে'টাই যেন গোপনে সেরেছিল। মরাটা তো আব বেমালুম হজম করা যায় না। সে খবরটাও পার্ওনি, আশ্চর্য্যের কথা! ঐ সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। আব দাঁড়াতে পাচ্ছি না ভাই। ঐ আমাব বাস্ এলো, আমি পালাই। 'বাই,' 'বাই,' নন্দন।"

"অত কথা বলে। মলো কে বলে না। ছাই নামটা বলেই যাও না ?"

"মেবী ; মরেছে মেবী। তাবও না কি শুনেছি একটা ভাবি রোমান্স্ আছে।"

এই বলিয়া সে ব্যক্তি উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া বা'সে চড়িয়া, নন্দনেব দিকে লক্ষ্য করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

নন্দন তড়িতাহতেব ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

বছর ঘুরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নন্দনলালের নষ্ট স্বাস্থ্য এখনও পূরা মাত্রায় ফিরিয়া আইসে নাই। তিনমাস এক নর্শিং হোমে কাটাইয়াছে। তার পর ব্রাইটনে, হ্যারোগেটে, ও অপরাপর স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রায় ছয়মাস কাল ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষ তিন মাস স্যার জেমসের বাড়ীতে বাস করিয়া, আবার লণ্ডনে বাসা বাড়ীব আশ্রয় লইয়াছে। তার নাম করিতে করিতে মেবী মরিয়াছিল। বিকারে "নন্দন, আমার নন্দন, পেয়ারে আমার, সর্ব্বস্ব আমাব" বলিয়া চীৎকার করিত। মাঝে মাঝে একটু চৈতন্যের উদয় হইলে, "একবাব আমাব নন্দনকে ডেকে আন। একবাব তাকে দেখে নি" বলিয়া কত কাকুতি মিনতি করিয়াছিল। পতিদিন লিজি এ সকল কথা নন্দনকে লিখিয়া জানাইয়াছিল। কিন্তু স্যার জেমস্ সে সব গাপ করিয়াছিলেন। ক্রমে সকল ইতিহাসই নন্দনেব নিকটে প্রকাশিত হইল। কিন্তু নন্দনেব প্রাণ তখন অসাড় হইয়া গিয়াছে। ভাল মন্দ কোনও কথাই সে বলিল না। স্যাব জেমস মাপ চাহিলেন। তাতেও হাঁ, না, কিছুই বলিল না। জীবনের সে এক পৃষ্ঠা যেন তাব ছিড়িয়া, উড়িয়া, উধাও হইয়া গিয়াছে। এমনি মনে হইল। আশা নাই, তেজ নাই উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, দেবত্ব নাই, মনুষ্যত্ব নাই, পশুত্ব পর্য্যন্তও নাই — এমনি নির্জীব জড়ভরতের ন্যায় নন্দন আবার আসিয়া লণ্ডনের বাসা-বাড়ীতে আশ্রয় লইল।

স্যার জেমস্ ভয় পাইলেন। নন্দনের বাবাকে লিখিলেন, ছেলের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাকে দেশে লইয়া যাও। নন্দনের বাবা তাহাকে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইতে লিখিলেন। নন্দন রাজি হইল না।

এই বাড়ীটা স্যার জেমস্‌ই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। বাড়ীওয়ালীকে বলিয়া গেলেন

—"এ ছোঁড়ার যাতে জীবনে কোনও একটা আনন্দ ও আগ্রহ হয়, তার চেষ্টা করো। এর জন্য যা উপরি খরচপত্র হয় আমি দেব।"

"স্যার জেমস্ 'রিচার্ড ফেবারের' অবশ্যি পড়েছেন। ঐ তার ব্যবস্থা।"

"তা সে তুমি জান। ছোঁড়াটা আমার অতিশয় বন্ধুলোকের পুত্র। আমার নিজের ছেলের মতন ভালবাসি। তাকে আমার মানষের মত করে যদি দিতে পার, আমি চির দিনের জন্য তোমার নিকটে কেনা থাকিব। তোমার হাতে তাকে দিলাম।"

স্যার জেমস্ চলিয়া গেলেন। যাবার বেলা বলে গেলেন—"আর যাই কর না কেন, সাদায় কালোয় বে' হয় এটা আমি চাই না। এইটা বাঁচিয়ে চলো।"

৫

নন্দনের বাড়ীওয়ালা তার পরিচর্য্যার জন্য একটী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী চাকরাণী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সে নন্দনের খাবার দাবার তার ঘরে লইয়া যায়। সেখানে তার কাছে দাঁড়াইয়া তাকে সার্ভ করে। একদিন নন্দনের খাবারের সঙ্গে এক বোতল শ্যাম্পেন লইয়া গেল। অসুখের পরে, ডাক্তারের ব্যবস্থামত নন্দন কিছুদিন পোর্ট খাইয়াছিল বটে; কিন্তু জন্মে কখনও শ্যাম্পেন খায় নাই। আজ চাকরাণী এক গ্লাস ঢালিয়া তাহাকে খাইতে দিল। নন্দন যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহা পান করিল। এইরূপ প্রতিদিন চলিতে লাগিল। ক্রমে নন্দনের মুখে হাসি ফুটিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে চাকরাণীর সঙ্গে একটু কটিনাটিও সুরু হইল। একদিন খাইতে খাইতে নন্দন লুসিকে বলিল—"তুমি অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? আমি খাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ বস। যে খাটুনী তোমার, কখনও ত একটু বসিতে পাও না।" সে দিন হইতে লুসি প্রায়ই নন্দনের ঘরে নানা ছুতানাতা করিয়া আসিয়া তার কাছে বসিয়া গল্পগাছা করিতে আরম্ভ করিল। আর একদিন নন্দন ডিনার খাইতে খাইতে বোতল হইতে একগ্লাস পোর্ট ঢালিয়া লুসিকে দিল। লুসি সে গ্লাস নিঃশেষ করিয়া একগ্লাস ঢালিয়া নন্দনকে আদর করিয়া দিল। নন্দন আবার লুসিকে দিল। লুসিও আবার নন্দনকে দিল। এইরূপে দু'জনে মিলিয়া বোতলটি খালি করিয়া ফেলিল। লুসির মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে চোক ঢল ঢল করিতেছে। নন্দন তাহার গলা ধরিয়া চুম খাইল। লুসি নীরবে—বোধ করত যেন ঔষধ পান—সে আদর গ্রহণ করিল। সেই হইতে এই চুম্বনটি নন্দনের নিত্যপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। একদিন নন্দন লুসির নিকটে একটী চুম্বন ভিক্ষা করিল। লুসি অনেক সাধ্যিসাধনার পরে সে প্রার্থনা পূর্ণ করিল। ক্রমে এমন দাঁড়াইল যে, লুসিকে ছাড়িয়া নন্দন ঘরের বাহির হয় না। সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যায় লুসি ছুটী পাইত। নন্দনও তখন বাহিরে বেড়াইতে যাইত। ক্রমে নন্দন লুসিকে থিয়েটারে, মিউজিক হলে, একজিবিষণে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রিচার্ড ফেভারেলের শিক্ষা পূর্ণতা পাইতে লাগিল। লুসি নন্দনের নিকট হইতে আজ হাফ ক্রাউন, কাল হাফ সভারেইন্, ক্রমে মাঝে মাঝে জিনিসটা পত্তরটা আদায় করিতে লাগিল।

৬

নন্দন ক্রমে ক্রমে আবার পড়াশুনায় মন দিয়াছে। বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে একদিন একটু বচসা হওয়াতে সে বাড়ী ছাড়িয়া, সে পাড়া ছাড়িয়া, একেবারে আবলস্ কোর্টে গিয়া বাসা করিয়া আছে। আট নয় মাস লুসির সঙ্গেও আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। তবে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র ব্যবহার চলিত বটে।

৭

"একটী ভদ্রযুবতী আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।" চাকরাণী আসিয়া নন্দনকে খবর দিল। নন্দন একেলা বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। এ সময় কোত্থেকে এক স্ত্রীলোক আসিয়া হাজির হইল, ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিল না। নন্দন জিজ্ঞাসা করিল, "তার কার্ড এনেছ? নাম কি?"

"সে কার্ড দিলে না। বল্লে যে আপনি তাকে চিনেন না, বিশেষ দরকারে এসেছে।"

"আচ্ছা। নিয়ে এস।" বলিয়া নন্দন আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

চাকরাণী অভ্যাগতাকে সঙ্গে লইয়া আসিল। নন্দন দেখিল লুসি।

"হ্যালো লুসি! তুমি কোত্থেকে উড়ে এলে। কত যুগ যে তোমায় দেখি নি।"

"দেখবে কি করে? চখের বাহির, মনের বাহির। তোমাদের ত ধর্ম্মই তাই।"

"একটু চা খাবে?"

"তোমার বাড়ীওয়ালী ভাব্‌বে কি? আমায় ঢুকতেই দিচ্ছিল না।"

"ভাববে আবার কি? এখানে তুমি আমার বন্ধু ব'লেই তো এসেছ?"

চা খাওয়া শেষ হইল। চাকরাণী চা'র বাসনকোসন সরাতে আসিলে, লুসিও উঠিয়া দাড়াইল। নন্দনকে বলিল;—"তবে আজ আমি আসি, ডিয়ার।" আর চাকরাণী দরজার বাহিরে যাওয়া মাত্র নন্দনকে সশব্দ চুম্বন দিয়া লুসিও বিদায় হইল।

সে দিন হইতে প্রথমে চাকরাণী তার পর বাড়ীওয়ালী সকলেই লুসিকে মিঃ লালের ইয়ং লেডি বলিয়া চিনিয়া রাখিল।

লুসিও প্রায়ই যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে সে নন্দনের বাড়ীতেই তার ঘরে তার সঙ্গে ডিনারও খাইতে লাগিল। কখনও বা নন্দন তাহাকে সঙ্গে করিয়া থিয়েটারেও যাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে আবার পুরাণ ইয়ারকিটা একটু জমাট বাধিয়া উঠিতে লাগিল।

তার পর পাচ সাত মাস লুসি আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

৮

হঠাৎ একদিন এক অপোগণ্ড শিশু কোলে লইয়া লুসি নন্দনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া চাকরাণীর চখের উপরেই লুসি নন্দনকে চুম্বন করিয়া, নিজের কোলের ছেলেটী তার কোলে তুলিয়া দিল। নন্দন কায়ক্লেশে ছেলেটীকে কোলে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ আবার পেলে কোথায়?"

"হা ভাগ্য! এখনও চিন্‌লে না?"

"চিনব কেমন করিয়া, কখনও তো আগে দেখি নাই। কাদের ছেলে বলই না?"

লুসি চোকে হাত দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নন্দন তার কাছে গিয়া, গায়ে হাত

বুলাইয়া আদর করিয়া তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যত জিজ্ঞাসা করে, ততই লুসি আরো ফুঁপাইয়া কাঁদে। নন্দন তখন ছেলেটিকে আপনার বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিয়া, লুসির কাছে আসিয়া বসিল। তার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ক্রমে তার মুখ খানি তুলিয়া চুম্বন করিল ও আপনার রুমাল দিয়া তার চখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

লুসি শেষটা সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া,—ছেলেটাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

৯

এই ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরে এক রুদ্রমূর্ত্তি ইংরেজ নন্দনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। ঘরে ঢুকিয়াই বলিল :—"আমি লুসির ভাই। শুনিলাম তুমি তার সর্ব্বনাশ করেছ। এর প্রতিশোধ আমি না দিয়ে ছাড়বো না।"

"আমি লুসির উপকারই সর্ব্বদা করেছি, অনিষ্ট তো কখনও করি নাই। এমন কথা তুমি কেন বলছ, বল দেখি?"

"তোমার নিজের মনকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। আর তোমার যদি কোনও কালে ঈশ্বর থাকে তাকে জিজ্ঞাসা কর। সেদিন তার ছেলেটাকে দেখেও তোমার একটু মমতা বা অনুতাপ কিছুই হলো না। তুমি মানুষ না পশু? লুসির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ছিল, এ বাড়ীর সকলেই তা জানে। আর ছেলের বাপ যে তুমি ইহাও আর কারো জানতে বাকি নাই।"

নন্দনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। লোক চক্ষে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা কত যে কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে, ইহা ক্রমশঃই তার উপলব্ধি হইতে লাগিল। কি উপায়ে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নন্দন এই অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে বসিয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

নন্দনের ভীতি কাতর-ভাব দেখিয়া, তার সাহস আরো বাড়িয়া গেল। "এখন তুমি করবে কি বল? লুসি ও তার ছেলের ভরণ-পোষণের ভার তোমায় নিতে হবে, নইলে ছাড়ছি না। একশ' পাউণ্ডের একখানা চেক্ আপাততঃ আজই চাই।" নন্দনের মুখে রা নাই। এমন বিপদে সে জন্মে পড়ে নাই, কেউ যে কখনও পড়তে পারে, এও তার কল্পনায় আগে আসে নাই। নন্দন নিতান্ত নিরপরাধী তা সে জান্‌তো, আর তার দেবতাও জান্‌তেন। কিন্তু তা বল্লেই তো লোকে বিশ্বাস কর্‌বে না—আদালত সে কথা শুন্‌বে কেন?

"কথা কচ্ছ না যে? তুমি এটা তোমার নিজের দেশ পাওনি বাবা, তা বোঝ তো। আইন আদালত তো দূরের কথা; তার আগেই তোমার দফা আমি নিকাশ করিব।"

"দ্যাখ, তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, ঈশ্বর জানেন আর লুসিও জানে, আমি তাকে একটু আদর যত্ন, তার সঙ্গে একটু নির্দ্দোষ ফষ্টিনষ্টি করা ভিন্ন আর কোনও অপরাধ কখনও করি নাই। তবে যদি নিতান্তই টাকার দরকার হয়ে থাকে, কিছু টাকা দিতে

নারাজ নই। কিন্তু তার এ বিপদের জন্য আমি দায়ী নই।"

"কিছু টাকা নয়। একশটা পাউণ্ড ছাড়তে হবে। দয়া করে দিচ্ছ না কি? আদালতে গেলে জেলে যাবে জান? লুসি চাক্‌রীর খাতিরে কুমারী সেজেছে। দেশে তার স্বামী আছে, সে কথাও তোমায় বলে রাখ্‌ছি। সে যদি এ টের পায় তবে লুসির তো সর্ব্বনাশ হবেই, তোমারও বাঁচাও নাই।

"একশ পাউণ্ড তো আমার নাই।"

'জোগাড় কর। ধার কর চুরি কর, ডাকাতি কর, যা খুসী কর, কিন্তু আমার এ টাকা চাই।"

"আমার মোট ত্রিশটী পাউণ্ড আছে তাই দিতে পারি আর পার্ব্বো না।"

"আচ্ছা এখন তাই দাও। তার পরে বাকিটা না হয় দিও। লুসিকে এখনি ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। নইলে আমরা মুখ দেখাতে পার্ব্বো না।

নন্দন ধীরে ধীরে তার চেক বহি বাহির করিল। অভ্যাগত বলিল—দুখানা চেক দাও। একখানা নিজের নামে লিখে বেয়ারাকে দিতে বল, আর একখানা লুসির নামে দাও।"

নন্দন অগত্যা তাহাই করিলেন। অভ্যাগত চেক্ দু'খানা পকেটে পুরিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে মাসে মাসে, দশ পনের কুড়ি পাউণ্ড করিয়া খসিতে আরম্ভ করিল নন্দন নানা ছলে, কত কৌশলে বাবার নিকট হ'তে রাশ রাশ টাকা আনায়, কিন্তু লুসির দেনা আর শোধ যায় না। প্রতি মাসেই তার ভাই আসিয়া ধমক ধামক দিয়া তার তহবিল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। শেষে নন্দন ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য যে টাকা জমা দিয়াছিল, তাহাও তুলিয়া আনিয়া লুসির জন্য বিসর্জ্জন করিল। এইরূপে মাস ছয়েক কাটিয়া গেল। তখন এ জ্বালা অসহ্য হইতেছে দেখিয়া, দেশে ফিরিয়া যাওয়াই সে শ্রেয়ঃ মনে করিল।

১০

নন্দন দেশে ফিরিবার সংকল্প করিয়া, প্যাসেঞ্জ ট্যাশেজ সব ঠিক করিয়া, সাউথসিতে স্যার জেমসের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইতে গেল। স্যার জেমস্ সে দিন কর্ম্মোপলক্ষে লণ্ডনে গিয়াছেন, নন্দনকে সে দিন কাজেই তার বাড়ীতে থাকিতে হইল। সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরে আনমনে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ লুসির সঙ্গে তার চোখো-চোখি হইল। লুসির মাথায় চাকরাণীর টুপি, গায়ে চাকরাণীর "এপ্রণ", একখানা পেরেম-বুলাটারে একটী হৃষ্টপুষ্ট শিশু শুইয়া আছে। লুসি তাহাকে হাওয়া খাওইয়া বেড়াইতেছে উভয়ে উভয়কে দেখিতে পাইল। নন্দন পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছিল, লুসি তাহাকে ডাকিয়া অভিবাদন করিল।

"গুড মর্ণিং মিষ্টার লাল, পুরাণো পরিচিতদের কি অমনি করে "কাট" করা ভাল?"

নন্দন লজ্জিত হইল। বলিল—"মাপ কর লুসি আমি আন্‌মনে বেড়াচ্ছিলাম, "কাট" কত্তে চাইনি। যাক্, ভাল আছ তো? কতকাল তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

"ভাল আছি, মিষ্টার লাল! এখন তো

লণ্ডনে থাকি না যে মাসে মাসে গিয়া দেখা করব। এখন এখানেই চাকরি করি। ভাল কথা, মিষ্টার লাল, তুমি যে আমায় পনেরটা পাউণ্ড পাঠাইয়াছিলে, তার জন্য তোমার অসংখ্য ধন্যবাদ দেই। কি বিপদের সময়ই যে তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, বল্‌তে পারি না। তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে, অবশ্যি।" "চিঠি? কি চিঠি? তোমার কোনও চিঠি তো কখনও পাই নাই। তবে তোমার ভাই আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করে।"

লুসি আকাশ থেকে পড়ল।—"আমার ভাই? আমার ভাই আবার কে? আমার তো ভাই টাই কেউ নাই?"

"বাঃ, তামাসা কর কেন, লুসি? সে যে তোমার নাম করে আমার কাছ থেকে প্রতি মাসেই দশ পনের পাউণ্ড লইয়া আসিতেছে।"

"মিষ্টার লাল, আমি সত্যি বলছি, এর কোনও কথাই আমি জানি না। আমার মা মর্ত্তে বসেছিল, তুমি তখন পনরটা পাউণ্ড পাঠিয়ে তাকে বাঁচিয়েছ। তোমার এ ঋণ আমি জন্মে শোধ দিতে পারব না। আর আমি কি খামকা খামকা তোমাকে এমনি করে শোষণ কর্ব্বো? আর আমার তো এখন কোনও অভাব নাই। আমি এই ছেলেটির সেবা করি। আমার মনিব বড় ভাল লোক, ছেলেটাকে আমি বড় ভালবাসি দেখে, আমার বছরে খাওয়া পড়া ছাড়া পঞ্চাশ পাউণ্ড করে দিচ্ছেন। তুমি তো জানই মিঃ লাল, আমার মত অন্য চাকরাণীরা পঁচিশ ত্রিশ পাউণ্ডের বেশী কখনও পায় না। কিন্তু তুমি আমায় টাকা দিচ্ছ, সে কি কথা?"

"তোমার নিজের ছেলে কোথায় লুসি? তার খরচ তো তোমার জোগাতে হয়।"

"আমার নিজের ছেলে? তুমি বলছ কি মিঃ নন্দন! আমার যে বে'ই হয়নি, তা ছেলে পাব কোথায়?"

"একদিন তো তুমি তাকে নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিলে।"

"ওঃ তাই বুঝি তুমি মনে করে রেখেছ? সে যে এই ছেলে, আমার মনিবের ছেলে। তখন তারা লণ্ডনে তোমাদের বাড়ীর কাছেই থাক্‌তো। আমি কেমন অ্যাক্‌ট কত্তে পারি, তাই তোমায় দেখাতে গেছিলুম।"

"এই ছেলের জন্যই তো তোমার ভাই আমার কাছ থেকে মাস মাস দশ পনর পাউণ্ড করে নিচ্ছে?"

"কে তোমায় ঠকিয়েছে, মিঃ লাল, কে তোমায় ঠকিয়েছে!—হাঁ; আমি ব্যাপারখানা এখন বুঝতে পারছি। যে দিন আমি তোমার কাছে গিয়াছিলাম, সে দিন একটী লোক আমার সঙ্গে ছিল, তখন সে আমার সঙ্গে ঘুরতো ফিরতো। তাকে আমি তোমায় কেমন ভয় দেখিয়ে এসেছি তা বলি। সে-ই পনের পাউণ্ডের চেক্ আমায় এনে দেয়। সে লোক ভাল নয় দেখে অল্পদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। সেই তোমার শোষণ কচ্ছে। একটা তামাসার ফল এতটা গড়াবে স্বপ্নেও ভাবি নাই মিঃ লাল। আমায় মাপ কর। না জেনে বড় অন্যায় করেছি।"

নন্দন লুসিকে ক্ষমা করিল বটে কিন্তু তার

বারিষ্টার হওয়া আর হইল না। সেদেশের ক্ষুরে দণ্ডবৎ করিয়া, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

বাপকে বল্লে—সে দেশের হাওয়া তার সহিল না! দেশের লোকেও তাই বুঝে গেল, কিন্তু নন্দন মনে জানে সভ্যতাটাই তার সইল না।

শ্রীঃ—

মনসার ভাসান।

(২)

বেহুলা এক অপার্থিব চরিত্র। স্ত্রীজাতির মহত্ত্বের ও তেজের এমন উজ্জ্বল নিদর্শন, এমন বিরাট আদর্শ বঙ্গ সাহিত্যে দ্বিতীয় আছে কি না তাহা আমরা জানি না। পৌরাণিক সাহিত্যেও বড় বেশী নাই। সাবিত্রী যেমন ভারতবর্ষের সতীত্বের আদর্শ, তেমনি বহুদিন যাবৎ বেহুলা বঙ্গদেশের সতীত্বের আদর্শ স্বরূপ আদৃত ও পূজিত হইয়াছিল এখন কি আর তাহা আছে? বেহুলার সে আদর এখন আর আমরা দেখিতে পাই না, কারণ প্রাচীন কাব্যগুলি ক্রমশঃ বিস্মৃতির কবলে যাইতেছে। কিন্তু বেহুলার চরিত্র হিন্দুস্ত্রী মাত্রেরই অবগত হওয়া উচিত ও সেই চরিত্র দ্বারা প্রত্যেক হিন্দুনারীর অনুপ্রাণিত হওয়ারও প্রয়োজন যথেষ্ট হইয়াছে। যদি সংসারে সুখের প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা থাকে তো বেহুলার মত স্ত্রীরত্নের যত আদর হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। বেহুলার চরিত্রে পাতিব্রত্যের যে তীক্ষ্ণতা, স্বাধীনতার যে পবিত্র প্রকাশ রহিয়াছে তাহা আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান স্বরূপ। বেহুলার চরিত্রের অপ্রাকৃত মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য আমাদের মনে জাগরূক থাকুক!

বেহুলা একটা গ্রাম্য বালিকা—কিন্তু ইহার এমন অনেকগুলি গুণের কথা কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা স্ত্রীজাতিতে আমরা এখন হারাইয়াছি এবং হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ক্ষেমানন্দ লিখিয়াছেন—

শিশুকাল হইতে বাম শিখে নৃত্যগীত।

* * *

মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ যায়॥

এই নৃত্যগীত শিক্ষার জন্য যে সমাজে তাহার কোনও রূপ নিন্দা বা গঞ্জনা ছিল মনসার ভাসানে তাহা প্রকাশ নাই, অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে স্ত্রীজাতির নৃত্যগীতশিক্ষা সমাজে একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। কবে এবং কেন যে এই সুন্দর প্রথা রহিত হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই জানি না, সম্ভবতঃ মুসলমানদের আমলে হইয়া থাকিবে; যে কারণেই হউক ঐ প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালী-জীবনের অর্দ্ধেক পবিত্র আমোদের অবসান হইয়াছে তাহাতে ভুল নাই। আমাদের পদ্মিনীগণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রমণীগণ "নৃত্যগীতানুরক্তা" বলিয়া বিশেষিত হইতেন; কিন্তু এখন আমাদের

রমণীগণ গান গাহিতে জানেন না, কারণ গান গাহিলে সমাজে নিন্দা হয়; নৃত্যের তো কথাই নাই। সুসঙ্গীত শ্রবণ ও সুনৃত্য দর্শনের পিপাসা মনুষ্য-হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু এখন আমাদের সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, এবং সে সুখ উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইলে তাহার চরিতার্থ সম্পাদন করিবার স্থান সকল সময় সকলের পক্ষে নিরাপদ নহে। চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে নৃত্য ও গীত দুইটী প্রধান কলা। ভদ্রঘরের স্ত্রী মাত্রকেই এই চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত, ইহাই আমরা প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। কবি ক্ষেমানন্দ এই নৃত্যগীতের সাহায্যে বেহুলা দ্বারা কত বড় কার্য্য সাধিত করাইয়া লইয়াছেন তাহা মনে করুন দেখি। গানের মত নির্ম্মল আনন্দ আর কিছুতেই নাই! সেই নির্ম্মল আনন্দ নির্ম্মল স্থান হইতে পাইলে বড় সুখের হয়।

বেহুলার চরিত্র হইতে আমরা আর একটা সামাজিক তথ্যের পরিচয় পাই—তাহা স্ত্রী-স্বাধীনতা। এখনকার দিনে আমাদের স্ত্রীজাতি যে ভাবে অবরোধান্তর্গত হইয়াছেন তখন তেমন ছিল না, তাহা বেহুলার একাকিনী নৌকাযাত্রা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। অন্যান্য প্রাচীন কাব্য হইতেও এ বিষয়ের অল্পবিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু বেহুলার এই কীর্ত্তি ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এখনও নগরে যে ভাবে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, আমাদের পল্লীগ্রামগুলিতে তাহা সে ভাবে প্রচলিত নাই, সেখানে গ্রাম্যবধূরা কতকটা স্বাধীন জীবনযাপন করিবার অবসর পান, এবং বরাবর তাহা পাইয়া আসিয়াছেন। মনসার ভাসান কাব্যে ইহারও প্রমাণ আছে! অনেক বিষয়ে হিন্দুরা যতটা স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে পারেন, অন্য কোনও জাতি তেমন পারেন কি না সন্দেহ। তীর্থক্ষেত্রে যাও এ কথার প্রমাণ যথেষ্ট মিলিবে। তবে হিন্দুর স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্থে সংযমহীনতা নহে, বিলাস প্রিয়তাও নহে। স্ত্রীস্বাধীনতার দোহাই দিয়া লজ্জাহীনতার প্রশ্রয় দেওয়া অথবা ভারতস্ত্রীর চরিত্রের চির কল্যাণময়ী শালীনতার হানি করা, কিম্বা মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের মহিমার হানিকর ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপুষ্টি সাধন আমাদের সমাজে মঙ্গলকর নহে।

বলা বাহুল্য যে পত্নীত্বের গৌরব সংস্থাপনই বেহুলার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। পত্নীত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে সকল গুণের আবশ্যক কবি প্রাণ ভরিয়া বেহুলাতে সেই সকল গুণ অর্পণ করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের সর্ব্বোত্তম সহচর চরিত্রের দৃঢ়তা, পাতিব্রত্য স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্টতম মহত্ত্ব, সেইজন্য পাতিব্রত্য ধর্ম্মের চরম সাধনার জন্য দৃঢ়তা বিশেষরূপে আবশ্যক। গ্রাম্যকবি ক্ষেমানন্দ তাঁহার বেহুলার চরিত্রে যে দৃঢ়তা অর্পণ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের সাবিত্রীর চরিত্রের দৃঢ়তা মনে পড়িয়া যায়। বালিকাকাল হইতেই বেহুলার চরিত্রে এই দৃঢ়সংকল্পতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম হইতেই কবি তাঁহাকে মনসার অর্থাৎ মহাশক্তির শক্তিশালিনী সেবিকারূপে দেখাইয়াছেন; তাহার ভক্তি সর্ব্বাবস্থাতেই অচলা। এই ভক্তির অঙ্গটুকু আমাদের রমণীরা এখনও হারায় নাই, এখনও তাই আমাদের ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ বজায় আছে। ভক্তির

বলে বেহুলা অসাধ্য সাধন করিয়াছে, শক্তিরও প্রতিজ্ঞা টলাইয়াছে, কারণ শক্ত বা শক্তি চির দিন ভক্তের ভক্তির কাছে পরাজিত; এ পরাজয়ে ভগবানের বা তাঁহার শক্তির আনন্দ। দেব-চরিত্রের চিত্রণে কবি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি. কিন্তু এই তথ্যটুকু কোথাও লুকান নাই। বেহুলা মনসার "ব্রতদাসী." তাই শিবনন্দিনী তাহার প্রতি সর্ব্বদা করুণাময়ী; ছলনা-করিতেও যত মজবুত, তাহাব মনস্কামনা পূর্ণ করিতেও তেমনি প্রস্তুত। তবে একটু বাঁকা পথ অবলম্বন করিতেও পেছপাও নন। বেহুলাব সহিত মনসাব এই কপট ছলনা গুলিতে কবি একটু রসেব ছিটা ফোঁটা দিয়াছেন, এবং প্রকারান্তবে নাবা-চবিত্রেব একাংশ সবলভাবে উন্মুক্ত কবিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি যে, প্রাচীন কবিগণেব কাছে দেব-চরিত্রে ও মনুষ্য চবিত্রে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না; তাঁহারা দেব চবিত্র অব-লম্বনে মনুষ্য-চরিত্রই প্রকটিত করিয়াছেন।

ছলিতে আপন দাসী জগাতী কমলা।
প্রাচীন ব্রাহ্মণী বেশে ঘাটেতে বসিলা॥
ছদ্মবেশে দেবী তখন রহিল একধারে।
বেহুলা নাচনী আইল তথা ধীরে ধীরে॥
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী।
মনসার গায়ে পড়ে গোড়ালীর পানি॥
বুড়ী বলে আলো তুই গেলি ছারখারে।
চক্ষে নাহি দেখ তুমি কোন্ অহঙ্কারে॥
বেহুলা বলেন আমি সায় বেণের ঝি।
বাপের পুকুরে নাই তোরে লাগে কি॥
বুড়ী বলে আমারে দেখিয়া ক্ষীণ বল।
সে কারণে দিলি বুঝি গোড়ালির জল॥
বেহুলা বলেন বুড়ী তুমি নাহি ভাল।
না দেখে আপন দোষ পরে মন্দ বল॥
তুমি যে বসেছ ঘাটে আমি নাহি জানি।
কেমনে লাগিল গায়ে গোড়ালির পানি॥

এই রকম ছলনা ও বাক্‌চাতুরি কবি আরও লিখিয়াছেন।

স্বর্গপুরে বেহুলার নৃত্যগীতে মুগ্ধ হইয়া দেবগণ মনসাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং মনসা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেহুলার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ বেশ অভিমান ব্যঞ্জক এবং এ প্রকার বাক্‌চাতুরির চূড়ান্ত। কবি বেহুলাকে দিয়া মনসাকে বড়ই জব্দ করাইয়াছেন, দেবসভায় তাঁহাকে নাকাল করিয়া একটু হাসিয়া লইয়াছেন। পরাজিত হইয়াও যে পরাজিত হইতে চাহে না, তাহার মুখে যে রকম কথা বাহির হয়—মনসার মুখেও কবি সেই প্রকাব ন্যায়সঙ্গত কথাই বসাইয়াছেন :—

"শুনহ বেণীর বেটী বেহুলা নাচনী।
তোর শ্বশুব বলে মোরে চেঙ্গমুড়ি কানি॥
আমার সনে বাদ করে রাখিয়াছে দাড়ী।
হাতে করে লইয়া ফেরে হেতালের বাড়ী॥
* * *
না করে আমার পূজা চাঁদ সদাগর।
* * *
অবশেষে খাইলাম পুত্র নখিন্দর॥
কেমনে আইলি তুই দেবতা সভায়।
তোর তরে আমি এত পড়িলাম লজ্জায়॥

নির্জ্জলা মানুষের ছবি। যাহা হোক্ বেহুলার ভক্তির কাছে মনসার অভিমান টিকিল না, তাঁহাকে বেহুলার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইল।

বেহুলা কোনও কার্য্যে পশ্চাদ্‌পদ নহে; তাহা কবি গোড়া হইতেই বলিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের স্ত্রীচরিত্রগুলির চর্চ্চা করিলে মনে হয় যে, বাঙ্গালী রমণীর চরিত্রে তখন দৃঢ়তা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। শুধু মনসার ভাসানে নহে, অন্যান্য প্রাচীন কাব্যেও ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালী-রমণী বলিলে এখন যেমন মানসপটে একটা প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে স্ত্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তখনকার বঙ্গললনা এখনকার মত লজ্জা-কুলিতা কোমলতাময়ী হইলেও আজকালকার মত দীপ্তি ও তেজোহীনা ছিলেন না—মনসার ভাসান কাব্যের বেহুলা চরিত্রের অসম-সাহসিকতা স্পষ্টাক্ষরে সেই গৌরব নির্দ্দেশিত করিতেছে। যে কোনও বড় কাজ করে, তাহার সংকল্পের স্থৈর্য্য এবং সাহসের প্রাচুর্য্য দুই-ই থাকা চাই। বেহুলার এই দুইটি মহা গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাইবার জন্য কেনা চেষ্টা করিয়াছিল? শ্বশ্রূ সনকা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সকল লোকে এবং শেষে তাহার ভ্রাতারা কাতর-বাক্যে তাহাকে তাহার দুষ্কর ব্রত হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তপস্যায় বদ্ধপরিকরা উমাকে যেমন কেহই ফিরাইতে পারে নাই, তেমনি বেহুলাকেও কেহ ফিরাইতে পারে নাই। সৎকার্য্যের জন্য স্ত্রীহৃদয়ে এমনি প্রখর বলবত্তা থাকা জগতের অশেষ শুভকর। ক্ষুদ্র গ্রাম্যকবির কাছে যদি আমরা এই সুশিক্ষাটুকু পাই, তাহা হইলে কি আমরা অনেকটা উচ্চে উঠিতে পারিলাম না?

রমণীহৃদয়ের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও স্বার্থহীনতা এই দুইটি গুণের উপর সংসারের প্রতিষ্ঠা—সংসারের যাবতীয় মঙ্গল ও সুখ। ভারত-রমণী চির-দিন এই দুই গুণে ও নির্ম্মল পাতিব্রত্যের আদর্শ সংস্থাপন দ্বারা জগৎকে পবিত্র করিয়া আসিতেছেন; যদি আমাদের পতন গভীরতর না হইতে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রমণী হৃদয়ের এই সকল মহতী বৃত্তিগুলিকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। সেই সঙ্গে নিজেদের উন্নতিসাধন করিতে পারিলে দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে, অন্ধানু-করণ দ্বারা কখনই তাহা হইবে না। দুঃখের বিষয় স্ত্রী চরিত্রের এই মহতী অভিব্যক্তি সজীব চিত্রের সাহায্যে আধুনিক কবিরা বড় একটা দেখাইতে প্রয়াস করেন না। গ্রাম্য কবি ক্ষেমানন্দ কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মানসী বেহুলার চরিত্রে এই সদ্‌গুণ গুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বেহুলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা আমরা বলিয়াছি, এখন তাহার অপরাপর গুণের কথাও কিছু বলিব। বেহুলা কখনও নিজের সুখের মোহে কর্ত্তব্য ভোলে না; যখন তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে পারিল তখন তাহার কত আনন্দ? যে মহাব্রতের অনুষ্ঠানে কত কষ্ট--কত যন্ত্রণা—কত বিপদ্ মাথার উপর দিয়া গিয়াছে; সেই ব্রতের উদ্‌যাপনে, সেই ব্রতের সার্থকতায় তাহার কত গভীর আনন্দ, তাহা বেহুলার মত পতি-ব্রতার হৃদয় বুঝিতে পারিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু এত আনন্দেও সে আত্মহারা হয় নাই; তাহার শ্বশুরের অপর ছয় পুত্রের প্রাণ ও ধনরত্নের ভিক্ষা করিয়া লইতে ভুলে নাই। নিজের সুখে নিমগ্ন হইয়া অপর ছয়টী দুঃখিনীর কথা সে ভুলিয়া যায় নাই। ইহাই প্রকৃত

মহত্ত্ব, প্রকৃত হিন্দু স্ত্রীত্ব। হিন্দু স্ত্রী স্বামীর সেবায় রত থাকিয়াও সংসারের মঙ্গল দেখে, সংসারের আর পাঁচজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য খোঁজে; শুধু স্বামী নহে, স্বামীর সংসার তাহার নিজের হয়। ইহাই হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ।

তার পর বেহুলার কর্ত্তব্য নিষ্ঠা—হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির উপরে অবস্থিত। নিজের আন্তরিক প্রবৃত্তি, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এ সকলি সেই কর্ত্তব্য নিষ্ঠার কাছে পরাজিত। শুধু পতির জীবন দান করিয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই, পতির ছয় সহোদরকে বাঁচাইয়াও তাহার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই, শ্বশুরের নষ্ট ধন উদ্ধার করিয়াও সে তাহার কর্ত্তব্যের শেষ মনে করে নাই; শ্বশুরের আত্মার উদ্ধার করাই তাহার শেষ কর্ত্তব্য ইহা সে জানিত, তাই যখন মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া—যোগিনীর বেশে সে পিতা মাতার দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের পরিচয় পাইয়া যখন পিতা মাতা ও ভ্রাতারা এবং আত্মীয় স্বজন আসিয়া সেখানে অন্ততঃ এক দিনও থাকিবার জন্য কত অনুনয় করিলেন, তখন সে তাহার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া অনায়াসে সেই অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

অমলা বলে বেহুলা আইস নিজঘরে।
বেহুলা বলেন আমি যাব কোথাকারে॥
শুন শুন জন্মদাতা শুনগো জননী।
মোর কান্তে খেয়েছিল দেবীর কালফণী॥
আমার শ্বশুর তাঁর করে অপমান।
এত দিনে পূজিবেন হইয়ে সাবধান॥
আর কিছু মোর তরে না কর জিজ্ঞাসা।
পরিচয় শেষ আছে পূজিলে মনসা॥
যাত্রাকালে প্রণাম করিল বাপ মায়।
হায় হায় বলি রামা ধূলায় লুটায়॥
কাতর হইয়া কান্দে নগরের লোক।
কেন কেন তবে আইলে জাগাইতে শোক॥
বিনয়ে প্রণতি কৈল পিতার চরণে।
বিদায় হইল পুরী কান্দয়ে সঘনে॥

বহু দিন অদর্শনের পর, আজ সে পিতা-মাতার স্নেহময় কোল পাইয়াছে, কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা, কত বিপদ সহ্য করিয়া আজ কত দিনের পরে সে পিতামাতার কাছে আসিয়াছে, কোথায় দুদিন সেখানে আনন্দে কাটাইবে, সকলকে আনন্দ বিলাইবে, তা নয়, সে সেই সুখ সেই আনন্দ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া নিজের কর্ত্তব্যের পথে ছুটিয়া চলিল। সেও কি কম উৎসাহ! যে পরের জন্য ভাবিতে পারে, যে পরের সুখ দুঃখ বুঝিতে পারে, তাহার হৃদয়ে সেই সুখ বিতরণ করিবার কল্পনায় কি কম আনন্দ! বেহুলা আজ চিরদুঃখিনী শ্বশ্রূকে সাতটী পুত্র উপহার দিবে, ছয়টী বিধবাকে পতি উপহার দিবে, শ্বশুরকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণতা সাধন করিবে, এ কি কম উৎসাহের কম আনন্দের কথা! আর এক দিন যেমন সে সকলের অনুরোধ বিনয় অবহেলা করিয়া নিজ নির্ব্বাচিত মহা কর্ত্তব্যের পথে ধাবিত হইয়াছিল, আজও তেমনি সেই আনন্দময় মুহূর্ত্তের হৃদয়-ভরা আবাহন উপেক্ষা করিয়া সে নিজের গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। কি সুন্দর এই কর্ত্তব্য বুদ্ধি! কি মহান্ তাঁহার আত্ম সংযম! এমন আত্ম-সংযম, এমন কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, এমন পতিভক্তি যে কাব্যে তাহা গ্রাম্য

কাব্য হউক বা আধুনিক কাব্য হউক সে কাব্য ঘরে ঘরে আদৃত হউলে—দেশের মঙ্গল হইবে। আধুনিক কবি কেহ এইরূপ কাব্য লিখিতে চেষ্টা করিবেন কি ?

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংসারচন্দ্র যখন জয়পুর স্কুলে নিযুক্ত হইলেন, যদিও তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি তখন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যপরিচালন-প্রণালী শৃঙ্খলা-বদ্ধ হয় নাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হরিমোহন বাবুর যত্নে স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। জয়পুরে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের সেই প্রথম চেষ্টা। তখনকার দিনে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংগ্রহ এবং নানা উপায়ে ছাত্রদিগকে ইংরাজী শিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং তাহাদের মনোরঞ্জন করা এক প্রধান কাজ ছিল। উৎসাহী যুবক সংসার-চন্দ্রকে সহকারীরূপে পাইয়া কান্তি বাবু বিদ্যালয়ের গঠন ও উন্নতি-কার্য্যে মনোযোগ দিলেন, নিজের উৎসাহ এবং উদ্যম অন্যের মনে সঞ্চারিত করা কান্তি বাবুর এক অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা ছিল। এ দিকে সংসারচন্দ্রও অসাধারণ পরিশ্রমী,—শ্রমে কখন তাঁহার ক্লান্তি ছিল না।

সে সময় অধ্যাপনার বিষয়-বিভাগ ছিল না—যিনি যে শ্রেণীর শিক্ষক তাঁহাকে সে শ্রেণীতে সকল বিষয়েই অধ্যাপনা করিতে হইত। তাই শিক্ষাদান বেশ শৃঙ্খলার সহিত হইতে পারিত না। অনতিকালের মধ্যে উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্কুলের কর্ম্মপ্রণালী নিয়মবদ্ধ হইল এবং প্রাথমিক শ্রেণী হইতে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত গঠিত হইল।

সে সময়ে সংসারচন্দ্রের দৈনন্দিন লিপিতে দেখা যায় যে তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রাতে নিজে অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুত হইতেন, বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে পড়াইয়া বৈকালে ছাত্রদিগকে 'রাম-নিবাস' বাগানে ব্যায়াম ও ক্রিকেট প্রভৃতি ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতেন এবং নিজে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। সন্ধ্যার পর আবার স্কুলে গিয়া ছাত্রদিগকে পরদিনের পাঠ প্রস্তুতের সাহায্য করিতেন।

আজ-কালকার এই বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের দিনে শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে কেবল একটা সময়ের সীমার দ্বারা বদ্ধ নিয়মের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। গুরু-শিষ্যের যে স্নেহ-মধুর সম্বন্ধ ভারতবর্ষের আদর্শ তাহা এই দশটা-চারিটার স্কুল মাষ্টারীর দিনে আমরা হারাইয়াছি। শিক্ষার্থীদিগকে সংসারচন্দ্র

কখনও এই স্কুলমাষ্টারের চক্ষে দেখেন নাই। তিনি একাধারে তাহাদের শিক্ষক, বন্ধু, উপদেষ্টা এবং খেলার সাথী ছিলেন। কোন ছাত্র স্কুলে অনুপস্থিত হইলে, তিনি তাহার গৃহে গিয়া সংবাদ লইতেন, বিপথে গেলে তাহাকে সদুপদেশের দ্বারা সংশোধন করিতেন এবং বিপদে তিনি তাহাদের একান্ত বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পুরাতন ছাত্রেরা এখনও সে দিনের কথা বর্ণনা করিয়া থাকেন। তিনিও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার সি, আই ই, উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার ছাত্রগণের উৎসাহে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন—সে সভায় সংসারচন্দ্র বলিয়া ছিলেন—'Standing here among you in the evening of my life, I recall the time when many of you, who are now grown up men, were boys whom I loved so well and whose career I watched with so much fond interest"— জীবনের প্রদোষকালে আজ তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমার সেই সময়ের কথা মনে পড়িতেছে, যখন, আজ তোমাদের মধ্যে যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাহারা আমার একান্ত স্নেহভাজন বালক মাত্র ছিলে। তখন হইতে চিরদিনই আমি তোমাদের কার্য্যকলাপ ও উন্নতি বিশেষ আগ্রহের সহিত ও সস্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি।) বাস্তবিকই পুরাতন ছাত্রদিগের সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহার মুখে যে স্নেহের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত, তাহা অনন্যসুলভ।

সংসারচন্দ্র যদিও দিবসের অধিকাংশ সময়ই ছাত্রদিগের সহিত কাটাইতেন এবং তাহাদের সকল প্রকার খেলার সাথী ছিলেন—তথাপি তাঁহার শাসন কখনও শিথিল হইত না। বেত্রদণ্ডের অপেক্ষা তিনি ছাত্রদিগের সমক্ষে উচ্চ আদর্শ স্থাপনেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন—দোষীকে শারীরিক দণ্ডবিধান না করিয়া তিনি ছাত্রদিগের মনে আত্মসম্মান উদ্বোধনের দ্বারা তাহাদিগকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন।

স্কুলে সংসারচন্দ্র নানা উপায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহারাজ-কলেজে 'গ্যালারী-ক্লাশ' প্রবর্ত্তনের তিনি প্রধান উদ্যোগী। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য কলেজের হলে পরিচিত উদ্ভিদ, পশু-পক্ষী এবং ধাতু সকলের আদর্শ বা মডেল model) শ্রেণী বা পর্য্যায় হিসাবে রক্ষিত হইত। প্রত্যেক বিভাগে প্রতি মডেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত থাকিত। সংসার-চন্দ্র এক একটি মডেল অবলম্বনে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা করিতেন। কঠিন বিষয়কে মনোজ্ঞ করিয়া বলিবার তাঁহার এমন একটা ক্ষমতা ছিল যে, বালকগণ সহজে এবং আনন্দের সহিত এ সকল বুঝিতে ও শিখিতে পারিত। সংসারচন্দ্রের যত্নে অতি অল্পদিনের মধ্যে এই গ্যালারী-ক্লাশ ছাত্রদিগের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। সপ্তাহে একদিন করিয়া এই ক্লাশ বসিত। শিক্ষা ও আনন্দের এই অপূর্ব্ব সংমিলনের দিনের জন্য ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত। তখন এ প্রদেশে শিক্ষকগণ Kinder-garten প্রণালীর নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না এবং

শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার উপকারিতা সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন নাই—সেই সময়ে সংসারচন্দ্র জয়পুর-স্কুলে এই শিক্ষা-প্রণালীর প্রচলন করেন।

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে সময় জয়পুর কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল এবং ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিবার জন্য আগ্রায় যাইতে হইত। সংসারচন্দ্র বহুকাল আগ্রায় ছিলেন এবং তিনি ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয়, এজন্য পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের সহিত কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকেই আগ্রায় পাঠাইতেন। পরীক্ষাশেষে সংসারচন্দ্র ছাত্রদিগকে আগ্রার কেল্লা, তাজমহল, ইতমাদ্-উদ্দৌলা, সেকেন্দ্রা প্রভৃতি পুরাতন কীর্ত্তি সকল দেখাইতেন এবং সে সকলের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অতীতগৌরবস্মৃতি জাগরিত করিয়া শিক্ষার কঠোরতাকে আনন্দে পরিণত করিতেন।

সংসারচন্দ্র নিজে একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন—জীবনের নানা কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা কখনও বন্ধ হয় নাই। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহাতে সাহিত্য-চর্চ্চা হয় সেজন্য তিনি কলেজে এক তর্কসভা (Debating Club) স্থাপন করেন। তিনি এ সভার সভাপতি হইতেন এবং উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা ও তর্কে যোগদান করিয়া ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন নিজের ছাত্রজীবনে সুবিখ্যাত ডাইটন-প্রমুখ অধ্যাপক ও ইংরাজ-মিশনরী এবং ইংরাজ-সহপাঠী-দিগের সাহচর্য্যে সংসারচন্দ্র ইংরাজীতে কথোপ-কথন করা এবং বক্তৃতা দেওয়া সুন্দররূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল যে, তাঁহার ছাত্রগণের শিক্ষাতেও যেন এ বিষয়ে ত্রুটি না হয়।

বাল্যকালে সংসারচন্দ্রের শরীর বড় দুর্ব্বল ছিল; সেজন্য সহপাঠী বিশেষতঃ ইংরাজ বালক-দিগের নিকট তিনি প্রায়ই নিগৃহীত হইতেন। ইহার ফলে সংসারচন্দ্র শারীরিক উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিলেন। প্রতিদিন নিয়মমত ব্যায়াম করা, পাঞ্জা লড়া, অশ্বারোহণে বা পদব্রজে ভ্রমণ এবং ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার শরীর দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইল এবং ক্রিকেট ও অশ্বারোহণে পারদর্শী বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিলেন। কৈশোর ও যৌবনের একান্ত চেষ্টাতেই উত্তরকালে তাঁহার স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত উন্নত বলিষ্ঠ দেহ সকলের কামনার বিষয় হইয়াছিল। অল্প বয়সেই তাঁহার কব্জি এত শক্ত হইয়াছিল যে, অনেক অধিকবয়স্ক লোকের সহিত পাঞ্জা লড়িবার সময় তাহারা তাঁহাকে পাঞ্জা ধরিয়া শূন্যে উঠাইয়া লইয়াও তাঁহার হাত বাঁকাইতে পারিত না। আঙ্গুলের দ্বারা চুলের নির্ম্মিত 'জালি' তিনি অনায়াসে ভাঙ্গিতে পারিতেন। সংসারচন্দ্রের শারীরিক বলের সম্বন্ধে এত কথা বলা হয় ত অবান্তর হইল—কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী বুঝিতে ইহা নিতান্ত অবান্তর নহে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—সংসারচন্দ্র এ মহাজনবাক্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন—তাই শিক্ষকতাকালে তিনি বালকদিগের শারীরিক উন্নতি বিধানে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে জয়পুরে "*Boys*'

Sports" নাম দিয়া বিদ্যালয়ের বালকদিগের ক্রীড়াপ্রদর্শনের বাৎসরিক অধিবেশনের আরম্ভ হয়। রামনিবাস বাগানে এই উৎসবের অধিবেশন হইত। মহারাজ রামসিংহ স্বয়ং পারিষদবর্গের সহিত ইহাতে যোগদান করিতেন, রেসিডেণ্ট প্রভৃতি ইংরাজেরাও উপস্থিত থাকিতেন। তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া কলেজের ও স্কুলের ছাত্রদিগের নানাবিধ ক্রীড়া এবং ব্যায়াম-কৌশল দেখান হইত। সমস্ত বন্দোবস্তের ভার সংসারচন্দ্র গ্রহণ করিতেন এবং সর্ব্বশেষে ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বালকদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

স্বর্গীয় রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় যখন মহারাজ-কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস্ শ্রেণী খোলা হইল, তখন কলেজে ইতিহাস এবং তর্কশাস্ত্র Logic) পড়াইবার ভার সংসারচন্দ্রের উপর অর্পিত হইল। সংসারচন্দ্র যখন যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতেন, সামান্যই হউক আর বৃহৎই হউক, তিনি তাহা সম্পূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন—তাঁহার চরিত্রের ইহা এক প্রধান উপাদান ছিল। ক্রিকেট খেলা হইতে জটিল রাজকার্য্য পর্য্যন্ত তিনি নিখুঁতভাবে শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেন— কোন কাজের সামান্য ত্রুটিও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ইতিহাস ও লজিক পড়াইবার ভার লইয়া তিনি যে অধ্যবসায়ের সহিত নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে ফার্ষ্ট আর্টস্ কেন, কঠিনতর পরীক্ষার জন্য অধ্যাপনা অনায়াসে করিতে পারিতেন।

মহারাজ-কলেজের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের রাজপুত্র ও সর্দ্দারদিগের পুত্রগণের শিক্ষার জন্য 'রাজপুত নোবল্‌স্ স্কুল' (Rajput Nobles' School) স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় যদিও নামে কলেজের অধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, তথাপি অন্যত্র বসিত বলিয়া এবং ইহার কার্য্যপ্রণালীর উপর প্রিন্সিপালের বিশেষ কোন হাত ছিল না বলিয়া—সে সময়ে এই বিদ্যালয়ের কোন প্রকার উন্নতি হওয়ার উপায় ছিল না এখন দিনকাল বদলাইয়াছে,—অনেক রাজপুত সর্দ্দার তাঁহাদের পুত্র প্রভৃতিকে ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিতেছেন। তখনকার দিনে এই যোদ্ধৃজাতিকে শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। দূরদর্শী মহারাজ রামসিংহ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তদানীন্তন রেসিডেণ্টগণও এদিকে লক্ষ্য রাখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে এই রাজপুত-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইতেন। এইরূপ পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে শাসন ও শিক্ষার নিতান্ত অভাব দেখিয়া তদানীন্তন, রেসিডেণ্টের পরামর্শে মহারাজ সংসারচন্দ্রকে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সংসারচন্দ্র এই নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার শিক্ষাদানের এবং শাসনপ্রণালীর খ্যাতি সকলেরই পরিচিত ছিল—তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হওয়ায়, অনেক রাজপুত-সর্দ্দার আগ্রহ করিয়া আপন আপন পুত্র প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। সংসারচন্দ্রও তাঁহার স্বাভাবিক একাগ্রতার সহিত রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ এই সর্দ্দারদিগের উত্তরাধিকারীদিগের শিক্ষার

গুরুভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় অচিরেই এই বিদ্যালয় নূতন শ্রী ধারণ করিল।

রাজপুত-বিদ্যালয়েরএই শিক্ষকতা সংসার-চন্দ্রের জীবনে এক শুভ সুযোগ। এই খানেই তিনি বর্ত্তমান অম্বরাধিপতি মহারাজ মাধোসিংহকে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে যে জীবন-ব্যাপী সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, এইখানেই তাহার সূত্রপাত। মহারাজ মাধোসিংহ তখন ইসরদার ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার কায়েম সিংহ মাত্র। তখন কে জানিত যে, অদৃষ্টচক্রের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে এই চঞ্চলপ্রকৃতি বুদ্ধিমান্ যুবক ভবিষ্যতে জয়পুরের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন—কিন্তু সে কথা পরে।

এই সময়ের কথা এখনও মহারাজ আনন্দের সহিত স্মরণ করেন এবং চিরদিন সংসারচন্দ্রের নিকট ছাত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং বালকের ন্যায় আবদার-অভিমান করিতেন। ছাত্রজীবনের কথা বলিতে বলিতে একদিন মহারাজ, সংসারচন্দ্রের ভ্রাতা স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্রকে হাস্যচ্ছলে বলিলেন—"তোমার এই যে দাদাটিকে দেখিতেছ, ইনি বড় সহজ পাত্র নহেন—ইনি এক স্কুলে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমাকে মারিবার জন্য বলিতেন, 'কায়েম সিং, হাত লা'ও' মা'র খাইবার জন্য কে কবে হাত বাড়াইয়া দেয়? আমি প্রাণান্তে হাত বাড়াইতাম না। উনি মারিতে আসিলে, আমি টেবিলের চারিদিকে ঘুরিতাম। আর এখন—আমার সমক্ষে করযোড়ে বসিয়া আছেন। কি মারটাই আমাকে মারিয়াছেন!" সকলে হাসিতে লাগিল। সংসারচন্দ্রও হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মহারাজ, তখন যদি জানিতাম যে, আপনি জয়পুরের মহারাজ হইবেন—তাহা হইলে আপনাকে আরো ভাল করিয়া শিক্ষা দিতাম।"

১৮৬৬ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংসার-চন্দ্র শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল তাঁহার কর্ম্মচেষ্টা কেবল মাত্র অধ্যাপনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি সে সময়ে যে সকল সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন, এবং তৎসময়ে যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি।

মহারাজ রামসিংহ নাট্যকলার বিশেষ রসজ্ঞ এবং উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রধানত তাঁহারই উৎসাহে সাধারণের জন্য তখন মধ্যে মধ্যে মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটক সকল প্রাসাদে অভিনীত হইত। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী এবং কলেজের শিক্ষকগণ অভিনয় করিতেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ সেন এবং সংসারচন্দ্র এই সকল অভিনয়ের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন, থিয়েটারের সমগ্র বন্দো-বস্তের ভার ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত হইত। অভিনয়ে সংসারচন্দ্রের অসামান্য দক্ষতা ছিল,—তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ এবং অভিনয়-কৌশলে উপস্থিত ইংরাজ এবং দেশীয় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন। এই সকল অভি-নয়ের ফলে মহারাজ রামসিংহ বহু অর্থব্যয় করিয়া 'রামপ্রকাশ থিয়েটার-ভবন' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানে মহাকবি সেক্স-

পীয়রেব নাটকের অনুবাদ এবং পৌরাণিক নাটক সকল উর্দ্দূভাষায় অভিনীত হইত, বলা বাহুল্য যে, সর্ব্বসাধারণে এ সকল অভিনয় বিনামূল্যে দেখিতে পাইত।

তৎকালে যে সকল বাঙ্গালী পরিবার কর্ম্মোপলক্ষে জয়পুরে বাস করিতেন, তাঁহাদের মহিলাবৃন্দকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে "স্ত্রী উন্নতি-বিধায়িনী" সভা স্থাপিত হয়। জয়পুর মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী (পরে প্রেসিডেণ্ট) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই সভার সম্পাদক ছিলেন সংসারচন্দ্র এই শুভকার্য্যে তাঁহার একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন এবং নানা চেষ্টায় এই সভার উন্নতির সহায়তা করিয়াছিলেন। মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তখনকার ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করিয়া মহিলাদিগকে পড়িতে দেওয়া এবং নিয়মিত পাঠে উৎসাহ দেওয়া হইত পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মাসিক-পত্রিকা 'রহস্য-সন্দর্ভ' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া প্রতিগৃহে পর্য্যায়ক্রমে প্রেরিত হইত।

জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে মিতব্যয়িতা অভ্যাসের উদ্দেশ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সংসারচন্দ্র "Mutual Savings Deposit Bank" নাম দিয়া এক সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। তখনকার দিনে ইহা এক নূতন ব্যাপার। ইহার বহুদিন পরে সাধারণের হিতার্থে গভর্ণমেণ্ট পোষ্ট আফিসের সংসৃষ্ট সেভিংস্ ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন করেন এই ধনভাণ্ডারে সকল বাঙ্গালীই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে টাকা জমা দিতেন;—ফলে বিশেষ প্রয়োজনের সময় ঋণগ্রস্ত হইতে হইত না। দরকারমত এই ব্যাঙ্ক হইতে সামান্য সুদে ধারও দেওয়া হইত। সংসারচন্দ্র এই ব্যাঙ্কের ধনরক্ষক ছিলেন। স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্ত, যিনি প্রথমে মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী, এবং সংসারচন্দ্র মন্ত্রী হওয়ার পর প্রাইভেট সেক্রেটারী হ'ন, তিনি এই ব্যাঙ্কের সহকারী ধনরক্ষক ছিলেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সে সময় বাঙ্গলায় রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচারিত "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা" এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বাঙ্গলাদেশে এক নূতন যুগ এবং ধর্ম্মরাজ্যে নবীন আলোক আনয়ন করিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালা কেহই সে শিক্ষার প্রভাব না মানিয়া থাকিতে পারে নাই। জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকগণও নিজেদের মধ্যে উপাসনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন। সংসারচন্দ্র বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মানুরাগী। শৈশবে ও বাল্যে তাঁহার পিতামহী ও পিতৃদেবের আদর্শে এবং কৈশোরে মিশনারী কলেজের শিক্ষায় তিনি ধর্ম্মে ভক্তিমান্ তিনিও অতি আগ্রহের সহিত এই সমাজে যোগদান করিলেন। জয়পুর নগরের পুরাতন প্রবেশদ্বার "ঘাটের" বাগানে প্রতি সপ্তাহে এই সমাজের অধিবেশন হইত। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র যখন কলেজ হইতে মন্ত্রিসভায় উন্নীত হইলেন, তাহার কিছুকাল পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা স্বর্গগত পণ্ডিতবর কৃষ্ণবিহারী সেন এম, এ মহোদয় জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া এই প্রার্থনা-সমাজের বিশেষ বললাভ হইল—কিন্তু

এই সময়েই ইহার শেষ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে অধিবেশন হয়, তাহার রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায়, কৃষ্ণবিহারী বাবুর সহিত কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হইল—তাহার ফলে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনচেতা ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণবিহারী জয়পুরের কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে 'সমাজ'ও বন্ধ হইল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজের সরকারী পত্রিকা "জয়পুর গেজেট" প্রথম প্রকাশিত হয়। পর বৎসর হইতে স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ সেন এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েন। সংসারচন্দ্র বিদ্যালয়ের কর্ম্ম ব্যতীত এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া বহুকাল ইহার সম্পাদনকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর সম্পাদকতায় জয়পুর গেজেটের সঙ্গে সঙ্গে 'জয়পুর ডাইরেক্টরী"ও প্রকাশিত হইল। সংসারচন্দ্রের কাজ বাড়িল। তিনি বহু পরিশ্রমে এই 'ডাইরেক্টরী'র উপাদান সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করিলেন, ইহাতে জয়পুরের ইতিহাস ও বিবরণ এবং নানাপ্রকার অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় ও দিনলিপি থাকিত। সংসারচন্দ্রের চরিত্রে আলস্যপরায়ণতার লেশমাত্র ছিল না। শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার পরিশ্রমে তিনি কাতর বা বিমুখ হইতেন না। এই সময়ে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। প্রাইভেট সেক্রেটারী হওয়ার পর তিনি আর এ সকল কার্য্য করিবার অবসর পান নাই।

বৈদিক সাধনার আভাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠক দেখিয়াছেন, বৈদিক ঋষি কিরূপে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া, আজীবন কাতরকণ্ঠে দেবপদে প্রার্থনা করিয়া পাপাপনোদন করিতেন, বিশুদ্ধা ধীশক্তি লাভ করিতেন এবং অন্তিমে নির্ম্মলচিত্তে সবিতৃলোকের অধিকারী হইতেন। সে লোকে অজস্র আদিত্যাখ্য জ্যোতিঃ নিত্য বিরাজমান, সেখানে গেলে জীবকে আর তামস মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। জরামরণরহিত হইয়া জীব সেখানে অমরত্ব-পদে স্থাপিত হয়।

"ত্রিনাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং,
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।" কঠোপনিষৎ
১,১৭।

যিনি ত্রিবিধ উপায়ে (অধ্যয়ন, হৃদয়ঙ্গম ও অনুষ্ঠান দ্বারা) নাচিকেতা নামক অগ্নির সেবা করিয়াছেন, (পিতা, মাতা ও আচার্য্য এই) তিনের নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছেন এবং (যাগ, অধ্যয়ন দান এই) তিন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য ইহাই কি জীবের চরমোৎ-

কর্ষ ? নিরন্তর সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই কি জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় ? না, স্বর্গলোকপ্রাপ্তির পরেও জীবের গত্যন্তর আছে ? এই প্রশ্নের উত্তর বৈদিক ঋষি উপাখ্যানচ্ছলে দিতেছেন :—

ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন
জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনে তন্বশ্চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং
পরমে জনিত্রে ॥১
তনুষ্টে বাজিন্তন্বং নয়ংতী বামমস্মভ্যং ধাতু
শর্ম তুভ্যং।
অহ্রুতো মহো ধরুনায় দেবান্দিবীব জ্যোতিঃ
স্বমা মিমীয়াঃ ॥২॥
বাজ্যসি বাজিনেনা সুবেনীঃ সুবিতঃ স্তোমং
সুবিতো দিবং গাঃ।
সুবিতো ধর্ম্ম প্রথমানু সত্যা সুবিতো দেবান্ত্‌-
সুবিতোহনু পত্ম ॥৩॥
মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদ
ধুরপি ক্রতুং।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নি বিবিশুঃ
পুনঃ ॥৪॥
সহোভির্বিশ্বং পরি চক্রমু রজঃ পূর্বা ধামান্য-
মিতা মিমানাঃ।
তনূষু বিশ্বা ভুবনা নি যেমিরে প্রাসারয়ংত
পুরুধ প্রজা অনু ॥৫॥" ১০।৫৬

বাজী নামক মৃতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বৃহদুক্থ বলিতেছেন :—

(হে মৃতপুত্র) তোমার (অগ্ন্যাখ্য) জ্যোতিরূপ এই এক অংশ (এই অংশে তুমি বাহ্যাগ্নিতে প্রবেশ কর), (তোমার প্রাণবায়ুরূপ অংশ) তোমার দ্বিতীয় জ্যোতিঃ (এই অংশে তুমি বায়ুতে প্রবেশ কর), তোমার তৃতীয় (আদিত্যাখ্য) জ্যোতির্দ্বারা (আদিত্যে) প্রবেশ কর। দেবগণের (আদিত্যরূপ) পরমজনকে প্রবেশ করিয়া প্রিয়রূপে তোমার মঙ্গল হউক।১। হে বাজী, তোমার শরীরকে প্রাপ্ত হইয়াছে যে পৃথিবী সেই পৃথিবী আমাদিগকে ধন ও তোমাকে সুখ দান করুক। তুমি অনবপতিত হইয়া (তোমার কারণভূত) মহৎ দেবগণে ও দ্যু-লোকে বর্ত্তমান সূর্য্যে নিজেকে প্রবিষ্ট কর।২। শোভন দর্শন তুমি বলদ্বারা বলবান্‌। তুমি সুখে (পূর্ব্বে ত্বৎকৃত) স্তোত্রের অনুগমন কর, সুখে দ্যুলোকের অনুগমন কর, সুখে [ত্বৎসম্পাদিত] মুখ্য সত্যফলযুক্ত ধর্ম্ম-সকলের অনুগমন কর, সুখে আদিত্যাখ্য জ্যোতির অনুগমন কর।৩। (আমাদিগের) পিতৃগণ এই দেবগণের মহত্ত্বের অধিকারী হন। কিন্তু দেব হইয়াও তাঁহারা দেবগণে ক্রতু অর্থাৎ সংকল্প স্থাপন করেন। এইরূপে তাঁহারা পুনরায় সমস্ত দীপ্যমান্ পদার্থে সঙ্গত হইয়া দেবগণের শরীরে প্রবেশ করেন।৪। পিতৃগণ স্বীয় বল-দ্বারা, পূর্ব্ববর্ত্তী অমিত ধামসকল পরিচ্ছিন্ন করিয়া, সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। এইরূপ দেহ সকলে তাঁহারা বিশ্বভুবন শাসন করেন এবং বহুপ্রকার প্রজা ও জ্যোতিঃ সকল বিস্তারিত করেন।৫॥

এই সূক্তে ঋষি উর্দ্ধমুখী জীবের স্থূল দেহাবসানের পর ক্রমোন্নতির আভাস দিয়া-ছেন। স্থূলদেহ প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত—প্রাণবায়ু হইতে ভিন্ন শবদেহ, ও প্রাণবায়ু। এই দুই অংশই সূক্তের প্রথম ঋকের অন্তর্গত প্রথম দুই জ্যোতিরংশ। মৃত্যুর পর শবদেহ অগ্নিতে প্রবেশ করে ও প্রাণবায়ু বিশ্ববায়ুতে

মিশিয়া যায়। ভাষ্যকার শবদেহকে অগ্ন্যাত্ম্য অংশ বলিয়াছেন, কেন? আত্মীয় স্বজন দ্বারা উহা দগ্ধ হয় বলিয়া কি? তাহা হইতে পারে না; কারণ, উহা দগ্ধ না হইয়া প্রোথিত বা শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষিতও হইতে পারে। পঞ্চভূতের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ, এই তিনের সহিতই অগ্নিবীজরূপ তন্মাত্রের সম্বন্ধ এবং এই তিনই অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া তেজঃজগতের তেজাংশের সহিত, জলজগতের জলাংশের সহিত ও ক্ষিতিজগতের ক্ষিতি অংশের সহিতে মিশিয়া যাইতে পারে। এই জন্যই প্রাণরহিত শবদেহকে অগ্ন্যাত্মক বলা হইয়াছে। শবদেহ ও বাহ্যপ্রাণের সহিত বিযুক্ত হইয়া জীব সূক্ষ্মশরীরমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক পরলোকে গমন করে। এই সূক্ষ্ম-শরীরই ঋগুক্ত তৃতীয় জ্যোতিঃ। ভাষ্যকার ইহাকে আদিত্যাখ্যজ্যোতিঃ বলিয়াছেন, কারণ, সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্মপ্রাণাত্মক এবং আদিত্যই প্রাণ। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, সূক্ষ্মপ্রাণই জীবের যথার্থ প্রাণ, যাহা হইতে বিমুক্ত হইলে জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যায়। ইহা আত্মা হইতে জাত, আত্মার ছায়াস্বরূপ এবং আত্মাতে অনুগত; মনঃসম্পাদিত কর্ম্মানুসারে ইহা এই স্থূলশরীরে আগমন করে।

"আত্মন এব প্রাণজায়তে। যথৈষা পুরুষে-চ্ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং; মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে।" প্রশ্নোপনিষৎ ৩,৩।

স্থূলপ্রাণ স্থূলদেহে জীবের কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত স্থূলবায়ুর অবলম্বনে স্থূলরূপে এই সূক্ষ্মপ্রাণের অভিব্যক্তি মাত্র। স্থূলদেহে জীবের ভোগ ফুরাইলেই স্থূলদেহের প্রয়োজনীয়তা লোপ পায়, এবং প্রাণ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া উৎক্রান্ত হয়।

স্থূলদেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া জীব কোন্ পথে কোথায় যায়? বৈদিক ঋষি নির্দ্দেশ করিতেছেন; পথ দুই, পিতৃগণ ও দেবগণের এক পথ ও মর্ত্ত্যগণের এক পথ ("দ্বে শ্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্।" ১০।৮৮।১৫)। অর্থাৎ, যাহারা স্থূলদেহের বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন করিয়া, অন্নময় কোষে ভোগের কর্ম্মসূত্র দগ্ধ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারে, প্রাণময় হইতে পারে, তাহাদিগের এক পথ, আর তাহা যাহারা পারে না, যাহাদিগকে পুনরায় এই মরণশীল জগতে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাহাদিগের আর এক পথ। যাহারা জীবিতকালে ভক্তি-ভরে দেবগণের স্তুতি করে ও অসত্য পার্থিব কামনা সকল পরিহারপূর্ব্বক সত্যফলযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাই অন্তে অমরত্ব লাভ করিয়া সূর্য্যলোকে দেবগণের সহিত মিলিত হয়। যাহারা নশ্বর মর জগতে আগমন করিয়া ও ভগবৎকৃপায় মানবদেহ ধারণ করিয়া পার্থিব ভোগ্যবস্তুর লালসায় নিবৃত্ত হয় ও ধর্ম্ম আচরণ করতঃ ভোক্তার বা আত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের আর পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করিতে হয় না; কারণ, জীবের পার্থিব ভোগে আত্যন্তিক বিরাগ জন্মিলে পার্থিবভোগায়তন স্থূলশরীরে আর তাহার প্রয়োজন থাকে না। সে তখন চিরতরে অন্নময় কোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণময় আদিত্যলোকে দেবগণের সহিত অব-স্থিত হয়। ইহাই উক্ত সূক্তের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে সূচিত হইয়াছে।